সৃষ্টিছাড়া

আশাপূর্ণা দেবী

প্রকাশক

৮২/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯

সৃষ্টিছাড়া—আশাপূর্ণা দেবী

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৭১। ৮২/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯ থেকে 'প্রকাশক' প্রকাশনা সংস্থার পক্ষে জীবন সরকার প্রকাশ করেছেন এবং নিউ পাল প্রেস, ডবলিউ সি ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৬ থেকে সীতারাম পাল ছেপেছেন। প্রচ্ছদশিল্পী-রতন মুখার্জী

সদ্যলব্ধ স্নেহভাজন

শ্রীমান সোমশুভ্রকে—

আরে তুমি এখানে!

বাড়ির পিছনদিকের ছোট বারান্দাটায় চলে এসে অদম্য বলে উঠলো সারাবাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি। এই শোনো বিয়ের আগে—

অদম্যর কথার ভঙ্গিতে ব্যস্ততা, তবু প্রমিতা কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে হেসে বলে উঠলো এতো খোঁজাখুঁজি কেন? ভয় হলো বুঝি আর সকলের মতো আমিও বিয়ে বাড়ি থেকে সরে পড়ছি?

অদম্যও হাসলো। তবু দ্রুত ভঙ্গিতেই বললো, ভয় হওয়া আশ্চর্য কী? যে রেটে সবাই কাট মারলেন। নীতু পিসিও যে—যাক শোনো বলছি কি বিয়ের আগে তোমার অবশ্যই দু পাঁচটা বা দশটা প্রেমিক ট্রেমিক ছিল? তাদের মধ্যে কি কেউ—

এমন ভাবে বললো কথাটা যেন খুব সাধারণ সহজ কথা। তবে আপাতত জরুরি।

কিন্তু শুনে প্রমিতার?

প্রমিতার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন একটা আগুনের শিখা চড়াৎ করে উঠলো।

এ আবার কী! এ তো দস্তুরমতো অপমান! অদম্য তাহলে এই কুটিল সন্দেহ মনে মনে পোষণ করে একদিন আর পাঁচজনের সামনে হাসি খুশির অভিনয় করে চলছিল? আজ বাড়ি ফাঁকা হয়ে যাওয়া মাত্রই—

প্রমিতার মুখটা টকটকে লাল হয়ে গেল। প্রমিতার কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো। সেই 'রক্তাক্ত' মুখে আগুনঝরা গলায় প্রশ্ন করলো তোমার এ কথার মানে?

কী হলো? রেগে গেলে নাকি?

অদম্য বললো, এতে রাগের কী আছে? তোমার মতো এতো সুন্দরী এবং কলেজে পড়ুয়া মেয়ের দু দশজন অ্যাডমায়ারার বা দু' একটা অন্তত প্রেমিক থাকবে না? থাকাটাই তো স্বাভাবিক!

প্রমিতা মনে মনে ভাবলো, ওঃ তার মানে তুমি অতি চালাক। সরলতার ভান করে কথা বার করে নিতে চাও।

মুখে খুব শান্ত গলায় বললো, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে আমি তাহলে বোধহয় খুব স্বাভাবিকের দলে নয়।

অদম্য একটু তাকিয়ে দেখলো। বেশ গভীরভাবে। তারপর বললো আরে বাবা! তুমি যে এতো সিরিয়াস টাইপের মেয়ে তাতো বুঝতে পারিনি। রাগ করবে ভাবিইনি। এরকম তো থাকেই।

প্রমিতা বললো, নিজের ধারণা আর নিজের মানসিকতা দিয়ে সবাইকে মেপে ফেলা হয়ত ঠিক নয়।

আমার মানসিকতা ?

অদম্য একটু হেসে উঠলো, তা একথা নিশ্চয় বলা চলবে না অদম্য বোস স্রেফ একটা ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি ছিল। তবে পড়ার ধান্দায়—আচ্ছা সে গল্প পরে করা যাবে। এখন আপাতত তো তুমি আমার একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করো। ভদ্রলোককে জোর করে বসিয়ে রেখে এসেছি। এরমধ্যে আবার 'ভদ্রলোক'টি এলো কী প্রসঙ্গে ?

প্রশ্নটা প্রমিতা মুখে করলো না তবে মুখের রেখায় ব্যক্ত হলো।

অদম্যর কথায় আবার ব্যস্ততার ভঙ্গি, ওই তো বলছিলাম না তোমার—আচ্ছা থাক যা চটে গেলে উঃ। তোমার পরিচিত কোনো তরুণ কবি টবি ছিল ? রোগা লম্বা ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে—ফর্সা রং পায়জামা পাঞ্জাবী পরে।

'রোগা লম্বা ফ্যাকাসে ফ্যাকাশে'। প্রমিতার মনে হলো ল্যাগবেগেটা এসে হাজির হয়েছে নাকি ? পলাশ সোম। কলেজে যাকে সব্বাই আড়ালে ল্যাগবেগে বলতো ! দেখলেই মনে হতো তার শরীরটায় যেন হাড়ের অভাব আছে এবং হাত পাগুলো যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত বড়। কবিতা ফবিতা লিখত বটে।

মনে করলেও মুখে বললো মনে পড়ছে না! তো ব্যাপারটা কী ? এরকম কেউ এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে না কি ?

ঠিক উল্টো ! একখানা কবিতার বই বোধ হয় সদ্য প্রকাশিত তোমাকে উৎসর্গ করা। নিয়ে এসে আমার চেম্বারে রেখে চলে যাচ্ছিল 'ওকে দিয়ে দেবেন' বলে। আমিই জোর করে বসিয়ে রেখে তোমায় বলতে এলাম !

প্রমিতা অবহেলার গলায় বলে তা এতো জোরাজুরির দরকারটা কী ছিল ?

বাঃ। বেচারা কতদূর থেকে এতোখানি এসেছে, তাছাড়া বইটা তোমায় উৎসর্গ করছে। বলব না 'নিজে হাতে দিয়ে যান।'

প্রমিতা বললো, বুঝেছি। তা ওকে দেখে মনে হলো না তোমার, একখানা ন্যাকামার্কা বন্ধু।

অদম্য হেসে ফেলে বললো তা হয়ত হয়েছে, তা কী আর করা ? সহপাঠী না পাড়ার ছেলে ?

বলতে পারো দুইই। তো বেশ তো বই রেখে চলে যাচ্ছিল—

আহা সেটা কি ভাল দেখায় ? ডেকে আনি কি বলো ?

ডেকে আনবে ?

বাঃ। তা নাহলে ? নিচেরতলায় তুমি কোথায় যাবে ? বসার ঘরে লোকের ভিড়। আচ্ছা আনছি তাহলে। দ্যাখো যদি একটু অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করতে পারো। সামনের ঘরে বসাচ্ছি।

অদম্য নেমে গেল।

সিঁড়িতে তার চটির মৃদু শব্দটা মৃদুতর হয়ে মিলিয়ে গেল।

প্রমিতা একটুক্ষণ ভুরু কুচকে দাঁড়িয়ে রইলো! ব্যাপারটা যেন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পলাশই হবে নির্ঘাৎ। সে যে আবার তার প্রথম কাব্য-গ্রন্থখানি প্রমিতাকে উৎসর্গ করে বসবে তা কে জানত। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তো তার জিভ জড়িয়ে যায়। আর যখন যার সঙ্গেই কথা বলুক মনে হবে যেন মুগ্ধ বিমুগ্ধ! তা ওই বোকাটার কথা যাক, বোকা বোকার মতোই কাজ করে। দেখা হোক একটু কড়কে দিতে হবে। বলতে হবে কাউকে বই উৎসর্গ করতে ইচ্ছে হলে তার 'পারমিশান' নিতে হয় তাও জানো না বুদ্ধু ? তোমার কবিতা মানেই তো ন্যাকামার্কা প্রেমের কবিতা। খামোকা তুমি আমায় উৎসর্গ করে বসলে মানে ?

তারপর আবার ভাবলো মাঝেমাঝে অবশ্য বলতো 'যদি কখনো বই ছাপতে পারি তো আমার প্রথম বই তোমায় উৎসর্গ করব।'

প্রমিতা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই বলতো, আর কটা মেয়েকে এ কথাটা বলেছিস ?

হ্যাঁ কলেজে তো সবাই সবাইতে 'তুই' করে কথা বলতো। তাছাড়া পলাশ তো বলতে গেলে পাড়ারই ছেলে। প্রমিতার মামার বাড়ির পাড়ার। তবে পলাশ কক্ষনো কাউকে তুই করে না। 'আপনিই' বেশি অথবা 'তুমি'।

তা এসব নাহয় বোকা লোকটার ব্যাপার। কিন্তু ওই চালাক লোকটির ব্যাপারটা কী ? কুটিল কোন অভিসন্ধি নেই তো ? সদ্য পরিণীতা বৌয়ের কাছে তার প্রাক বিবাহ যুগের 'ভক্ত'-কে ধরে এনে দেবার জন্যে এতো উৎসাহ কেন ? বৌকে যাচাই করে নেবার মনোভঙ্গি ? তাছাড়া আর কি হতে পারে ? ভদ্রতা ? সৌজন্য ? মহত্ত্ব দেখানো ? প্রমিতাকে দ্যাখানো, 'দেখ আমি কত উদার।' এই লোককে বুঝে উঠতে পারা কি সহজ হবে।

দিন দশেক হলো বিয়ে হয়েছে প্রমিতার তা এতোদিন তো এই মস্ত দোতলা বাড়িখানা লোকে ঠাসা ছিল। কে যে কখন এসে পড়ছে তাই ভেবেই ডাক্তার ভদ্রলোক সদা তটস্থ! বৌয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথা বলার ফুরসৎই হয়নি।

ওইসব আত্মীয়ের রাশিকে বুঝে ওঠবার ক্ষমতা হয়নি প্রমিতার। অদম্যর

সঙ্গে যে কার কি সম্পর্ক তা কে জানে। শুধু এইটুকু জেনে সন্তুষ্ট বা নিশ্চিন্ত ছিল এরা কেউই থাকবে না। এরা বহিরাগত বিয়ের উৎসব মিটলেই যে যার নিজ নিজ ভূমিতে ফিরে যাবে। বোঝা যাচ্ছিল এই রাশিকৃতের মধ্যে কেউ কেউ বা 'রাশিরমাল' কেউ কেউ বা বিশিষ্ট। তারমধ্যে একজন নীতুপিসি। তিনিই শেষ পর্যন্ত ছিলেন, মাত্র আজই ভোরের গাড়ীতে চলে গেছেন। দূরের রাস্তা নয় উত্তরপাড়া থেকে ভদ্রেশ্বর। অদম্য বলেছিল এতো তাড়া কী? গাড়ি তো অনেক আছে।

নীতু বলেছিল, না বাবা! বেশি বেলায় গিয়ে পড়লে হয়তো 'বাড়াভাত' খেতে হবে! সে বড় অস্বস্তি।

সেটা খারাপ হলো? রেঁধে বেড়ে খেয়েই তো জীবন গেল।

ওরে বাবা! চলে যাওয়া জীবনের আবার নতুন করে যাওয়া যায়। এ গাড়িটায় গেলে গিয়েই চান করে পাকশালার মধ্যে ঢুকে পড়ে পাক খেতে পারব। সেটাই স্বস্তি।

তা নীতু চলে যাবার পরই বাড়ি ফাঁকা। শুধুমাত্র প্রমিতা আর অদম্য। বাদে কাজের লোকজন। তা তারাও অবশ্য গুণতিতে নেহাৎ কম নয়। অদম্য ডাক্তারের বাবা অনঙ্গ ডাক্তারের আমল থেকে তাদের শেকড়।

ডাক্তার অনঙ্গ বোস উত্তরপাড়ার এ অঞ্চলের রীতিমতো খ্যাতনামা পশারওলা ডাক্তার ছিলেন! মস্ত বড় বাড়িখানা বানিয়েছিলেন বিশেষ প্ল্যান-এ। নিচেরতলাটা পুরোপুরিই ডাক্তারের চেম্বার এবং 'লোকজনের বসবাসের উপযুক্ত করে। দোতলাটা নিজেদের বাসের জন্য।

কিন্তু 'বাসিন্দা' বলতে কে?

মা মারা যাওয়ার পর অদম্য আর বাবা!

অতঃপর বাবা মারা যাওয়ার পর অদম্য একা।

এই অবস্থার অবসান ঘটাতেই শেষ পর্যন্ত সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলা। প্রেম ট্রেমের ব্যাপার নয় নেহাৎই আদ্যিকালের প্রথায় ছাঁদনাতলায় প্রথম দর্শন। কনে দেখতে যায়নি অদম্য। বলেছিল, তোমরা কি আর আমার জন্যে একটি 'শ্যাওড়া গাছ বাসিনী'-কে নির্বাচন করবে?

এই, তোমরা রা কে?

কে আর? অদম্যর মাতৃকুল আর পিতৃকুলের মত সরাসরি এবং 'তুতো' মামী মাসি পিসি খুড়ি দিদি বৌদির দল। যাদের সকলের ভালবাসার প্রতিই অদম্যর আস্থা।

পাত্র নিজে কনে দেখবে না!

পাত্রের এই মহানুভবতায় পাত্রীপক্ষের ওপরওলারা 'ছেলের' সভ্যতা সৌজন্যের প্রশংসা করলেও, পাত্রী নিজে আদৌ করেনি। সোজানুজি মাকে বলেছিল, তা তোমাদের সেই মহৎ পাত্রটির কোনো খুঁৎটুৎ আছে কিনা দেখেছ ভাল করে।

ওমা কি যে বলিস। তোকে তো ফটো দেখানো হয়েছে।

ফটো! ফটো আবার একটা জিনিস নাকি? অন্য কোনো 'হ্যাণ্ডসাম' লোকের ফটো পাঠিয়ে দিলেই বা কে বুঝছে? তাছাড়া দিয়েছে তো একটা 'বাষ্টফটো। বেঁটে কী লম্বা' বোঝা যায় ওতে?

মা রেগে বলেছিল, সে সব তোর বাবা কাকা দেখে নেয়নি? তো এখন কী বলতে হবে? মেয়ে তোমায় দেখে নিতে চায়?

থাক বাবা! কিছু বলতে হবে না। যা আছে কপালে তাই হবে। একটা অজ পাড়াগাঁয়ের গাঁইয়া একখানা ডাক্তারই যখন তোমাদের এতো পছন্দ!

উত্তরপাড়াটা অজপাড়াগাঁ?

আমার তো তাই ধারণা।

তোমার তো এই গড়িয়াহাটটি ছাড়া কলকাতার আর সব জায়গাকেও পাড়াগাঁ মনে হয়! আর একটা বিদেশের ডিগ্রী পাওয়া ডাক্তার! সে ও গাঁইয়া।

যে লোক বিদেশি ডিগ্রি নিয়ে ফিরেও গ্রামে এসে বাবার আমলের চেম্বারে বসে প্র্যাকটিস করতে লেগে যায়, আমি তাকে গাঁইয়াই বলি। অ্যাম্বিশান নেই।

মা খুব রেগে গিয়ে বলেছিল, তবে তোর বাপকে গিয়ে বলি, আর পাকা দেখার তোড়জোড়ে কাজ নেই এ বিয়ে ভেঙে দাও।

মাই গড। আমি তাই বলেছি? তোমরা কত চেষ্টায় একটি সাগর ছ্যাঁচা মানিক জোগাড় করেছ তোমাদের আদরের মেয়ের জন্যে। যা হচ্ছে হোক। তবে লোকটা যে গাঁইয়া ধরনের এ আমি স্ট্যাম্প কাগজে লিখে দিতে পারি তোমায়।

হুঁ! আমার সামনে যত তড়পানি। কই বাপের সামনে তো এমন দেখি না। তখন তো 'ভালমেয়ের' আদর্শ একেবারে।

প্রমিতা মাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'মা' হলো গিয়ে প্রাণের আপন! আপনজন!

মা হেসে ফেলেছিল!

অতএব সেই পুরনো ব্যবস্থাই কার্যকরী হয়েছিল।

ছাঁদনাতলায় প্রথম দৃষ্টি ! শুভদৃষ্টি !

কিন্তু সে দৃষ্টি কি অপরূপ মহিমায় উদ্ভাসিত করে দেয়নি প্রমিতাকে ?

বিয়ের আগে হাতে পাওয়া সেই নেহাৎই 'বাষ্ট' ফটোখানাকে তো কম দেখা দেখেনি প্রমিতা, যখন তখনই অন্যের অগোচরে দেখে নিয়েছে। আর যখনি দেখেছে, মনে হয়েছে চোখদুটো যেন জীবন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। সুন্দর সুকুমার উজ্জ্বল আয়ত আর যেন অন্তর্ভেদী ! ছবি দেখেই তো চোখদুটোর প্রেমে পড়ে গিয়েছিল প্রমিতা। মায়ের সঙ্গে ওই বাক্যালাপ ? ওটা তো নেহাৎ দুষ্টুমি ! তবে হ্যাঁ 'তিনি' এতো বেশি গুডবয় যে নিজে কনে দেখতে আসবেন না শুনে রাগ ধরে গিয়েছিল একটু। এলে তো প্রমিতারও দেখা হয়ে যেত ! দেখা যেত কথাবার্তাই বা কেমন।

তা এসে পর্যন্ত দেখছে কথা বার্তায় তো একেবারে 'মারকাটারি !' মাসি পিসি দিদি বৌদি থেকে শুরু করে কাজের লোকদের সঙ্গে পর্যন্ত কথায় সরসতা কৌতুক এবং আন্তরিকতা !

অবশ্য একটু যে সেকেলে টাইপের তাতে সন্দেহ নেই। অনেকজনের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া লোকটার কাছে বৌটি নেহাৎ বৌই। রাত্রে শুতে এসে আবার ডাক্তারি ফলিয়েছে, নাঃ বেশি রাত জাগাব না তোমায়। সারা দিনতো জনারণ্যের মধ্যে হাঁপাও। শুয়ে টুয়ে পড়ার তো সুবিধে হয় না !

অথচ আবার নিজেই সে প্রতিজ্ঞা ভুলেছে। আর হেসে বলেছে যা দেখছি আমার রুগিগুলো এবার বেঘোরে মরবে।

কেন ?

কেন নয় ? ডাক্তারই যখন 'ঘোরের' মধ্যে আচ্ছন্ন।

সেই লোক।

হঠাৎ বাড়ী ফাঁকা পাওয়া মাত্রই কী ছদ্মবেশটিকে খুলে ফেলে ভেতরের কাঠামোকে বার করে ফেললো ? চটপট নতুন বৌয়ের 'প্রেমিকের' সংখ্যার হিসেব চাইতে বসলো। প্রমিতার অগ্রাহ্য অনিচ্ছেকে উপেক্ষা করে সন্দেহ-জনক কোনো একজনকে একেবারে অন্তঃপুরে এনে প্রমিতার মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাওয়ার উদ্দেশ্য কি ?

প্রমিতা অপেক্ষা করছে, চাঞ্চল্য অনুভব করছে। আবার ভাবছে সত্যিই কি পলাশই ? না আর কেউ ? সুন্দরী আর স্মার্ট প্রমিতা সম্পর্কে 'মুগ্ধজনের' তো অভাব ছিল না।

কিন্তু কোথায় কে ?

অদম্য ফিরে এলো একা ! হাতে একখানা বই নিয়ে।

বলে উঠলো, পিকিউলিয়ার লোক তো! বিশেষ করে অনুরোধ করে এলাম বসুন। আমি খবর দিই গে। এতো কষ্ট করে যদি এলেনই তো নিজে হাতে দিয়ে যান। গিয়ে দেখি হাওয়া। ব্রজদা বললো, ভদ্রলোক বলে গেলেন 'কাজ আছে চলে যাচ্ছি।'...

প্রমিতা তাকিয়ে দেখলো। কথাগুলো কী সত্যি? হতভাগা কবিটাকে কি সত্যিই 'বসতে' বলে এসেছিল অদম্য?

না কী, 'আচ্ছা রেখে যান। আমি দিয়ে দেবো' বলে পত্রপাট বিদায় দিয়ে চলে এসে প্রমিতার কাছে অভিনয় করেছে!

কি জানি কেন প্রমিতার মধ্যে এমন একটা কুটিল সন্দেহ মাথা তুলছে! তাই প্রমিতা তাকিয়ে দেখলো। কিন্তু সেই চোখই তো! ফটোয় দেখে যার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল প্রমিতা! এত নিখুঁৎ অভিনয় হবে?

নিজেকে স্থির করে নিয়ে বললো প্রমিতা, 'ভয় পেয়ে গিয়ে পালালো বোধ হয়!

ভয়। ভয় আবার কিসের?

প্রমিতা ব্যাঙ্গের গলায় বললো, ভাবতে তো পারে প্রেমিকার মালিকটি কেমন কে জানে। ভেতরে আসুন বলে যদি কোনো চোরাকুঠুরিতে গুম করে ফেলে!

অদম্য হো হো করে হেসে উঠলো। নিজস্ব ভঙ্গিতে।

খোলা গলায় খোলা হাসি। যে হাসি দেখলে ওর রোগীরা এবং রোগীর বাড়ির লোকেরা বলে ডাক্তার বোসের হাসিতেই অর্ধেক রোগ সেরে যায়।

অনঙ্গ ডাক্তার চির পরিচিত ছিলেন 'ডাক্তারবাবু' নামে। তাই অদম্যকে সাধারণত ডাক্তারবাবু না বলে ডাক্তার বোস বলে। আর 'গাঁইয়া রুগিরা?' তাদের বুড়োবুড়িরা অনেকে বলে 'ছেলে ডাক্তারবাবু।'

বাপের চেম্বারটা নিয়ে বসে বাপের পসারটা যদিও পেয়ে গেছে চটপট তো বাপের মতো প্রকৃতির গুণেও সর্বজনের ভালবাসা অর্জন করে ফেলেছে অদম্য ডাক্তার।

এ হাসিতে কি প্রমিতার মনের মধ্যে জমে ওঠা অকারণ সন্দেহের বাষ্প উড়ে গেল।

হয়তো তাই।

প্রমিতাও হেসে ফেললো। বললো, যদি 'পলাশ'ই হয় তো বলতে হবে তার উপযুক্ত কাজ করেছে। দারুণ নার্ভাস। কই বইতে কী নাম দেখি?

অদম্য ওর কাছে বসে পড়ে বইটা এগিয়ে দিয়ে বললো, নাম তো 'ছদ্মনাম।'

ছদ্মনাম। ওঃ। তাছাড়া আর কী হবে!

বইয়ের নাম 'শুধু তোমারই জন্যে'—

আর লেখকের নাম 'ছন্নছাড়া!'

উৎসর্গ পৃষ্ঠায় শুধুমাত্র লেখা 'প্রমিতাকে!'

প্রমিতার মনের মেঘটা বুঝি কেটে গেল। সহজ ভাবে বইটার পাতা উল্টে উল্টে দেখতে থাকে।

হ্যাঁ পলাশই। প্রথম কবিতাটাই যেন চেনা চেনা। কবে যেন কলেজের কোনো একটা ছাত্র সম্মেলনে কবিতা পাঠের আসর বসেছিল, অন্য অনেকের সঙ্গে পলাশও দু'তিনটে কবিতা পড়েছিলো। মনে হচ্ছে তার মধ্যে এটাও ছিল।

'শুধু তোমারই জন্যে আমার পথ চলা আর—
    চলতে চলতে থেমে পড়া
শুধু তোমারই জন্যে ভোর সকালে রক্তাক্ত সূর্য ওঠে। আর—
    আমার একটা দিন শুরু হওয়া।
শুধু তোমারই জন্যে আমার ঘুম না হওয়া রাত আর—
    ঘুমিয়ে পড়া রাতের স্বপ্নরা!
শুধু তোমারই জন্যে আমার বেঁচে থাকা।'

এমনি আরো অনেকগুলো লাইন।

প্রতিতার মনে পড়লো কবিতা হিসেবে খুব এমন অচল ছিল না এটা মানে অন্যজনদের সঙ্গে তুলনায়। তবু যেহেতু পলাশ, তাই পড়ার শেষে কে কে যেন পিছনের চেয়ার থেকে বলে উঠেছিল, আর শুধু তোমারই জন্যে আমার

পরীক্ষায় ফেলামারা! আর

শুধু তোমারই জন্যে আমার সর্বকিছু গুবলেট!'

তারপর সে আর কোনো কবিতা পড়েনি।

ইতিহাসটা মনে পড়লো প্রমিতার। তবে সেটা আর এখন গল্প করলো না। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললো, নির্ঘাৎ পলাশই। দারুণ বোকা! চেহারার ও যা বর্ণনা দিলে! জানো সবাই আমরা ওকে আড়ালে বলতাম 'ল্যাগবেগে।'

ছি! ছি! ভেরিব্যাড। সহপাঠী না?

আহা! ব্যাড আবার কী? বোকাকে নিয়ে আবার কেনা মজা করে?

সামনে তো আর বলা হতো না! আচ্ছা বোকা না হলে কেউ এরকম একটা সিনক্রিয়েট করে? হাতে করে দেবার সাহস যদি নেই তো রেজিস্টার্ড পোস্টে পাঠিয়ে দিলেই পারতো!

অদম্যও বইটাকে হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললো, সত্যি বলতে এইসব কবিতা আমি ঠিক বুঝি না। আমার কাছে কবিতা মানেই রবীন্দ্রনাথ। হেসো না ছেলেবেলায় পুরো 'কথা ও কাহিনী'-টা মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। ওকে অবশ্য তোমরা কবিতা বলবে না বলবে 'পদ্য'। কিন্তু যাই বলো ওদের এক একটা লাইন যেন পাথরে কেটে বসে। ধরো যেমন, 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধান চুরি!' কিম্বা 'যা চেয়েছ তার কিছু বেশি দিব বেনীর সঙ্গে মাথা।' অথবা—'একাকুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদি গড়।'···সেই কোন বল্যকালে পড়া। কিন্তু—এখনকার এসব কবিতা ঠিক মুখস্থ করা যায় না।

প্রমিতা মনে মনে একটু হাসলো। মাকে গিয়ে বলতে হবে দ্যাখো মা। না দেখেই বলেছিলাম। কিনা লোকটা 'সেকেলে!' এই তার নমুনা দ্যাখো!

মুখেও হাসলো। বললো—মুখস্থ করাই তো শেষ কথা নয়। 'অন্তরস্থ' বলেও তো একটা কথা আছে।

তা অবশ্য। আমি তো একটা গোলা লোক। ছুরি কাঁচি তুলো ব্যাণ্ডেজ নিয়ে কারবার। তবে তোমার এই ছদ্মনামি কবিটি যতই বোকা হোক, একটা বিষয়ে রীতিমত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।

সেটা আবার কিসে দেখলে?

কিসে দেখলাম?

অদম্য বলে ওঠে, যাকে তাকে ভালবেসে মরেনি। রীতিমত একখানি দামি রত্নের কাছেই হৃদয় সমর্পণ করেছে।

ওর কথা বাদ দাও। মেয়ে দেখলেই প্রেমে প'ড়ে মরে ও। প্রেমে পড়াটা ওর রোগ।

প্রমিতার এই হ্যানস্তার ভঙ্গিতে কিন্তু অদম্য একটু দুঃখিত হয়। যতই হোক 'ভালোবাসা' জিনিসটা কি এতো তুচ্ছ করবার?

এটা ওটা কথা বলার পর বলে ওঠে, যাই বলো তাই বলো, তোমার কিন্তু এই 'ছন্নছাড়াকে, একটা চিঠি লেখা উচিত।

প্রমিতা আবার একটু চমকালো। আবার ভাবলো, এটা আবার কী! নতুন কোনো প্যাঁচ না কি? ব্যাপারটাকে যেন জুড়োতে দিচ্ছে না অদম্য।

ভুরু কুঁচকে বললো, চিঠি? কী দুঃখে?

বাঃ! ধন্যবাদ জ্ঞাপন। বলে একটা নিয়ম আছে না? দেখা হলো না—

'হলো না' না বলে দেখা করলো না বললেই বোধহয় ঠিক হয়। বুদ্ধু কোথাকার।

অদম্য আবার শব্দ করে হেসে ওঠে। তারপর বলে, বোকাদের প্রতি তোমার যেরকম অবজ্ঞা, এই অভাগার কপালে কী আছে তাই ভাবনা হচ্ছে।

নিজেকে তোমার বুঝি খুব বোকা মনে হয়?

প্রমিতা আবার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকালো।

অদম্য সে দৃষ্টির রহস্য ঠিক অনুধাবন করলো না। বললো তাই তো হয়!

কেন বলতো 2

কী জানি। মনে হয় তাই বলছি।

এটা যেন এড়িয়ে যাওয়া উত্তর।

প্রমিতা আবার তাকিয়ে দেখে

ঠিক এই সময় ব্রজ দরজার বাইরে থেকে ডাক দেয় দাদাবাবু একটা লোক এসেছে।

অদম্য উঠে গিয়ে বলে, বাঃ! আমার পনেরো দিনের ছুটির আরও একটা দিন তো বাকি আছে ব্রজদা। আজই তোমাদের ভবেশ ডাক্তার আমার কাছে রুগি লেলিয়ে দিচ্ছেন?

রুগি নয়। অন্যলোক।

অদম্য মৃদ্য গলায় বললো, সেরেছে! তারপর বললো যা বসাগে। আর তারপর ঘরে ফিরে এসে হেসে প্রমিতাকে বললো, দেখিগে আবার কোনো 'হৃদয়বেদনার' রোগী কিনা। তুমি ততক্ষণ ওই 'শুধু তোমারই জন্যে'টি পড় বসে বসে। এখন থেকে তোমায় বড় বেশি একা থাকতে হবে এই এক কষ্ট! বাড়িতে তো আর কেউ নেই।

তারপর উঁকি মেরে দেখে নিল ব্রজ দাঁড়িয়ে আছে কিনা। নেই। অতএব বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগটির একটু সদ্ব্যবহার করে নিয়ে হাসতে হাসতে নিচে নেমে গেল।

প্রমিতা একটু তাকিয়ে থাকলো, তারপর ভাবলো, আমার মনটা এমন কুটিল হয়ে গেল কেন? আমি ওকে সন্দেহ করছি কেন? না না এটা ঠিক নয়। ওই চোখের অধিকারি কখনো খারাপ হয়? তবে হ্যাঁ, ও নিজেই যা বলেছে, একটু বোকা হতে পারে। স্ত্রীর 'প্রেমিক'কে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং তাকে চিঠি লেখবার জন্যে স্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়ে নিজের

ভাবমূর্তি'টা উজ্জ্বল করতে চায়। তাছাড়া বোকা নয়ই বা কেন? বিদেশ থেকে সার্জারিতে ডিগ্রি নিয়ে এসে কিনা গ্রামে বসে বাপের 'পসার' এর ছত্রছায়ায় 'জেনারেল প্র্যাকটিস' করে মরছে।

এই কদিন ধরে অদম্যর যতো আত্মীয়দের মুখে অদম্যর গুণকীর্তন শুনতে শুনতে ওর সম্বন্ধে অনেক তথ্য জেনে ফেলেছে প্রমিতা।…নিজের 'স্পেশাল' বিদ্যাটিকে কর্মক্ষেত্র দিতে অদম্য ডাক্তার নাকি একটা ছোটখাটো নার্সিং হোম খুলবে। এদিকে তেমন ভালো নার্সিং হোম নেই। একদম অতি আধুনিক ছাঁদে সে রকম একটি 'হোম' করবার পরিকল্পনা প্রস্তুত!

অনঙ্গ ডাক্তার বিষয়ী ব্যক্তিও ছিলেন। আবার ছিলেনও না। শুধু এই বাড়িখানা সংলগ্ন যে বাগান পুকুর ফলের বাগান রয়েছে সেখানে একটা হাসপাতাল খেলা যায়। আর এই বসত বাড়িটাই বা কী?

এতোবড় বাড়ি কোন কাজে লাগবে? লোকসংখ্যা কতো বৃদ্ধি হতে পারবে এ পরিবারে? একটা বিয়েবাড়ি বা উৎসব বাড়ি লাগিয়ে তিনকুলের সব আত্মীয়কে এনে জড়ো করে সপ্তাহব্যাপী মেলা বসিয়ে কতোই আর উসুল হবে?

তা সে ভদ্রলোক এই গ্রামে বসে কেবলমাত্র জেনারেল প্র্যাকটিস করেও টাকাপত্র তো বেশ ভালোই করে গেছেন। সেটাও আশ্চর্য। জায়গাটাকে প্রমিতা কিছুতেই 'গ্রাম' ছাড়া কিছু বলতে রাজি নয়। ভাবতেও না।

আসল কথা এসব জায়গায় আড়ম্বরের জন্যে খরচ নেই। তাই টাকা জমে গেছে। নুড়ি কুড়িয়ে পাহাড়।

কিন্তু প্রমিতার বরও কি তাই করবে?

'স্পেশালিস্টের' গৌরব নিয়ে শহর কলকাতায় উজ্জ্বল জীবন যাপন না করে এইখানে পড়ে থেকে গাদাগাদা আজেবাজে রুগি দেখে জীবনী শক্তি ক্ষয় করবে?

অদম্যর 'নতুন মাসি' না কে যেন বলেছিল একদিন, 'বাপের মতো মায়ার প্রাণ হয়েছে ছেলেটার। জামাইবাবুর মতোই বলে কেবলমাত্র নিজের উন্নতির চিন্তা একজন ডাক্তারের পক্ষে উচিত নয়। ডাক্তারের 'ধর্ম' আলাদা। তাকে মনে রাখতে হবে তার হাতে 'মানুষের ভালো করবার' একটি অগাধ ঐশ্বর্য রয়েছে! সবাইয়ের হাতে তো থাকে না।

প্রমিতার অবশ্য মনে হয়েছিল কথাগুলো একটু বেশি জোলো, সেন্টিমেন্টাল'। তাই খুব নিরীহ ভাবে বলেছিল, উনি বুঝি রোগী দেখে ফি নিতেন না?

নতুন মাসি বলেছিলেন, বাঃ তা কেন? যাদের দেবার অবস্থা আছে তাদের কাছে নেবেন না? তাহলে তো ফকির সাজতে হয়। যাদের অবস্থা নেই তাদের কাছে একেবারেই নিতেন না। বরং তাদের পথ্যির ব্যবস্থাও করে দিতেন কতো সময়।

প্রমিতার মনে হয়েছিল স্রেফ নীতিকথার গল্প। আর তখনি ভেবেছিল, আমার বরটি অতো 'বাবার ভাবে ভাবিত' হলেই গেছি আর কী! নাঃ বাবা! এখানে পড়ে থাকতে দেবো না আমি ওকে।...যেনতেন করে কলকাতায় নিয়ে যাবো। একটা ভালো হাসপাতাল বা দু একটা বড় নার্সিংহোমের সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড্‌ না থাকলে আবার ডাক্তারের মান মর্যাদা কী? দেশের বাড়ি আর দেশের রুগিগুলোর ওপর যদি নিতান্তই টান থাকে সপ্তাহে দু একদিন করে এখানে এসে বসতেও পারে। বড় বড় ডাক্তাররা যেমন করে থাকে।

বিয়ে তো হয়েছে মাত্র দশ দিন। কিন্তু চিন্তাগুলো তো দশদিনের নয়, যতদিন থেকে বিয়ের ঠিক হয়েছে ততদিন থেকে। ততদিন থেকেই ভেবেছে রূপ আর গুণের সমন্বয়ে গড়া একটা লোককে এভাবে 'অপচয়' হতে দেওয়া। ভাবা যায় না।

নিজের ওপর আস্থা ছিল প্রমিতার। তার মাও আশ্বাসের জোর দিয়ে বলেছিল, 'বরাবরই কী আর ওখানে পড়ে থাকবে? কলকাতায় এসে বসবেই।'

তা একদিন তো প্রমিতা প্রায় রুদ্ধশ্বাসেই ছিল। এতো লোক আর তাদের এতো আদরের ঠ্যালা! বাবাঃ! আজই এখন এই ঘণ্টা কয়েক হলো এই বৃহৎ বাড়িখানার মধ্যে নিজেকে 'একা' দেখে নিজের ভবিষ্যৎ অবস্থাটা অনুমান করতে চেষ্টা করছিল। হঠাৎ কোনোখানে কিছু নেই এই উড়ো আপদ!

মনে মনে এই 'আপদ' শব্দটাই ব্যবহার করলো প্রতিমা। তবু আবার সেই 'শুধু তোমারই জন্যে'-খানা খুলেও বসল।

অনেকক্ষণ পরে ফিরে এলো অদম্য।

খুব কাতর ভাবে বললো, আই অ্যাম ভেরি সরি। হঠাৎ চলে গিয়ে তোমাকে এতোক্ষণ একা ফেলে রাখলাম।

প্রমিতা বললো, কাতর হবার কি আছে? এটাই তো আমার প্রকৃত অবস্থা হবে। ডাক্তারের বৌ হবার ট্যাক্স!

তবু তাদের বাড়িতে তো লোক থাকে। মা ঠাকুমা পিসি দিদি বৌদি কিছু না কিছু।

প্রমিতা মনে মনে বললো, তোমার ওই কিছু না কিছুর জন্যে তো আমি মরে যাচ্ছি। একা কেবলমাত্র নিজেকে নিয়ে থাকা, মন্দ কি? এরমধ্যে বেশ একটা রোমাঞ্চ আছে, কতোকগুলো হাবিজাবি নিয়ে—ধুস!

মুখে বললো, নেই যখন আর উপায় কী?

তারপর বললো, কে এসেছিল? আঁবার তোমার নতুন বৌয়ের কোনো পুরনো প্রেমিক নয়তো?

ইচ্ছে করেই বললো, খোঁচা দেওয়ার সুরে।

অদম্য এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ ওকে দু'হাতের মধ্যে বন্দী করে ফেলে বলে উঠলো, উঃ। কী সাংঘাতিক মেয়ে! সেই রাগ মনে রেখে দিয়েছ?

রাগের কী আছে? তোমার যখন ওই ধারণা, এবং হাতে হাতে প্রমাণও পেয়ে গেলে!

ঘাট মানছি মহাশয়া।

প্রমিতা আবার একটু আহত হলো। কথার ধরণ কী গ্রাম্য। কে বলবে একটা বিদেশ ফেরৎ ডাক্তার। নাঃ এই পরিবেশ থেকে সরাতে না পারলে ওর উন্নতি নেই। ওইসব দিদি বৌদি, কাকী পিসি মামা কাকাদের সঙ্গদোষ!

প্রমিতার মন অবিরত কথা কয়ে চলে। মুখটা 'মাঝেমাঝে' কথা কয়।

এখন কইলো।

বাড়িতে কেউ না থাকার 'সুবিধেটা' তো দেখছি তোমার ভাগে!

ইস। একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না? আসলে কী জানো? কদিন নিজেকে খুব কণ্ট্রোলে রাখতে হয়েছে তো? চারিদিকে চোখ। রাতেও আড়িপাতিয়েদের ভয়ে—

আড়িপাতা?

প্রমিতা প্রায় ছিটকে উঠে বলে, আড়িপাতা মানে?

কী আশ্চর্য? বাঙালির মেয়ে 'আড়িপাতা'র মানে জানো না?

মানে জানি। কিন্তু এখনো এ যুগেও ওইসব সেকেলে গ্রাম্যতা আছে তা জানতাম না

আরে বাবা! মজা করার আবার সেকাল একাল। ওই যে বিয়ের সময় বরণ করার কালে তোমার মা আমার হাতটায় সুতো জড়িয়ে বললেন, 'কড়ি দিয়ে কিনলাম, দড়ি দিয়ে বাঁধলাম, হাতে দিলাম মাকু, একবার 'ভ্যা' করতো বাপু।' এটি কি খুব একেলে? আমার তো মনে হয় তোমার মায়ের পিতা-

মহী প্রপিতামহীরাও, জামাই বরণের সময় ওই পুণ্যবচনটি আউড়েছেন। মজা হচ্ছে 'মজা'।

প্রমিতাকে অবশ্য এখন চুপ করে যেতে হয়।

শুধু 'ভ্যাঁ' করার অনুরোধই নয়, আরো অনেক মজাই তো করা হয়েছে বাসরঘরে। কনের পায়ের তলায় বরকে অদৃশ্য কালিতে 'দাসখৎ' লিখে দেবার নির্দেশ, কড়ি খেলার সময় বাচালতার চূড়ান্ত এসব তো প্রমিতারই চোখে দেখা!

অতএব প্রমিতাকে বলতে হলোআমাদের সমাজের এই 'তস্যাকেলে' বিয়ের পদ্ধতিটা বদলানো দরকার।

অদম্য হাসলো।

বললো, 'পদ্ধতি তো' পড়ে রয়েছে অবাধ অধিকার নিয়ে। তো কই এটা ছাড়ছে কে? মালা চন্দন চেলিফেলি এসব দিয়ে 'কনে' সাজ বার ইচ্ছেটি কি মেয়েদের মন থেকে বিদায় নিচ্ছে? কোথাও তো আবার দেখি এই তো কিছু দিন আগে আমার এক বন্ধুর বিয়েতেই দেখলাম, রীতিমতো বিদুষী স্মার্ট মেয়ে, তিনিও ওইসবের ওপর আবার কপালে সোনার ঝালর দু' হাতের তালুতে মাকড়সার মতো ভয়ঙ্কর একখানা গহনা, আর নাকে—দুর্গা ঠাকুরের মত 'নথ ফৎ' পরে একাকার। পায়ে আবার বোধহয় নূপুর টুপুরও।

প্রমিতা মনে মনে বললো, 'ভাগ্যিস।'

বললো, কারণ তারও কনে সাজ বার সময় একটু নথ পরার খুব শখ ছিল! কিন্তু প্রমিতার বাবা আগে থেকেই তাঁর গিন্নিকে বলে দিয়েছিলেন, 'দোকানে' গিয়ে কনে সাজিয়ে আনাব খুকুকে? তাজ্জব। এসবও চলছে বুঝি? যাক গে আর যা করো করো নাকে একখানা সুদর্শনচক্র ঝুলিয়ে দিও না। দেখি তো এখানে-ওখানে। রাবিশ।

মা বলেছিল, আজকাল তো 'নথ' কনে সাজাবার একটা অঙ্গ।

তা একটু অঙ্গহানিই হোক বাপু। আমার বড় বিশ্রী লাগে।

বাবার এই নিষেধবাণী অগ্রাহ্য করে প্রমিতা মায়ের একান্ত নির্দেশেও নথ পরতে যায়নি।

মাও বলেছিল, তোর বাবার কথা রাখ। ওর তো সবই 'বিশ্রী' লাগে।

তবু। 'বাবা' বলে কথা।

এ ইতিহাসটি না থাকলে প্রমিতাকে নির্ঘাৎ অদম্যর কাছে অপ্রতিভ হতে হতো।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলো প্রমিতা। বলল, তোমার ব্রজদা তো বললো,

পেশেণ্ট নয়। তো কার আবির্ভাব ঘটেছিল?

ও কিছু না। একটা ফালতু ব্যাপার। একটা নতুন ওষুধ কোম্পানির এজেণ্ট। কিছু ওষুধের স্যাম্পেল গছিয়ে গেল। আমাদের ডিস্পেনসারিতে সাপ্লাই দেবার জন্যে আবেদন আর কি।

প্রমিতা অবাক হয়ে বললো, তোমার আবার নিজস্ব ডিস্পেনসারিও আছে?

আমার নয়। বাবার। তবে উত্তরাধিকার সূত্রে—এখন, তুমি জানতে না বুঝি? স্টেশনের ধারের রাস্তায় 'মহালক্ষ্মী ঔষধালয়' চোখে পড়েনি।

'মহালক্ষ্মী ঔষধালয়।'

হায় ঈশ্বর! একে প্রমিতা আধুনিকতার মন্ত্র দিতে বসবে? কতদিনে সফল হবে!

মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বললো, চোখে পড়েনি। শুনে মনে হচ্ছে নামটা যেন কবিরাজি ওষুধের দোকানের মতো।

অদম্যও একটু হাসল, বাবার মাতৃভক্তির চিহ্ন আর কি, ঠাকুরমার নাম ছিল মহালক্ষ্মী দেবী।

ও।

এরপর আর 'সেকেলে' বলে হাসা চলে না।

বাবার কথা উঠলেই অদম্যর 'বাবার কথা' একটু বলতে ইচ্ছে করে। বলে, বাবার ধারণা নামটা দারুণ পয়মন্ত। সত্যি বলতে একটা প্রধান আয়ও তো ওই ডিসস্পেনসারি থেকেই।

প্রমিতা ভাবে, ওঃ। এই জটিল জাল থেকে লোকটাকে উদ্ধার করে বার করে নিয়ে যাওয়া কতদিনে সম্ভব হবে?

তবে কথা বলে হেসে হেসে। মিক্সচার তৈরি হয়? কাগজের দাগ সাঁটা শিশিতে ভরে সাপ্লাই করা হয়?

অদম্য বলে, সে জিনিস তুমি দেখছ নাকি?

অতি শৈশবে দেখে থাকব।

আমারও অবশ্য প্রায় তাই। আগে দেখেছি কম্পাউণ্ডারবাবুকে মিক্সচার তৈরি করতে। এখন আর ও জিনিস চলে না।

আমার ধারণা ছিল বিদেশ থেকে তুমি একটা স্পেশাল বিদ্যা শিখে এসেছ। কিন্তু—

ধারণাটা অমূলক নয়। কিন্তু 'কিন্তুটা' কী?

না কিছু না।

কি মুস্কিল। আমার 'বিদ্যা' সম্পর্কে যদি হঠাৎ তোমার কোনো সন্দেহ

জেগে বসে বলবে না ? অবশ্য কীই বা এমন শিখেছি। একটা ডিগ্রি সংগ্রহ করে এসেছি মাত্র।

যাইহোক। কিন্তু সেটা তো সার্জারি।

তাই।

অথচ তুমি সাধারণভাবে জেনারেল প্রাকটিস করে এনার্জি নষ্ট করছ। এটা আশ্চর্য না ?

অদম্যর অবশ্য ওর বৌয়ের মনের ভাব বুঝতে অসুবিধে হলো না। হেসে ফেলে বললো, সাধারণ ডাক্তারিও যে কিছুটা না শিখে রেখেছি তা তো নয় ? পাশের ছাপ তো আছে। রুগিগুলোকে নিহত করলেও আইনের দায়ে পুলিসে ধরবে না। তবে কথা কি জানো ? এদের যা অবস্থা বলতে গেলে নিহতই হয়ে আছে। আমার হাতে পড়ে যদি মরে নিজেকে 'নিমিত্তমাত্র' মনে ক'রে বিবেককে শান্ত করা যাবে। বেশিরভাগই যতসব দুঃখী গরিবরাই এই 'ছেলে ডাক্তারবাবুর হাতে মরতে আসে।'

'ছেলে ডাক্তারবাবু' নামের রহস্যটা প্রতিমার জানা হয়ে গেছে। তাই আশ্চর্য হয় না।

অদম্য আবার হাসে, এখন সাধনা করে চলেছি কি করে 'বৈদ্য' হয়ে উঠতে পারব আর তার থেকে 'চিকিৎসক'।

প্রমিতা বললো, এ কথার মানে ?

বাঃ। মানে জানো না ? শাস্ত্রে আছে 'শতমারি ভবেৎ বৈদ্য সহস্রমারি চিকিৎসক।' একশোটা রুগিকে খতম করতে পারলে 'বৈদ্য'ত্ব লাভ হয় আর হাজারটা মারলে 'চিকিৎসক।'

ও। এটা শুনেছি বটে। তা 'মারাটাই' কাজ না কি ? বাঁচানোটা নয় ?

অদম্য সহসা একটু বিষণ্ণ হয়ে বলে বাঁচানোর ক্ষমতা কি সত্যিই আছে আমাদের ? শুধু বিশেষ কোনো রোগের ওষুধ দিতে পারলেই কী এদের বাঁচানো যায় ? 'সবিশেষ ব্যাধির' যে শেষ নেই। সমস্ত পরিবেশটাই তো ব্যাধিগ্রস্ত।

প্রমিতা হাই তুললো।

সেরেছে। তার কপালে কি এক জোলো আদর্শবাদী জুটল না কী ?

ব্রজ এসে ডাক দিয়েছিল বামুনমাসি বলছে বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে ভাত বাড়বে ?

অদম্য তাড়াতাড়ি প্রমিতাকে বলে, আরে তোমার স্নান হয়েছে ?

কখন। আমি সকালেই স্নান করি।

গুড। আমাকে অবশ্য দুবার করতে হয়। একবার নিয়মমাফিক সকালে, আর দ্বিতীয়বার রুগি দেখার পর।

প্রমিতা বলে ওঠে, কিসে চেপে রোগী দেখতে যাও। টমটম গাড়িতে চেপে।

টমটম।

বাঃ। গ্রামের 'ডাগদার বাবুরা' তো শুনেছি তাই যায়।

কিন্তু অদম্যর গাঁয়ে ব্যঙ্গের তীরটি বেঁধে কই? সে আবার তেমনি হেসে ওঠে। তারপর বলে, জিনিসটা মার্ভেলাস। কিন্তু এ যুগে দুর্লভ। বিকল্পে মোটরবাইক।

প্রমিতা ভাবে তবু ভালো। তবে বাইক ছাড়িয়ে মোটরে না চাপানো পর্যন্ত শান্তি নেই আমার। লড়ে যেতে হবে।

খাবার ঘরটি অবশ্য অতি মনোরম।

দক্ষিণের দরাজ হাওয়া এসে আছড়ে পড়ছে বড় বড় জানলাগুলো দিয়ে। বৃহৎ একটি মার্বেল টেবিল। জনাবারো একসঙ্গে খাওয়া যায়। হচ্ছিলও তাই ক'দিন। অবশ্য কিছু কট্টর মহিলা ছিলেন, তাঁরা খাবার দালানে মাটিতে আসন পেতে খেতেন। বামুনমাসি সেই দিকেই ব্যাপৃত থাকতেন। এদিকের জন্যে কদিন লাগানো ছিল হালুইকর ঠাকুর দুটো আর বৌভাতের যজ্জির দিন?

সে তো বিরাট কাণ্ড। বাইরে প্যাণ্ডেল করে।

প্রমিতা ওই নীতু পিসিকে জিজ্ঞেস করেছিল, এতসব কে করছে?

নীতুপিসি সুন্দর হাসি হেসে জবাব দিয়েছিল, যাঁর কাজ তিনিই করাচ্ছেন।

না মানে এখানে তো বোধহয় 'কেটারার' নেই?

ওমা। কেন থাকবে না? আজকাল তো সর্বত্রই লোকে কেটারারের ব্যবসায় নেমে 'লাল' হয়ে যাচ্ছে। তবে এ বাড়িতে একটা চিরকেলে ব্যবস্থা আছে। বড় বড় উনুন পাতা পাকা রান্নাঘর আছে। বৃহৎ বৃহৎ বাসনপত্র মজুত আছে আর জানা হালুইকর ঠাকুরের গুষ্ঠিই আছে। খবর দিতে যা দেরি। বড়দা মানে তোমার শ্বশুরের যে, কারণে অকারণে লোক খাওয়ানো বাতিক ছিল। জ্যাঠাইমার মানে তোমার দিদি শাশুড়ি মহালক্ষ্মী দেবীর আর কি বাৎসরিকে ঢালাও লোকজন খেতো। গরিব দুঃখীই বেশী। ওইসব যজ্জির উনুন জ্বলত।

প্রমিতা ভেবেছিল, যা দেখছি রীতিমত একটি গাড্ডায় পড়ে গেছি।

'বাৎসরিক।' বাবাঃ। শ্বশুরের ছেলেও আবার তাঁর মা বাপের 'বাৎসরিকে' দরিদ্রনারায়ণ সেবা করতে বসেন না তো? বাইরে থেকে মানুষকে কতটুকুই বোঝা যায়। শুনেছিলাম বিদেশি ডিগ্রিওলা সার্জেন, রূপবান স্বাস্থ্যবান। দেশে প্রচুর জমিজমা বিষয় সম্পত্তি আছে। বাপ পশারওলা (যদিও গ্রামের পশার) ডাক্তার ছিলেন, পয়সাকড়ি ঢের। ওই ছেলেই একমাত্র সন্তান সব-কিছুর উত্তরাধিকারী।

পাত্র হিসেবে প্রথমশ্রেণীর।

তা কোনোটাই ভুয়ো নয়। কিন্তু ওই 'সারালো' পরিচয়ের অন্তরালে যে আর একটি অসার পরিচয় রয়েছে সেটা তো কেউ বুঝে যায়নি। বাবা আর মামা উত্তরপাড়া ঘুরে গিয়ে কি প্রশংসা। ভেতরে ভেতরে যে লোকটা এতো সেকেলে গাঁইয়া তা তো কেউ বলেনি। তার মানে টের পায়নি। কিন্তু প্রমিতাকে তো হাড়ে হাড়ে টের পেতে হবে।

* * *

নীতুপিসির আসল নামটা যে কী সে কথা জানতে পারেনি তার ভাইপো অদম্য ডাক্তারের নতুন বৌ। নীতুপিসি না নীতিপিসি। কিন্তু নীতুর যেখানে আসল জায়গা? ভদ্রেশ্বরের এই মিত্তির বাড়িতে? এখানেও কেউ তার নামের ধার ধারে না। সে এবাড়ির 'ছোটো বৌ!' 'ছোটোকাকি', 'ছোটোমামী', 'ছোটোবৌদি' এবং পাড়ার লোকের কাছে ছোটো গিন্নি।

তবে ভাগ্যের খেলা।

'ছোটো' হয়েও বড়ো হয়ে যাওয়ার অধিকার ঘটে গেছে তার। কারণ অকাল বৈধব্য তাকে আঠারো বছর বয়সে গিন্নিদের দলে ভর্তি করে দিয়েছিল। 'বিধবার' আর কোন দল জুটবে পিসশাশুড়ি জ্যেঠ শাশুড়িদের দল ভিন্ন? তাঁদের সঙ্গেই যখন 'অমাবস্যা পূর্ণিমা জন্মাষ্টমী শিবরাত্রি একাদশী অম্বুবাচীর পাকচক্রে পাক খেতে হবে। ওনারা যদি বা 'ছেলেমানুষ' বলে কৃচ্ছ্রসাধনের বিধানে কিছু কমতি করতে চেয়েছেন, ছোটোবৌ তা ঘোরতর আপত্তিতে নাকচ করে দিয়েছে!...ওঁদের সঙ্গে সব কিছুতে সমান সে। শুধু তফাতের মধ্যে ওনাদের গায়ে সর্বদা জামাসেমিজ থাকে না, নীতুর সেটা থাকে আর ওনাদের পরণের কাপড়ের আগাটা নেহাৎই নাড়া নাড়া (স্রেফ ওনাদের হাতের মতো) নীতুর পরণের কাপড়ের ধারে 'পাড়' নামের একটি সরু রেখা আছে। এইটুকু মাত্র। বাদবাকি সব এক।

ছোটোবৌ বড়দের দলে।

কালক্রমে জ্যেঠশাশুড়ি মরেছেন পিসশাশুড়িকে বাতে আর বার্ধক্যে ধরেছে

কাজেই নিরামিষ হেঁসেলের দায়িত্ব ছোটোবৌয়েরই।

কাজেই দিন পনের ফাঁকি দিয়ে এসে 'বাড়াভাত' খেতে লজ্জা হওয়াই স্বাভাবিক। তাই সকালের গাড়িতে ছুটে ছুটে চলে আসা!

এসেই স্নানের ঘরে ঢুকে পড়েছিল।

বেরিয়ে এলো বাড়ির বিধি অনুসারে ভিজে কাপড়ে।

এসেই দেখলো দরজার কাছে বৈশাখী 'ছোটমামীর' তসরের শাড়ি সেমিজ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে।

ওমা! তুই আবার কেন? আমি তো—

তা জানি তুমি এক্ষুণি ভাঁড়ার ঘরের গাড্ডায় গিয়ে ঢুকবে। বিয়েবাড়ির গল্পটা টাটকাটাটকি শুনে নিই বাবা!

নীতু বৈশাখীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, শুনে তোর কি চারখানা হাত পা বেরোবে?

না বেরোক। বেশি হাত পায়ে দরকার কী? নাও ভিজে কাপড় ছেড়ে একটু ডাব কি শরবৎ গলায় ঢালো, তারপর বোসো।

কেন রে আমি কি এখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এলাম যে গলা না ভিজিয়ে কথা বলা যাবে না?

তো একটা কিছু তো খাবে। তোমাদের বিশুদ্ধ রান্নাঘরে ঢুকে আমি তো আর একটু শুদ্ধাচারের চা বানিয়ে দিতে পারব না? সত্যি ছোটোমামী কেন যে তোমাদের এতো বিচার আচার।

নীতু হেসে ওঠে, একটা কিছুকে তো জম্পেস করে ধরে থাকা চাইরে। তা নইলে নির্বিচারের জোয়ারে ভেসে যেতে হয়।

জানি না বাবা! মনটা এতো ছটফট করে। অথচ তোমাদের দিকে কিছু করবার উপায় নেই।

তোদের দিকে কাজের অভাব? তোর মেজমামী বড়মামী কী হঠাৎ দয়ার অবতার হয়ে গেল? জীবে দয়া ধরেছে?

বৈশাখী হেসে ফেললো।

বললো, আমার ইচ্ছে করে তোমাদের দিকে কিছু করি। আমরা তো ইচ্ছে করলেই দোকান থেকে কচুরি সিঙ্গাড়া এটা ওটা খাবার আনিয়ে খেতে পারি। এই তো একদফা চা মুড়ির পর্ব হয়ে গেছে। এরপর ন্যাড়ার দোকান থেকে আসবে গরম বেগুনি আর জিলিপি। আর এক প্রস্থ চা। সেজমামীর তো ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা হলেই ভালো। তোমাদের ভাগ্যে খুব যদি মুখরুচি করলে তো দুখানা পাঁপর ভাজা। ধ্যেৎ!

জিব কে শায়েস্তা রাখাই তো ভাল রে।

হুঃ। সেটা রাখতে রাখতে জিব যে অন্যদিকে বেশ শায়েস্তা হয়। পিসদিদি-মাটি যখন জিব ছোটায়—

আচ্ছা হয়েছে থাম।

কাপড় বদলানো মাত্রই বৈশাখী নীতুর ভিজে কাপড়জামা কুড়িয়ে নেয়।

আহা রাখ না বাবা। আমি মেলে দিচ্ছি।

কেন? আমি দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

তা যাবে না হয়ত। কিন্তু—

একটু হেসে কথার পিছনে ড্যাশ টেনে দিয়ে থেমে যায় নীতু। তবে তাতে অবশ্য বুঝতে অসুবিধে হয় না বৈশাখীর। মুখটিপে হেসে বলে হিংসুটেদের কথা ছাড়ো। তো বিয়েবাড়ির গল্পগুলো কখন হবে?

গল্প আর গুলো কী? একটাই তো। 'বৌ কেমন হলো?' এই, তো?

বাঃ। শুধু তাই বুঝি? যজ্ঞি কেমন হলো। কত লোক খেলো। কি কি খেলো, তত্ত্ব-টত্ত্ব কেমন হলো, আর কে কে সব এলো, এসব গল্প নেই?

নীতু বৈশাখীর মুখের দিকে একটু বিষন্ন কৌতুকের গলায় বলে এতোসব জানার দরকার তোর?

ওমা। তা দরকার নেই? গায়ে হলুদের তত্ত্বয় কত বড়ো মাছটা গেল, কী রকম বেনারসী দেওয়া হলো সবই তো জানা দরকার। তা নইলে আর 'বিয়ে বাড়ির গল্প কী?'

ঠিক আছে বলব ওসব দুপুরে গুছিয়ে বসে। এখন পিসিমার অবস্থাটা দেখিগে।

অবস্থা আবার মন্দ কী? বেতো পা ছড়িয়ে বসে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রাঁধতে তো তো কসুর দেখিনি। তার সঙ্গে আবার বড়মামীর কি সব বারব্রত পড়েছিল, উনিও বীরবিক্রমে এসে লেগে গেছলেন তসর শাড়িটাড়ি পরে। লুচি ঢাকাই পরোটা ডালপুরি! কী ঘটা।

নীতু খিল খিল করে হেসে উঠে বলে, তা 'ভালই তো, নিরামিষ রান্নাঘরের ঘটা নেই বলে তো দুঃখে মরছিলি।'

আহা। আমি যেন ওদের জন্যে মরছিলাম।

এই তো। এইখানেই তো গণ্ডগোল। তুই যদি কেবলমাত্র ছোটমামীর প্রেমেই হাবুডুবু খাস, তাহলে তো হিংসের চারা পোঁতা হবেই বাবা!

তা কী করব। প্রেমে পড়াটা তো আর অঙ্ক কষার নিয়মে চলে না গো।

হঠাৎ পিছন থেকে নীতুর মেজ জায়ের কণ্ঠ ধ্বনিত হলো, প্রেমে পড়ার

কথা কি হচ্ছিল ? ভাইপোর বিয়েটা কি প্রেমে পড়া বিয়ে না কী ?

নীতু হেসে উঠে বললো, হতেও পারে। সেকথা কি আর পিসির কাছে ফাঁস করবে ?

তা করতে বাধা কী ? পিসি তো মাইডিয়ার। তো নেমতন্ন খাওয়া হলো। বাবাঃ। ষোলদিন ধরে নেমন্তন্ন চালালি। তোর কিন্তু মোটা হয়ে আসা উচিত ছিল ছোটোবৌ ! তো যাক। বৌ কেমন হলো ?

খুব সুন্দরী !

মেজজা একবার বৈশাখীর দিকে কটাক্ষপাত করে অমায়িক গলায় বলেন, আমাদের শাখির মতন ফর্সা ?

শাখি ! বৈশাখী থেকে শাখি।

কোনো এক বৈশাখের পয়লা তারিখে জন্মে পড়ায় ওর নাম ধার্য হয়েছিল বৈশাখী। কিন্তু অতবড় নামটা ধরে কি ডাকা যায় ? তার ওপর তো কাঁচি চালাতে হবে।

নীতু খুব অমায়িক গলায় বললো, শাখির মতো ? শাখি আর এতো কী ফর্সা ? আরো অনেক ফর্সা। কলকাতায় থাকা মেয়ে সাজসজ্জা শরীরের যত্ন সবই তো বেশী।

তা বটে। তো মুখের কাটুনি ? ওর থেকে ভালো ?

আর একবার তাকালেন মেজগিন্নি বৈশাখীর দিকে। কেন ? কে জানে।

নীতু আরো আলগা গলায় বললো, মুখের কাটুনি ? সে তো মেজদি এক একজনের এক একরকম। মালক্ষ্মীও সুন্দর, সরস্বতী ঠাকরুণটিও সুন্দর। তবে ধরন তো আলাদা। তুলনা করাটা অর্থহীন।

অ। তা বটে। পোড়ো মুখুরাই অর্থহীন কথা কয়ে মরে। যাক। দেখি গিয়ে পিসিমার কতদূর। ভোরবেলা তো দেখলুম মরে মরে লাউ কুটছে।

মরে মরে ? হি-হি।

এতক্ষণ পরে বৈশাখী কথা বলে হেসে উঠে, আহা তা কাঁচা তরকারিতে কি দোষ লাগে সেজমামী ? বললে আর কেউ কুটে দিতো। আহা ! বেচারি। তা তোমারও যে নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই ছাই। কখন মায়াদয়া দেখাবে !

মেজমামী ওর দিকে তিক্তদৃষ্টিতে তাকিয়ে চলে যান।

নীতু গলার স্বর নামিয়ে বলে তুই বোকাটা আমার প্রেমে বিভোর থাকবি, আর সর্বদা ওনাদের পেছনে লাগবি। কী দশা হবে তোর ?

বৈশাখী হেসে উঠে বলে, দশদশার শেষ দশায় তো এসে পেঁছেছি। আর কতই হবে?

নীতু সস্নেহে ওর চুলের ওপর একটা হাত রাখে।

সর্বনাশ! ছুঁলে যে? ও তসর কাপড় পরে আছ। তবু ভালো। কিন্তু ছোটমামী পশুর লোম কীটপতঙ্গের লালা, যার জন্যে নিরীহ প্রাণীগুলোকে নিয়ে হতাহত করার কারবার। সে জিনিস এতো শুদ্ধ পবিত্র হলো, আর গাছের ফুল শিমুল কাপাস তার থেকে তৈরি সুতো এতো অশুদ্ধ যে ছুঁলেই 'হয়ে গেল।' কেন বলতো? জবাবটা দাও তো আমায়।

জবাব।

নীতু গাঢ় গলায় বললো, এখন হঠাৎ তোর এই জবাবটা পাওয়া এতো জরুরি হলো?

ওই তো রোগ গো ছোটমামি। যখন যে প্রশ্নটা মাথায় চাপে সেটার ফয়সালা নাহলে শান্তি নেই।

ওর জবাব আমার কাছে যা তা শুনলে পিসিমা কোম্পানি চোখ কপালে তুলবেন। এমনিতেই তো এতো সাবধানে থেকেও শুনি আমার নাকি সব কথাবার্তা 'মেমেলি।' আমার তো ধারণা বাবা যা কিছু নীতি নিয়ম তৈরি হয়েছে সব এর পেছনেই সুবিধাবাদ। রেশম পশম বারে বারে কাচলে খতম, অথচ না কাচলে দারুণ টেকসই। কাজেই তাকে কাচার দরকার হয় না। সে চির 'শুদ্ধ'। আর সুতোর কাপড় যত কাচবে ততই ফ্রেস অতএব তার ওপর ছুঁৎমার্গ চাপিয়ে রাখা! তো আর কাউকে যেন বলতে যাসনি বাবা। তোকেও বলবে 'মেমেলি।' যা দেখগে যা মা কী করছেন। এসেই একবার ঝাঁকি দর্শন করে কেটে পড়েছি।

ও বাবা। এক্ষুণি আবার ওনার কাছে? সহজে ছাড়বে বুড়ি? বাড়িতে যেখানে যত কথা হচ্ছে সব ওর শোনা চাই।

আহা। বেচারি। উঠতে পারেন না। অথচ ভেবে দেখ এক সময় এই বিশাল সংসারটি তো উনিই হাতে করে গড়েছেন। সব ছিল ওঁর মুঠোর মধ্যে। সব ওঁর নির্দেশে হয়েছে।

বৈশাখী বললো, তোমার হৃদয়ের বহর দেখলে মনে হয় ছোটমামী পুরুষ হলে তুমি কোনকালে মিশনের সাধুটাধু হয়ে যেতে। ওই কানে খাটো বুড়ির সংসারের সব কিছু জানবার চেষ্টার জ্বালায় সবাই রেগে মরে আর তুমি—

আচ্ছা। আমার মহিমা ভাবগে বসে বসে। তোকে যখন বিয়েবাড়ির গল্প শোনাব তখন—

বৈশাখী এখন হঠাৎ নির্লিপ্ত গলায় বলে, আর বেশি শুনেই বা কী হবে। ওই তো শুনলাম বৌ খুব সুন্দর হয়েছে।

আর কিছু শুনবি না ?

কী হবে ? তবে হ্যাঁ। এই কদিন তোমাদের সেই বামুনমাসি তোমায় কি কি খাওয়ালো সেটা শুনলে মন্দ হয় না। হি হি কিছু নতুন রান্না শেখা হয়ে যাবে নিরিমিষ পদ ! সে বুড়ি তোমায় খুব ভালবাসে না ?

কথাটা এমন কিছু হাসির নয় তবু খানিকটা হেসে চলে যায় বৈশাখী। বোধহয় আর এক বুড়ির উদ্দেশে। যে না কি চলৎশক্তিহীন হয়ে এই পুরনো বাড়িখানার কোনো একখানে পড়ে আছে শ্রবণ শক্তিটাও প্রায় হারিয়ে। অথচ এ সংসারে যাবতীয় ঘটনা তার জানা চাই। যাবতীয় কথা তার শোনা চাই। মনে হচ্ছে সেই একসময় সর্বময়ী কর্ত্রী ছিল। ছিল সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। অথচ এখন 'কাল' তার সেই গৌরবময় 'কাল'কে অপহরণ করেছে।

কিন্তু বৈশাখী কে ? বৈশাখী কী ? বৈশাখী 'কেন ?' 'কবে ?' 'কখন' ?

*　　　　*　　　　*

প্রমিতার মা কর্তাকে ঝংকার দিয়ে বললেন, খুব একখানা বিয়ে দিয়েছ বটে মেয়ের। বিয়ে হয়ে মাস ঘুরে যেতে বসলো, এখনো পর্যন্ত মেয়ে জামাইকে একবার 'জোড়ে' আনতে পারা গেল না। এতো কাজ জামাইয়ের।

কর্তা অবশ্য একথা বলতে সাহস করলেন না, 'বিয়েটার প্রধান উদ্যোক্তা তো ছিলে তুমিই।'

কর্তারা যদি 'হককথা' শোনাতে বসেন তাহলে আর তাঁদের সংসার করতে হয় না। অতএব সে পথে না গিয়ে বললেন, কাজের ছেলেই তো ভালো। তা ওতো যেকোনো দিন আসতে রাজি। তুমিই আবার বায়না ধরলে রাত্রে থাকতে হবে।

বায়না মানে ? নিয়ম নয় ? বিয়ের রাত্তিরে চোরের রাত্রিবাসের মতো বাসরে কাটিয়ে পরদিন সকালেই বাড়ির একটা মেয়েকে নিয়ে সরে পড়ে। তারপর আর একবার সেখানে এসে রাত কাটাতে হয় না ? যা নিয়ম তাই বলেছি। ডাক্তাররা একদিন কোথাও যায় না ? আমি বলে দিচ্ছি তোমার জামাইয়ের ওই উত্তরপাড়ায় পড়ে থাকা চলবে না। কলকাতায় এসে ফ্ল্যাট নিক, চেম্বার খুলুক।

কর্তা গম্ভীর ভাবে বললেন, ওখানের ওর রাজ্যপাট তো দেখে এলে ? ভালোই তো আছে ?

খুকুর কথাটাও তো ভাবতে হবে ?

আগে তো ভাবোনি।

তখন কি ছাই ভেবেছিলাম জামাই এত কট্টর আদর্শবাদী। দেশের বাড়িতে দয়ার কারবার খুলে বসেছেন।

তা এখনই হঠাৎ জানলে কী করে ? ওঃ। প্রতিদিন মায়ে ঝিরে যে টেলিফোনে ঘণ্টা দুই করে গল্প হয়।

ও। তাতেও তোমার গাত্রদাহ ? টেলিফোনের বিল বাড়ে ?

কী মুস্কিল। সেকথা কে বলেছে ? যাক গে আমিই না হয় এগিয়ে গিয়ে নেমতন্ন করে আসি।

যাবে মানে ? তোমার একটা প্রেস্টিজ নেই ? ফোনে বলে দাও সামনের সপ্তাহে যেন নিশ্চয় আসে একবার। এবং অন্তত একটা রাত থাকে। তোমার কথায় কাজ হতে পারে।

কী আশ্চর্য। তোমার কথায় হবে না ?

হলো কই ? ওই এক অজুহাত, 'রাত্তিরে থাকাটা বাদ দিন না ? আসলে মেয়েমানুষের কথার দাম নেই।

যা সত্যি কথা তাই বলেছি। এই যে খুকু ? ওর কথা থাকবে ? বরের ইচ্ছে আর মত অনুসারেই চলতে হবে।

এ যুগে আবার তাই হয় না কী ? বরং বৌরাই তো দেখি বিয়ে হতে না হতেই বরগুলোকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে।

তোমার মেয়ে কতটা কি পারবে বুঝতে পারছি না।

আরে বাবা। এই তো মাত্র একটা মাস বিয়ে হয়েছে। এখনি অত হাল ছাড়ছ কেন ?

কেন জানো ? খুকু বলে, খুব নাকি সেকেলে টাইপের। ওই সেকে মার্কাদের কব্জা করা শক্ত।

শেষ পর্যন্ত করে তো ?

বলে প্রমিতার বাবা হেসে উঠে প্রসঙ্গে সমাপ্তি রেখা টানেন।

মনে মনে ভাবেন, আমাকেও তো তুমি বরাবর 'সেকেলে' বলে এসেছো। তা সে তোমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য স্বাধীনতার কোনো ব্যাঘাত ঘটেছে ? তাছাড়া এই 'সম্বন্ধে' তুমিই তো বেশি ঝুঁকেছিলে। বলেছিলে কৃতী ছেলে হয়ত পাবে, কিন্তু এমন চেহারাটি সহজে পাবে ? মহিলারাও এক ধরনে (বললে খারাপ শোনালেও সত্যি।) 'জামাই' নামক প্রাণীটির প্রেমে পড়েন। অন্তত প্রমিতার বাবার তাই ধারণা। বড় সংসারের ছেলে, দেখেছেন তো অনেক।

'জামাই' বলতে অজ্ঞান হন মহিলারা। তাকে খাইয়ে মাখিয়ে আদর করে আর দিয়ে থুয়ে যেন আশা মেটে না।

কেউ কেউ আবার মেয়েকে টেক্কা দিয়ে জামাইয়ের সামনে আধুনিকা প্রগতিশীলা প্রসাধিতা রূপবতী হয়ে ঝলসাতেও ভালবাসেন। কর্তার নিজের এক মাসীই ছিলেন সেইরকম। মামা আড়ালে গজগজ করে বলতেন 'জামাই' না 'বোনাই'! অ্যাঁ। এতো কী!

তো এসব কথা মুখে আনতে নেই।

কিন্তু এখন ভাবনা, মায়ে মেয়ে মিলে জামাইটাকে না কলকাতা কলকাতা করে উৎখাত করে। অথচ আশ্চর্য নমিতা নিজেই প্রথমে বলেছিল, 'উত্তরপাড়া তো বলতে গেলে কলকাতাই। ভাবনার কী আছে?'

মেয়ের অস্থিরতার হাওয়া গায়ে লেগে মন বদলাচ্ছে বোধহয়। কিন্তু কেনই বা এতো অস্থিরতা বাবা। অমন খোলামেলা বিরাট মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাতে কোনো গার্জেন নেই যাকে বলে মহারানীর পোস্ট। তবু অস্থিরতা খাস শহর থেকে মাইল কয়েক দূরে বলে। ওদের ওখানে বাড়ির সাজসজ্জা তো তেমন আধুনিকও নয়। শহরের মধ্যিখানে পশ এলাকায় একটা পাঁচতলা সাততলা উঁচু ফ্ল্যাট বাড়িই কি খুব আরামদায়ক? হঠাৎ যদি 'লিফট' বন্ধ হয়ে যায় তা হলে তো যমযন্ত্রণা।

বিভূতিভূষণ ভাবলেন, আসলে রাজনীতিকরা আর মেয়ে জাতটা সুস্থির থাকতে ভালবাসে না। 'সুখে থাকলেই তাদের ভূতে কিলোয়! সর্বদাই মনে হয় এ না হয়ে ওই হলেই ঠিক হবে। আবার সেটা বেঠিক হয়ে যায়।

বিভূতিভূষণকে দেখলে খুব মোটামুটিই লাগে। তাঁর গিন্নির মতে 'গাঁইয়া।' কে বলবে বিভূতিভূষণ সর্বদা মনে মনে কথা বলে চলেন।—

ডাক্তারদের বোধহয় বিয়ে করা উচিত নয়।

সন্ধ্যার পর স্নানের ঘর থেকে স্নান সেরে সর্বাঙ্গে পাউডার লেপে পায়জামা গেঞ্জি পরে বেরিয়ে এসে সোফায় বসে পড়ে হাসতে হাসতে বলে অদম্য, এখন এটা ফিল করছি।

প্রমিতা সারা বিকেল সারা সন্ধ্যা একা একা কাটায় হয়ত বা বই পড়ে, হয়ত বা গিটারটা টেনে নিয়ে একটু বাজিয়ে বেশিরভাগ বারান্দায় দাঁড়িয়ে এমনই। এ বাড়িটার মজা, উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম সবদিকেই চমৎকার একটা করে বারান্দা। ঋতুচক্রের আবর্তনের ওপর নির্ভর করে, আর দিনের

সময় বুঝে যখন যেভাবে যেটাকে কাজে লাগাও।

এখন বৈশাখের শেষ।

পড়ন্ত বিকেল থেকে সব দিকগুলোই কাজে লাগানো যায়। শুধু যা দৃশ্যের পার্থক্য। পূব দিকটায় বড় রাস্তা, পশ্চিমে বাড়ির ভিতরের উঠোন, উত্তরের দিকের নিচেটায় ডাক্তারের চেম্বারের সামনেটা আর দক্ষিণের ধারে অবারিত একটি বাগান। খানিকটা ফুলের বাগানের সীমানা, তারপর ফলের। এদিকে দাঁড়ালে মানুষের চেহারা চোখে পড়ে না। এদিকটাতেই ছিল অনেকক্ষণ প্রমিতা। সন্ধ্যা পার করেও। আর এই গাছ পালা ফুল ফলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিল, এমনও হয়ত কেউ আছে, যে এই পরিবেশে মোহিত হয়ে যাবে। প্রমিতার ভাগ্যকে হিংসে করবে।

কিন্তু প্রমিতার মনে হচ্ছিল, নিজের চারপাশে অনেকখানি জায়গা থাকলে নিজেকে যেন কেমন ছোট ছোট লাগে। আমার 'আমি'কে অতিক্রম করে 'প্রকৃতি' যেন তার নিজের মহিমা বিস্তার করে। মাপাজোপা ছোট বাড়িই বোধহয় ভালো। তাতে নিজের 'মাপটা'প্রধান থাকে।

সন্ধ্যার অনেকটা পরে অদম্য ফিরলো। ডাক্তারদের রীতি অনুসারেই দু'একটা কথা বলেই চটপট ঢুকে গেল স্নানের ঘরে।

অতঃপর এই মন্তব্য।

প্রমিতা বললো, উচিতবোধটা একটু লেট এ এসেছে মনে হচ্ছে।

সেইতো—

অদম্য এখন দুহাতে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে এনে বলে, আগুনে হাত না দেওয়া পর্যন্ত তো বোঝা যায় না আগুনটা কী বস্তু। উঃ। কত কষ্টে নিজেকে দমন করে রাখতে হয় ভাবো? এতক্ষণের বিরহদশার পর এসেই একটু আবেগ প্রকাশের উপায় নেই। সত্যি ভেবে ভেবে দেখছি ডাক্তারগুলোর ব্যাচিলার থাকাই ভালো।

প্রমিতা মৃদু হেসে বললো, আমারও তাই মত। তাহলে জগতের কিছু মেয়ের অন্তত ডাক্তারের বৌ হওয়ার বিড়ম্বনা থেকেই রেহাই।—উঃ ছাড়ো এবার।

অদম্য হো হো করে হেসে ওঠে।

আর ওই হাসির শব্দ মিলোবার পর ব্রজর গলার স্বর কানে আসে, 'কথাটা তোমার কতদিন বলেছি বামুনপিসি?'

কী বলেছে তা অবশ্য বোঝা যায় না।

অদম্য একটা সোফায় বসে পড়ে ভবিষ্যযুক্ত ভাবে। জানে এবার ব্রজরাজের আবির্ভাব ঘটবে।

ঘটেও। ট্রে করে দাদাবাবু বৌদির চা এবং খাবার সাজিয়ে এনে সামনের সেণ্টার পীসটার ওপর নামিয়ে রেখে ব্রজ বেজার গলায় বলে কতদিন বলেছি বামুনমাসিকে ভেটকির ফ্রাইগুলো দুবার ভাজলে বিস্বাদ লাগে, দাদা এলে আন্দাজ মতো সময় ভাজবে। তা নয়, বৈকাল বেলাই একবার করে ভেজে রেখে দেবে, এখন চটপট সাপ্লাই করতে পারবে বলে। যতসব গেঁয়োমি।

অদম্য ঝটপট একখানা ফ্রাই তুলে নিয়ে কামড় দিয়ে বলে, সে কী গো ব্রজদা। এতো ফাস্টক্লাশ হয়েছে।

তোমার তো সবই ফাস্টক্লাশ। কারুর ওপর দোষারোপ করার 'জো'টি নাই।

বাঃ। দোষের না হলেও দোষারোপ করতে হবে। আচ্ছা তুমি নিজেই খেয়ে দ্যাখো গিয়ে একটা।

চললুম আর কী! ওতে যেন মুরগীর ডিম নাই?

অদম্য একটু হেসে বলে, তাও তো বটে। ব্রজবাবুর তো এসব চলবে না। কিন্তু আচ্ছা ব্রজদা বামুনমাসিমা এসব ছোঁন?

কথাটা শুনেই প্রমিতার মন বিরূপ হয়ে যায়।

'ছোঁন।' ছোঁওয়াছুঁয়ি! কী অরুচিকর গ্রাম্য কথা। অথচ অদম্য কী অনায়াসেই উচ্চারণ করলো। তার মানে এই ধরনের ভাষাতেই অভ্যস্ত। উঃ। ভাবা যায় না।

ততক্ষণে ব্রজর উত্তর পরিবেশিত হয়ে গেছে।

অগ্রে তো ছুঁতো না। তা শেষ পরে ছেলে খাবে, আমি যদি ওইসব শুচিবাই করতে বসি, তো ভালোমন্দ কিছু খাওয়াই হয় না ছেলেটার। তো পিসিমা মাসিমা ও বাড়ির বৌদিদি এনাদের কাছ থেকে শিখে নিয়েছে কিছু কিছু।

তারপরই ব্রজ হেসে উঠে বলে, তো আমি বলেছি আমাদের বৌরানী য্যাখন এইসব শখসাধের রান্না রেঁদে দাদাবাবুকে খাওয়াবে তখন তুমি বরং একদিন গঙ্গাছ্যান করে শুদ্ধ হয়ে নিও মাসি। কই আপনি খাচ্ছেন কই বৌরানী? খান। এই পটে লিকার রইলো ঢেলে নেবেন।

প্রমিতার মনে হলো, 'কাজের লোকজনের' সঙ্গে এতো গায়ে পড়া কথা বলার ফলে, ওদের গায়ে পড়তে আসার সাহস হয়। এ একেবারে যেন সেই পেটেণ্ট সিনেমা থিয়েটারের 'পুরাতন ভৃত্য'।

সেকেলেপনার শেকড় গাড়া আছে এখানের শিরায় শিরায়।

কী হলো ? খেলে না ?

এই তো—

বলে একটা ফ্রাই তুলে নিয়ে প্রমিতা বলে, তোমার ওই 'ব্রজরাজ' তোমায় 'তুমি' করে কথা বলে ?

অদম্য হেসে উঠে বলে, এখন তাই বলে বটে। তবে যতদিন স্কুলবয় ছিলাম 'তুই' ছাড়া ভুলেও তুমি বলত না।

ও। তা ভালো।

অদম্য তখন বলে ওঠে, আরে আসল কথাটাই তো বলা হয়নি তোমায়। তোমার বাবা ফোন করেছিলেন। নিচে চেম্বারের ফোনে।

বাপী! চেম্বারের ফোনে!

সেই তো মজার কথা। কী গম্ভীর গলায় প্রশ্ন 'ডক্টর বোসকে একটু পাওয়া যাবে ?' আমি তো গলা শুনে বুঝতেই পারিনি প্রথমটা। যখন জিগ্যেস করলাম কোথা থেকে বলছেন ; তখন হেসে উঠলেন, 'চিনতে পারলে না তো ?' বলে।

প্রমিতা ভুরু কুঁচকে বললো, হঠাৎ জামাইয়ের সঙ্গে ঠাট্টা যে ?

ঠাট্টা আর কী ! মজা কৌতুক। তো আসল কথা এবারে আর ছাড়ান নেই, তোমাদের ওখানে গিয়ে দুদিন থাকতেই হবে আমাদের।

সে তো মা রোজই বলেন।

অদম্য হেসে ফেলে, এখন বোধহয় মা খুব চোটে গেছেন। তাই ওনাকে দিয়ে—না না, সত্যি খুব অন্যায় হয়ে গেছে আমার। তোমার বাবা বললেন, এই 'যাওয়া থাকা' এ নাকি বিয়ের অনুষ্ঠানের 'ডিউপার্ট'।' এ অনুষ্ঠানটি না হলে বিয়েটা সিদ্ধ নয়। তার মানে আমাদের বিয়েটা এখনো অসিদ্ধ। হা-হা-হা।

বাপী বললেন এই কথা ?

বললেন, তো।

হুঁ। তাহলে দেখছি বাপীর এই ক'দিনেই অনেক উন্নতি হয়েছে। তা তুমি কী বললে ?

বললাম কালই বিকেলে চলে যাচ্ছি আপনার মেয়েকে নিয়ে। সেখানে যা হুকুম করবেন। তবে আর একটি প্রস্তাব দিয়েছেন, সেটা বড় মর্মঘাতী।

তার মানে ?

তার মানে হচ্ছে—বলেছেন আমি দু দিন পরে ফিরে এলেও তোমাকে

সপ্তাহ খানেকের জন্যে অন্তত রেখে আসতে।

সপ্তাহ খানেক। মা তো রোজ বলে অন্তত দিন পনেরো থেকে আসতে : বিয়ের পর আমাদের আত্মীয়কুল মায়ের বান্ধবীকুল কেউ আমায় দেখেনি। আমার এক মাসি তো বলেছে না কি, 'সেকালের নবাব বাদশাদের মতন বিয়ে করেই একেবারে হারেমে পুরে ফেললো না কী ওর বর ?'

বলেছেন এ কথা। ছি ছি। নাঃ এ অপবাদ খন্ডন করা দরকার। সত্যি মিতা, আমাকে বোধহয় তোমার খুব স্বার্থপর মনে হয় ?

স্বা-র্থ প-র। কই এখনো ভেবে দেখা হয়নি।

ভাবো নি সেটা তোমার মহত্ব।

'মহত্ব'। বাঃ। বেশ সুন্দর সার্টিফিকেটটি তো। তবে এরকম সার্টিফিকেটে বিপদ আছে।

বিপদ !

বাঃ বিপদ নয় ? এ সার্টিফিকেটটি দেওয়া মানেই তো তা মাথায় একটি বোঝা চাপিয়ে দেওয়া। 'মহৎ' তাকে হতেই হবে। 'মহৎ' হওয়া ছাড়া গতি নেই !

ও হো হো। হা হা হা। বেশ বলেছ তো ?

নীতু বললো, হ্যাঁ কী বলছিলি তখন ? অমুর বিয়ের নেমন্তন্নয় পক্ষকাল ধরে কী কী খেয়ে এলাম, তার তালিকা শুনবি। তাই না ?

বৈশাখী রেগে উঠে বললো, ভাল হবে না বলছি ছোটোমামী।

বাঃ। তখন তো তাই বললি।

বলেছি তো বলেছি। আবার ফিরিয়ে নিচ্ছি।

নীতু বৈশাখীর পিঠে একটা হাত রেখে বলে আয় বোস। আসল গল্পটাই তাহলে শোন। বৌ দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে সেতো বলেইছি। আচার আচরণও খুব ভদ্র মার্জিত। তবে কি জানিস একটু যেন আড়ষ্ট আড়ষ্ট।

বাঃ। নতুন বৌ তো এরকম হবেই।

তা বটে। তবে অমুটা আবার তেমনি খোলামেলা তো। তবে 'আড়ষ্ট রোগটা' সারবে বা কী করে ! ওই বৃহৎ বাড়িটায় বেচারাকে সর্বদাই তো একা থাকতে হবে। ডাক্তারের বৌ হওয়ার এই একটা জ্বালা।

বৈশাখী হেসে উঠে বলে, তা বটে। ভাগ্যিস ! খুব রক্ষে পাওয়া গেছে ! কী বল ?

নীতু ওর দিকে তাকায়।

নীতু আস্তে বলে, আমি কিছু ভেবে বলিনি শাশ্বী।

ওমা। আমিই কি কিছু ভেবে বলেছি না কী। যাই বাবা। একটু শুয়ে পড়ি গে। ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। বোশেখ মাসের বিকেলের দিকের হাওয়াটা বেশ। না ছোটোমামী ?

বলে উঠে যায় একটা হাইতোলার ভঙ্গিতে।

নীতু তাকিয়ে থাকে সে দিকে!

মনে মনে কল্পনা করে ওই বিয়ে বাড়িটায় প্রমিতার জায়গায় এই মেয়েটাকে বসিয়ে দিলে কেমন মানাতো!

তাই তো কথা ছিল!

অনঙ্গ ডাক্তার ওর সেই এতটুকু বেলা থেকে বলতেন, তোর এই ভাগ্নীটাকে আমি আমার ছেলের জন্যে 'বুক' করে রাখছি নীতু। তোর শাশুড়িকে বলে রাখিস বাবা। আমি থাকি বা থাকি—

নীতু রেগে বলতো ভালো হবে না বলছি বড়দা।

তারপর আবার বলতো, আহা! কী এমন একখানা মেয়ে। অমুর বুঝি আর কনে জুটবে না ? তাই এখন থেকে বাক্যদত্ত করে রাখতে হবে। অমুর জন্যে আরো কতো সুন্দর মেয়ে পাবেন আপনি।

অনঙ্গ ডাক্তার হাসতেন, 'আরো' সুন্দরীতে কাজ নেই আমার রে। ওতেই হবে। মেয়েটার চেহারায় কী যে একটি লাবণ্য আছে। মুখখানিতে যেন দেবী ভাব। বড় হয়ে বৌ হয়ে এ বাড়িতে ঘুরে বেড়ালে কেমন দেখাবে তাই মনে মনে ভেবে দেখি।

কিন্তু নীতুর একটা দূর সম্পর্কের ভাগনী অনঙ্গ ডাক্তারের চোখে পড়ে কোন সুবাদে। 'দূর সম্পর্কে'রই বলা চলে। মাসতুতো ননদের মেয়ে।

তবে ভাগ্যচক্রে কতো কীই হয়। নীতুর শাশুড়ি যখন সংসারের অধিশ্বরী তখন তিনি তাঁর এক সদ্যবিধবা বোনঝিকে কাছে নিয়ে এসেছিলেন কোলে একটা মাস কয়েকের বাচ্চা সমেত। বোন কবে মরেছে ভগ্নিপতি সম্পর্ক রাখে না, তার মেয়েকে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসার কি কোনো যুক্তি ছিল ? কর্তা বলেছিলেন, কেন মিছিমিছি পরের ঝামেলা ঘরে এনে তুলতে চাইছো ? তোমারই জ্বালা বাড়বে।

গিন্নী রুষ্ট গলায় বলেছিলেন, তুমি যখন তোমার বিধবা বোনকে পাঁচটা

ছেলেমেয়ে শুদ্ধ ঘরে এনে তুলেছিলে, এ কথাটা ভেবেছিলে ? সে জ্বালাগুলো পোহাচ্ছে কে ?

কর্তা সরে পড়েছিলেন।

অতঃপর বৈশাখীর এই বাড়িতেই স্থিতি। তখনো নামকরণ হয়নি। জন্ম তারিখ শুনে নামটা মায়ের মাসিই দিয়েছিলেন—তা বেচারি মাটারও সুখ সইলো না। অকালেই মরে গেল।

নীতুর যখন বিয়ে হয়েছিল নিতান্ত বালিকা সদ্য মা মরা মেয়েটা পাঁচজনের হাতে গড়িয়ে গড়িয়ে মানুষ হচ্ছে। কেমন করে যেন ভারটা নীতুর হাতেই পুরো পড়ে গেল। আর মেয়েটাও একদম ছোটোমামীর অনুরক্ত ভক্ত হয়ে গেল। ছোটেমামী উত্তরপাড়া গেলে সে নাছোড় হয়ে সঙ্গ নেবে।

নীতু বাপের বাড়ি (অর্থাৎ ভাইয়ের বাড়িই) যাবে অতএব বৈশাখীর ফ্রক সেমিজ এটা সেটা নামকা ওয়াস্তে বইখাতাও নীতুর সুটকেসে ঢুকে পড়তো আগে থেকেই।

অন্যমামীরা বলতো, ছোটোমামী গেলেই তোরও যেতে হবে ? কেন ? আমরা বুঝি তোকে একা পেয়ে পিটুনি দেব ?

আহা। তাই বলেছি ?

বলিসনি, কাজে দেখাস। কুটুম বাড়িতে আবার সব সব সময় যাওয়া কি ? মাও তো বেশ রাজি হয়ে যান। ছোটোমামীর ঝপের বাড়ির সঙ্গে তোর কিসের সম্পর্ক রে ?

বৈশাখী অবলীলায় বলতো, ওসব জানি না। ছোটোমামীকে ছেড়ে আমি থাকতেই পারি না।

ওঃ। দেখিস। যখন শ্বশুরবাড়ি যাবি মামীকে সঙ্গে নিয়ে যাবি বুঝি ?

এদিকে অনঙ্গ ডাক্তার নীতুকে বলবেন, উঃ এতো দেরি করে আসিস তুই। সাতবার বলে পাঠাতে পাঠাতে তবে আসা হয়।

নীতু মনে মনে বলে, 'সংসার' জায়গাটি যে কী ভয়ঙ্কর প্যাঁচালো তাতো আর জানলে না বড়দা। দেবীর মত গিন্নি পেয়েছিলে। আমার শ্বশুর-বাড়িটিকে দেখলে বুঝতে। অবশ্য নীতুর শাশুড়ি তেমন কিছু বলেন না। কারণ নীতু তার বড়দার প্রস্তাবটি যে চুপি চুপি শাশুড়িকে জানিয়ে রেখেছে।

তিনি অবশ্য হতাশ হতাশ ভাবে বলেছিলেন, ছেলেবেলায় অমন কত লোক কতো কীই বলে ছোটোবৌমা। 'ওকে আমি জামাই করবো ওকে আমি ছেলের বৌ করবো'—পরে কি আর সে সব কথা দাঁড়ায় ? তোমার অমন চাঁদের মত ভাইপো তোমার দাদার সর্বোস্বিরওয়ারিশন একমাত্র সন্তান লেখা-

পড়ায়' ভালো, পরে আরোই ভালো হবে; তখন কি আর আমার এই অনাথা নাতনিটাকে—

নীতু অবশ্য জোর দিয়ে তেমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেনি। সত্যি তো ভবিষ্যতে, ঘটনার গতি কোনদিকে যায়। তবু নিজের মধ্যে বিশ্বাসটা দৃঢ় ছিল। 'বড়দা বৌদি' দুজনেই যে খাঁটি সোনা।

বৈশাখী যে তার ছোটমামীর এতো ভক্ত সে কি নিজের জীবনের সঙ্গে নীতুর 'জীবনের কিছুটা মিল দেখে। নীতুও শৈশবে মা বাপ হারানো, অপরের কাছে মানুষ। তবে সেই অপরটি বংশেরই এই যা। তো নীতুর ভাগ্যে জ্যাঠা জেঠিই বা ক'দিন ছিল? প্রকৃত পক্ষে বেড়ে উঠেছে ওই বড়দা বড়বৌদির স্নেহচ্ছায়ায়। তাঁদেরও তো একটাই মাত্র সন্তান। নীতুর কাছাকাছি বয়সের ওই অদম্য। খুবই কাছাকাছি বয়েস। তবু—ছেলেবেলায় নীতু ছিল একাধারে অদম্যর খেলার সঙ্গী রক্ষণাবেক্ষণকারিণী আবার গার্জেনও। কাজের লোকজন অনেকেই ছিল, তথাপি নীতু ভাবত তার বারোমেসে রুগি বৌদিটির ছেলেটার দায়িত্ব তারই। অতঃপর বৌদিও গত।

খুব ঘটাপটা করেই বড়দা তাঁর খুড়তুতো বোনের বিয়ে দিয়েছিলেন, তা'ও তো ভাগ্যে সইলো না। শৈশবে মাতৃহীনেদের কপালে সুখ সয়না।

বৈশাখী এই চিরদুঃখিনী অথচ আপাতদৃষ্টিতে যেন পরম সুখী আনন্দময়ীমূর্তি ছোটমামীর সঙ্গে কোথায় যেন তার নিজের সত্তার মিল পায়। তাই 'ছোটমামী-ছোটমামী।'

নীতু ঠাকুর মন্দিরে গঙ্গাস্নানে গেলেও সে তার সঙ্গ নেবেই।

নীতুর বড়জায়েরা যদি বলে, জ্যেঠতুতো দাদার বাড়িটা যদি 'বাপের বাড়ি' হয় তাহলে আরশোলাও পাখি। তাতে অবশ্যই—জোর প্রতিবাদ চলে না। তবু বাপ জ্যাঠার বাড়ি বলে সে মন্তব্য সয়ে নেওয়া যায়।

কিন্তু সেই জ্যেঠতুতো দাদাটিও গত হলে?

ভাইপোর বাড়ি।

তাকেও যে ছোটোবৌ বাপের বাড়ি বলে চালাতে চায় তার কারণ বড়লোকের বাড়ির আরাম আয়েস খাওয়া মাখার আকর্ষণ।

আসল 'খাওয়ার' ঘরে শূন্য?

তাতে কী? দুধ ঘি ছানা মাখন মণ্ডা মেঠাই বাগানের ফল কি নয়? গেরস্থঘরের বিধবার জুটবে এসব?

বাপের বাড়িহীন ছোটোবৌয়ের এই বাপের বাড়ির আদর দেখে অন্যদের চোখ টাটাবে না ? আর যখন তখন ভাইপো ডাক দিলে রাগে গা জ্বলে যাবে না ? ছেলেপুলেহীন হাতপা ঝাড়া একটা দস্যি বিধবা সংসারকরণীর কাণ্ডারি নয় ? বলতে গেলে পায়ের তলার মাটি মাথার ওপর ছাতা। তবে যেটা মুখে বলা হয়না এই যা। কার দায়ে পড়েছে এতটা ঋণ স্বীকার করবার ?

তা সে কথা যাক। কিন্তু বৈশাখী ? কই তার তো সেই উদার আশ্বাসের ঘরে ঠাঁই হলো না।

হবে কী করে ? যার জন্মলগ্নে শনি রাহু তার কী অমনি উদার মানুষের ভালবাসাতেই জীবনের ছক বদলে যায় ? নীতুরই বা বদলালো কই ?

ভালো ছেলে দেখেই তো সেই উদার ব্যক্তিটি বিয়ে দিয়েছিলেন নীতুর। রেলের চাকরি, ভালো চাকরি, বদলির চাকরি। নীতু যেমন বৈচিত্র্যপ্রেমী তার পক্ষে উত্তম।

কিন্তু ওই জন্মনক্ষত্রে কলকাঠি।

বৈশাখীরও তাই হলো।

বৈশাখী যখন বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে, এবং অনঙ্গ ডাক্তার তাঁর মেয়ের বয়সী ছোটবোনের সঙ্গে চুপিচাপি পরামর্শ করছেন অদম্যকে বিদেশে পড়তে পাঠাবার আগে বিয়েটা সেরে ফেলতে হবে। তোর শাশুড়িকে জানা এবং সবাইকেই এবার জানা। বাদে অদম্য।

না এতদিন নীতু আর কাউকে বড়দার প্রস্তাব বলে বেড়ায়নি। কে জানে কী হয় শেষ অবধি।

কিন্তু নীতুর ভাগ্য। অথবা বৈশাখীর ভাগ্য। খবরটা তো বৈশাখীর সেই বিস্মৃতপ্রায় পিতৃগৃহে দিতেই হবে। দেওয়া মাত্রই দুই কাকা আর এক জ্যাঠা (যাঁরা এযাবৎ ওই মেয়েটার উদ্দেশ নেওয়ার ধার ধারেননি) এসে হাজির হয়ে হিসেব করে ফতোয়া জারি করলেন 'এ বিয়ে হওয়া অসম্ভব। পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষ এক গোত্র না ?"

বৈশাখীর মায়ের মাসি অর্থাৎ নীতুর শাশুড়ি কাতরভাবে তাঁর নাতনির ওই 'নিরুদ্দেশ' কাকা জ্যাঠার কাছে মিনতি জানালেন। 'এখন আর অত মানামানি তো নেই তেমন ?'

তাঁরা সদর্পে বললেন আপনিও কি এখনকার ? আঁ ? না না। আমাদের বংশে আজ পর্যন্ত এসব অনাচার ঢোকেনি। হতে পারে আপনি ওর মাকে আশ্রয় দিয়ে মা-বাপমরা মেয়েটাকে মানুষ করেছেন। তা মাসি

পিসিতে এমন করেই থাকে। তাই বলে আমাদের বংশ মর্যাদাটা তো কিনে নেননি।

ছি ছি এ কী কথা।

মহিলা তাঁর মৃতা বোনঝির দেওর ভাসুরের কাছে হাত জোড় করে বললেন, সে কথা নয়। তবে মস্ত একটা মান্যিমান মানুষ যেচে বলেছেন! অমন 'ঘর বর।'

পয়সার লোভে নীতি বিসর্জন দেওয়া চলবে? আচ্ছা ঠিক আছে আমরাই সেই পয়সাওলাকে জানিয়ে দিচ্ছি গিয়ে, এ বিয়ে হতে পারেনা।

সেই জানিয়ে দেওয়াটি দিতে গেলে কী হতো বলা শক্ত। কারণ সেই মানুষটি যদিও পরম ভালমানুষ কিন্তু বদলোকের কাছে দুর্দান্ত দঁদে।

কিন্তু ওই 'শনিরাহু।'

ওঁরা যেদিন তোড়জোড় করে উত্তরপাড়ায় গিয়ে হাজির হলেন, সেখানে সেদিন অকস্মাৎ বজ্রপতন ঘটে গেছে।

স্টেশন থেকে লোকের মুখে সেই দুঃসংবাদের কথা ছড়িয়ে পড়লো।

'ইন্দ্রপতন ঘটে গেল।'

'গরিবের মা বাপ ছিলেন।'

'একা ওনার ছেলেটিই 'পিতৃহারা' হলো না, অনেকজন 'পিতৃহারা' হয়ে গেল।'

এনারা বললেন কী ব্যাপার?

কি আর ব্যাপার! বিনামেঘে বজ্রাঘাত। অনঙ্গ ডাক্তার চলে গেলেন। হার্টফেল! এতো লোকের রোগনির্ণয় করে বেড়িয়েছেন, আর নিজের শরীরের মধ্যের রোগের বাসাটির খোঁজ রাখেননি!

এঁরা ভাবলেন যাক বাঁচা গেল। বিনা যুদ্ধে রাজ্যদখল। আবার একটু দুঃখও পেলেন, একটা 'মান্যিমান' লোকের মুখের ওপর দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে সনাতন ধর্মের ধ্বজা ওড়াবার সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে।

*　　　*　　　*

অতঃপর?

অতঃপর সদ্য মাথা ন্যাড়া হওয়া অদম্য তার পূর্ব নির্দিষ্ট সমস্ত ব্যবস্থা মতো আকাশযানে উঠে বসলো।···

প্রথমে বলেছিল, দূর! যাব না। আর কোনো কিছুতেই উৎসাহ নেই আমার।

ব্রজ বলেছেল, সে কাজ করলে কর্তাবাবুর আত্মাটা খুব সুখী হবে? কী

আকাঙ্ক্ষা ছেল তাঁর ভাবো ? মায়েরও তোমার সেই ছোট্টকাল থেকে বাসনা ছেলো, 'তুমি বিলেত যাবে, অনেক বিদ্বান হয়ে আসবে ।'

* * *

অদম্য ডাক্তারের মৃত্যো মায়ের অনেক বাসনা ছিল, একমাত্র সন্তানকে ঘিরে। কিন্তু ওই বৈশাখী নামের মেয়েটার ? তার জন্যে কারও কোথাও 'বাসনা' করবার ছিল না। যে মান্যমান মানুষটা হঠাৎ তাকে ঘিরে একটু বাসনার স্বপ্ন দেখছিল ! স্বপ্ন দেখছিল ছেলে বিদেশ যাবার আগে বাড়িতে একটা দারুণ উৎসব লাগিয়ে দেবে, সেও তো সহসাই 'প্রবাস' ত্যাগ করে 'স্বদেশে' পাড়ি দিলো। তবে ?

তবে আর কী। বৈশাখীর হঠাৎ গজিয়ে ওঠা অভিভাবক জ্যাঠা কাকারা দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি কুলশীল গণ গোত্র মিলোনো 'পাত্র' জোগাড় করে এনে দিয়ে বৈশাখীর মায়ের মাসিকে চেপে ধরলেন বিয়েটা মিটিয়ে ফেলতে। বয়েস তো নেহাৎ কম হয়নি মেয়ের।

যদিও মায়ের মাসির তখন গৌরবের দিন প্রায় গত। কর্তা গেছেন, ছেলের বৌয়েরা গিন্নি বান্নি হয়ে উঠেছে। তারা কর্ত্রীর সমালোচনা করতেও ছাড়েনা দেওয়ালকে শুনিয়ে শুনিয়ে। তথাপি বিয়ের ঘটাপটা কম হয়নি। এবং বড় মেজ দুই বৌয়ের গা করকর করলেও, দিদিমা ওই তুতো নাতনীকে নিজের বেশ কিছু ভারীভারী গহনা ও উপহার দিয়ে বসেছিলেন।

কিন্তু সে গহনা ভোগে লাগলো আর ক'দিন ?

'অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাবে বলো ?'

জ্যাঠা কাকারা পাঁজিপুঁথি দেখিয়ে গণ গোত্তর মিলিয়ে যোটক বিচার করে রাজযোটকই করেছিলেন, কিন্তু ভটচায মশাইতো অন্তর্যামী নন যে, জেনে ফেলবেন ওই সুপাত্রের শরীরের অন্তরে কোনো একখানে একখানি 'মৃত্যু' রোগ বাসা বেঁধে বসে আছে।

আর কেউ ছার, সে তো নিজেই টের পায়নি। কিন্তু টের যেই পেল, রোগের চিকিৎসায় হাত পড়লো। সেইমাত্র সে রোগ যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়ার মতো হু হু করে বেড়ে উঠে বৈশাখীর জীবনকে গ্রাস করে ফেলে শ্মশানে দাহ করিয়ে ছাড়লো।

তারপর ?

তারপর আবার সে বৌকে কে ঘরে নেবে ? ভদ্রেশ্বরের মিত্তিরবাড়ির মতো ভদ্র আর কজন ? আর বৈশাখীর সেই জ্যাঠা কাকাও কিছু আর উটকো জঞ্জাল ঘরে তুলবেন না। অতএব যেখানকার জিনিস সেখানেই রয়ে গেল।

*   *   *

বছর তিনেক পরে বিদেশ থেকে ফিরে এসে অদম্য জোর তলবে বাবার রোগীগুলোকে (তার ভাষায়) পটল তোলাবার ভার নিয়েছিল। তার মধ্যেই হঠাৎ একদিন নীতুকে শুধোলো আচ্ছা নীতু পিসি তোমার সেই 'ভাগ্নী' না কে! তার কী হলো? যাকে দেখে বাবা একেবারে মোহিত হতেন! তার খবর কী?

হ্যাঁ অনঙ্গ ডাক্তার মোহিত হতেন, তবে ছেলের কাছে কোনোদিন কোনো ইচ্ছে ব্যক্ত করেননি। আর অদম্য? সেই বা কোন সাহসে নিজের ইচ্ছেটা ব্যক্ত করবে? প্রেমে পড়াপড়ি তো আর হয়নি। একটু বড় হয়ে যাবার পর থেকে তো বৈশাখীর ছোটমামীর সঙ্গে আসা বন্ধও হয়ে গিয়েছিল পরিবারের সদস্যদের টীকা টিপ্পনিতে আর কর্ত্রী'র ব্যাধি। দুজনেই যদি নাচতে নাচতে চলে যায় তো পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষটার সেবা করে কে? কার এতো সময়?

নীতু ভাইপোর প্রশ্নে উদাস গলায় বলেছিল তার খবর? খুবই সংক্ষিপ্ত! বিয়ের বয়েস হয়ে গেছে বলে তার নিরুদ্দেশ জ্যাঠা কাকারা দুমদাম একখানা বিয়ে দিয়ে দিলো। আর বিয়ের পরই ধরা পড়লো বরের লিভারে ক্যানসার। তার পর আর কী? সেই বর যেখানে 'যাবার' সেখানে চলে গেল, বৈশাখী বরাবর যেখানে থাকে সেখানেই রয়ে গেল। আমাদের নিরামিষ রান্নাঘরে মৌরুশি পাট্টা করে নিয়েছে আর বুড়ি দিদিমার সেবা করছে।

কথার মাঝখানে অদম্য একটিও কথা বলেনি। কথার শেষে শুধু বলে গেল মার্ভেলাস!

উঠে চলে গেল অন্য ঘরে।

তারও অনেকগুলো দিন বাদে একদিন অনঙ্গ ডাক্তারের বাড়িতে উৎসবের হাওয়া উঠলো? সবাই মিলে ধরাধরি করে অদম্যকে টোপর পরিয়ে ছাড়লো। তা এখনও নতুন বৌ ফিরে উল্টে আবার বাপের বাড়ি যায়নি। এ যুগে ব্যাপারটা প্রায় অঘটনের মতো। কিন্তু বৌয়ের মায়ের যে প্রতিজ্ঞা 'জোড়ে আসা চাই রাতে থাকা চাই।' আর তার আগে অদিনে অক্ষণে আসা চলবে না।

টেলিফোনে মেয়েকে আশ্বাস দিয়ে রেখেছেন, এরপর যখন ইচ্ছে তখন চলে আসবে। আর তো কোনো বিধি নিষেধ থাকবে না।

এখন আপাতত বিধিবন্ধ ভাবে দুজনে জোড়ে এলো প্রমিতাদের পার্ক-সার্কাসের বাড়িতে।

কিন্তু সেখানে যে প্রমিতার জন্যে একটি জ্বালা মজুৎ ছিল কে জানত?
তা জ্বালা ছাড়া আর কী?

যখন প্রমিতার বাবার পার্ক সার্কাসের সেই বাড়িটিতে সদ্য আগত মেয়ে জামাই নিয়ে আহ্লাদের হৈ হুল্লোড় চলছে, তখনই কি না প্রমিতার মায়ের দাদার বাড়ি থেকে এক বার্তাবহ এসে হাজির বিশেষ জরুরি চিঠি নিয়ে। টেলিফোন খারাপ তাই দূত প্রেরণ।

না বার্তাটা কিছু খারাপ নয়। ভদ্রলোক জানিয়েছেন আগামীকাল সকালে তাঁর মেয়েকে কনে দেখতে আসবে অতএব বোন আর ভগ্নিপতি দুজনে যেন চলে আসেন। ফোনে বলতে না পেরে—

কিন্তু এর মধ্যে প্রমিতার জ্বালাটা কী?

জ্বালা? জ্বালা সেই বার্তাবহটি! যাকে দেখেই অদম্য ডাক্তার বলে উঠলো আপনিতো মশাই আচ্ছা লোক! শুধু শুধু সেদিন আমায় ঠকালেন।

ঠকালাম?

না তো কী? এই আপনার বান্ধবীটিকে আশ্বাস দিয়ে গেলাম, ভদ্রলোককে এক্ষুণি নিয়ে আসছি'—গিয়ে দেখি আপনি হাওয়া!

প্রমিতা বললো, তখনি বুঝেছি ওই ছন্নছাড়াটা তুই ছাড়া আর কেউ নয়। অমন বন্ধুর মতো কাজ আর কে করবে!

পলাশ খুব গোঁজামিল করে যা কৈফিয়ৎ দিল তা হচ্ছে কাজ ছিল। শরীর খারাপ ছিল! খবর না দিয়ে গিয়ে পড়ায় অস্বস্তি ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি।

তা আমাকে তোর অপরূপ কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করার মানে? আমি কোনোদিন তোর কবিতাকে ধন্যি ধন্যি করেছি?

পলাশ লজ্জায় কুঁকড়ে গেল। ফুলফোর্সে ঘূর্ণ্যমান পাখার নিচে বসে ঘেমে উঠলো।

অদম্য বললো, কী আশ্চর্য! একজন কবি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থখানি তোমাকেই উৎসর্গ করেছেন। এতে আহ্লাদে উৎফুল্ল না হয়ে এ রকম বাক্যযন্ত্রণা দিচ্ছো? আমার ভাগ্যে এমন ঘটলে তো আমি—

কী? নিজেকে ধন্য মনে করতে? এই হতভাগা 'ছন্নছাড়া' তোর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থখানা না হয় এই সৃষ্টিছাড়া লোকটাকে উৎসর্গ করিস।

পলাশ অনেক কষ্টে বলে দ্বিতীয়খানা? সে তো আমার সৌভাগ্য। তবে সে সুযোগ কবে আসবে একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন।

ওরে বাস! তুই যে দেখছি হাটে বাজারে 'ঈশ্বরকে'ও টেনে আনতে শিখেছিস। অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু এতো হতাশার কী আছে? তোর তো শুনেছি ডজন ডজন কবিতার খাতা আছে। একেবারে উপছে পড়া।

বাঃ। একথা কে বলেছে তোমায় ?

কত জন। তোর ভক্ত কি কম আছে রে ? দেশে গরু গাধার অভাব আছে ? কথার সুরে ব্যঙ্গ আর হ্যানস্থা।

প্রমিতার যেন এ একটা ইচ্ছাকৃত বিলাস। অদম্যকে দেখিয়ে দেওয়া ওই হতভাগা কবিটাকে তুমি যদি আমার প্রেমিক বলে ভেবে থাক, সেটা তোমারও বোকামি। আমি ওকে মনিষ্যি বলে গণ্যই করিনা।

এটা হয়ত নারীজাতির একটি দুর্বলতা। নিজেকে বিকশিত করার বাসনায় অনুরক্ত বা বশ্যজনের ওপর নিজের কতটা প্রভাব আধিপত্য, তা বোঝাবার জন্যেই তাদেরকে অপরের সামনে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা বেপরোয়া হ্যানস্থার ভঙ্গি দেখানো, অকারণ প্রগল্‌ভতা। স্বামীর সম্পর্কে তো সর্বদাই এহেন ভঙ্গি। সখী বান্ধবীদের সামনে বেপরোয়া বলা, 'ওর কথা বাদ দাও! ওর দ্বারা কিছু হয় নাকি ? ওর ভরসায় বসে থাকলে আর আমার সংসার করা হয়েছে। কোন বুদ্ধিধরদ্বারা যে লোকটা অফিসে একটা উঁচু চেয়ার বাগিয়ে বসে আছে তা ও জানে আর ওর বস জানে।'

প্রমিতার মায়েরই বাক্য বিন্যাসে এই 'নারী' জনোচিত ভঙ্গীটি ধরা পড়ে। তিনি অবশ্য স্বামীকেই সর্বদা নস্যাৎ করে ক্ষান্ত থাকেন। অন্য কোনো ক্ষেত্র নেই তাঁর।

প্রমিতার 'ক্ষেত্রটা' এখন আলাদা।

অদম্য এটা বুঝতে পারবে না এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। অদম্য 'সাদাসিধে' হতে পারে বোকা নয়। অতএব মনে মনে একটু হাসলো। কিন্তু তার সঙ্গে ছেলেটার ওপর তার একটু মায়াও হলো। বেচারা।

প্রমিতা যে তাকে এমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে এতেই যেন সে মুগ্ধ বিহবল।

প্রমিতার মা এসে ঘরে ঢুকলেন হাতে মিষ্টির প্লেট। তাতে কাটা আমের টুকরো। পিছনে কাজের মেয়েটা চা আর জল নিয়ে।

পলাশ তদ্‌ব্যস্ত হয়ে এমন 'না না এসব আবার কেন' বলে নড়ে উঠলো যে মেয়েটার হাত থেকে চা চলকে গেল।

প্রমিতার মা মৃদু হেসে বললেন, বাঃ তুমি আমার বাপের বাড়ির পাড়ার ছেলে! এসেছ একটি ভালো দিনে একটু মিষ্টিমুখ করবে না ? খুকুই তো একরাশ মিষ্টি এনেছে সঙ্গে। আর এই আম ওদের নিজেদের বাগানের।

শুনে পলাশ এমন মোহিত হলো যে, 'অ্যাঁ তাই বুঝি ? কী আশ্চর্য।' বলে আগেই আমের টুকরো তুলে নিল চামচে।

প্রমিতা হি হি করে হেসে উঠে বললো, এতে হঠাৎ আশ্চর্যের কী দেখলি ?

না। মানে নিজেদের বাড়ির বাগানে এমন সত্যিকার ভালো আম হয়? তাই বলছি—

এখন সবাই হেসে উঠলো। আর অদম্য তো স্বভাবসিদ্ধ সশব্দে। তারপর বললো, সত্যিকার গাছে সত্যিকার আম হবে এ আর কী আশ্চর্য! আমার তো বরং সত্যি আশ্চর্য লাগে কবিতা লেখা দেখলে! কত সহজে কত নির্ভয়ে মনের কথাটথা বলে ফেলা যায়!

পলাশ কুণ্ঠিত হাসি হেসে বলে, কতটুকুই বা বলতে পারা যায়? প্রকাশের ক্ষমতা থাকলে তবে তো? যাঁরা সত্যিকার কবি তাঁদের কথা আলাদা।

অদম্য বলে ওঠে, কবিদের সম্পর্কে আমার কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। কাজেই ওকথা থাক। বরং পুরনো প্রসঙ্গে আসি। চলে আসুন একদিন আপনার বান্ধবীর বাড়ি। সত্যিকার আম্রকুঞ্জে বসে সত্যিকার আম খাবেন!

সর্বনা—শ!

প্রমিতা বলে ওঠে, সেই যে কী একটা কথা বলে, 'কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখানো' না কি! জানো তো তার পরিণাম?

অদম্য এখন একটু শান্ত গলায় বলে, তোমার ঠাট্টাগুলো একটু কড়া প্রমিতা।

প্রমিতার মা মনোবীণাও বলে ওঠেন, সত্যি খুকু! তুই এমন ইয়ে করে কথা বলিস। পলাশ তোর সহপাঠী না? তাছাড়া পলাশ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না না। ও কিছু না আমি কিছু মনে করি না। ও তো বরাবরই— ইয়ে ক্লাশে সকলকেই—

ঠিক আছে। অতি উত্তম। আম পালিয়ে যাবার আগে চলে আসুন। দারুণ খুশি হবো। সেদিন আপনি ওরকম হঠাৎ চলে আসায় খুব খারাপ লাগছিল। আমার বাবা বলতেন, বাড়িতে অতিথি এসে যদি কিছু না খেয়ে চলে যায় গৃহস্থের ক্ষতি হয়।

শুনে প্রমিতা প্রায় শিউরে ওঠে। ইস। এতগুলো লোকের সামনে এই রকম সেকেলে গ্রাম্য কথা! এই লোককে প্রমিতা কি করে 'মানুষ' করে তুলবে। উঃ!

মনোবীণাও মনে মনে হাসলেন। সত্যি ভাবা যায় না! একটা বিদেশ ঘুরে আসা শিক্ষিত মানুষ! একটু শঙ্কিতও হলেন খুকুর বেজার মুখ দেখে।

কিন্তু আসল লোকটি ততক্ষণে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠেছে ইস। তাই নাকি আপনি ভাববেন না। নিশ্চয় চলে যাব একদিন।

অনেক ধন্যবাদ ! তবে এই দিনটা যেন বেশিদিন দূরে না হয়। গাছের আমেরা 'জবাব' দিয়ে চলে যাবার আগে হয় যেন !

প্রমিতার মনে হলো, অদম্য ডাক্তার কী এই বোকা লোকটাকে নিজের বৈভব দেখাতে চায় ? নাকি মহত্ব ? কে বলতে পারে সত্যিই কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখানোই হলো কি না।

পলাশ চলে যাবার পর মনোবীণা হেসে হেসে বলেন, খুকু যা বলেছে, 'শুনতে খারাপ' তবে কথাটা সত্যি ! ওই পলাশকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যাওয়া মানেই তো কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখানো।

তবে সে কথাটা তো চট করে বলা যায় না। তাই বলেন, এক হিসেবে খুকুর কথাটা সত্যি বাবা ! ছেলেটা 'স্নেহের কাঙাল'। বাড়িতে তো কেউ নেই। মা বাপ তো কোনকালে গেছে। থাকার মধ্যে একখানা রগচটা কাকা, আর একখানি দজ্জাল কাকি ! আমার দাদার বাড়ির পাড়াতেই তো। দাদা বৌদি একটু স্নেহ করেন তাতেই কৃতার্থ।

হুঃ। হি হি !

প্রমিতা বলে ওঠে, ওই জন্যেই তো কবিতা গজায়।

জানো না কাব্যের ফলনে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মাটি হচ্ছে 'দুঃখের মাটি।' আর সবচেয়ে ভালো 'সার' হচ্ছে যন্ত্রণা।

অদম্যর হঠাৎ মনে হলো হাসলে প্রমিতাকে সবসময় ভালো দেখায় না।

* *

প্রমিতা জেদ ধরলো তুমিও চলনা বাপু আমাদের সঙ্গে। নিজের 'কনে' দেখার সময় তো গুড্‌বয়-এর পার্ট প্লে করে দেখোইনি। চলোনা দেখবে বাঙালির ঘরে 'কনে দেখা' কী বস্তু।

অদম্যর মনে হলো একেবারেই কি দেখিনি ? দেখেছি বৈকি। নীতুপিসিকে ওরা দেখতে এসেছিল। বছর দশেক বয়েস তখন অদম্যর। ওর মনে আছে নীতুপিসিকে নিয়ে পাড়ার সব মহিলারা খুব সাজাচ্ছিল। আর নীতুপিসি মাঝে মাঝেই বলছিল, 'এইবার ছাড়ো না বাবা ! এইবার ছাড়ো একটু কেঁদে বাঁচি।'

অদম্য হেসে ফেলে বলছিল, শ্বশুরবাড়ি যাবার আগেই তুমি কান্না জুড়বে নাকি নীতুপিসি ? তাহলে বিয়ে করছ কেন ?

আহা ! আমিই 'করছি' বটে। মেয়েরা যেন 'বিয়ে করে।' তাদের তো বিয়ে হয়।

তারপর বাড়িতে খুব খাওয়া দাওয়ার আয়োজন দেখে অদম্যর মনে

হয়েছিল কতজন আসবে ? এতো খাবার ! তবে যে ব্রজদা বলছিল চার পাঁচজন আসবে ! যারা আসবে তারা বকরাক্ষস নাকি ?

আর কোনো কনে দেখা মনে পড়ে না অদম্যর।

ব্যাপারটা তার এক হিসেবে খুব বিশ্রী লাগে। আবার এক হিসেবে ন্যায্যই মনে হয়। বিয়ের মত একটা ব্যাপার ! না দেখে হতে পারে ?

তবে রাজি হচ্ছিল না। বলছিল, ঠিক আছে আপনারা ঘুরে আসুন না। বাড়িতে তো বইটই রয়েছে অনেক !

কিন্তু নির্বেদ প্রকাশ করলেন শ্বশুর শাশুড়ি।

আমাদের তো বাবা ছেলে নেই, তোমাকেই ছেলের মতো হতে হবে। সঙ্গেটঙ্গে যেতে হবে।

ছেলে থাকলেও সে মামাতো বোনের কনে দেখার আসরে যেতো কিনা সে প্রশ্ন করলো না অদম্য। হেসে বললো, 'চলুন।'

বাঙালি বাড়িতে কনে দেখতে আসার আসরের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। সকলেই জানে বাড়ি সুদ্ধ সবাই সকাল থেকেই টেনশনে টানটান হয়ে থাকে। মেয়ে বেজায় বিরক্ত হলেও, কিভাবে বেশি সুন্দর দেখাবে তার চেষ্টা করতে থাকে আগেরদিন থেকেই। এখন তো আর অন্যেরা এসে কনে সাজাতে বসে না।

আহার্যের আয়োজন ?

সেও প্রয়োজনের অতিরিক্তই। অতিথির সন্তোষবিধানের জন্যে তো নয়, নিজেদের প্রেস্টিজ বজায় রাখার চিন্তাটাই বেশি। তা সে সবই হয়তো হয়েছে তবে প্রমিতা ভাবেনি, এখানেও 'পলাশ' বিরাজ করবে।

কিন্তু করবে না কেন ? পলাশ তো এ বাড়ির কাকাবাবুর কোনো একটু সাহায্যে লাগতে পেলেই কৃতার্থ !

সাহায্যের তো দরকারও। মামার একছেলে খড়গপুরে আই-আই-টি তে পড়ে। আর এক ছেলে বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। মেয়ে ছিল শান্তি-নিকেতনের ছাত্রী। তবুও তাকেও এই 'পরীক্ষায়' বসতে হচ্ছে।

হোক। পাত্রপক্ষ অতি ভদ্র। দেখতে আসতে হয় তাই এসেছেন। কোনো-রকম কূটকচালে প্রশ্ন করে মেয়েকে বিরক্ত করেননি। যদিও স্বয়ং পাত্রও এসেছিল। মা বাপ দিদির সঙ্গে।

তথাপি প্রমিতা এবং তস্য জননীও তাদের বিদায় গ্রহণের পর কোনো বিরূপ সমালোচনা করে উঠতে পারেনি।

বিরূপতা দেখালো পলাশকে নিয়ে।

ওমা। তুই এখানে সারাক্ষণ ভক্ত হনুমানের মতো জোড়হস্তে খাড়া আছিস! পারিসও বাবা। এখনো কিছু কাজ কর্ম জোটাতে পারিসনি বুঝি? 'বেকার তরুণ' হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? আর পাড়ার লোকের ফরমাস খাটছিস।

স্রেফ গায়ে পড়ে অপদস্থ করার মনোবৃত্তি।

অদম্য অবাক না হয়ে পারলো না।

সত্যিই ওই ফোটা ফুলের মতো উজ্জ্বল সুন্দর তরুণী নারীটি এই নীচ মনোবৃত্তির শিকার? সুযোগ পেলেই কাউকে ডাউন করে মজা পাওয়ার অভ্যাস। কাউকে মানে এক্ষেত্রে তো তারই এক অনুরক্তকে। হতে পারে লোকটা অভাজনের দলে। তবু এভাবে সকলের সামনে তাকে—

অদম্য আর একটু ভাবলো।

না কি এ সেই চিরাচরিত নারী জনোচিত ছলনা। অপরকে দেখাতে চায় 'ওই লোকটা সম্পর্কে আমার কিছুমাত্র মূল্যবোধ নেই। আমি ওকে একটা হাস্যাস্পদ প্রাণী ভাবি।'

সেটা যদি হয় তাহলে তবু ভালো।

কী জানি কী।

ছেলেটাও তো আচ্ছা। উপযুক্ত কোনো জবাবও তো দিয়ে উঠতে পারছে না।

অতএব অদম্যই হাল ধরলো। বললো, অপরের উপকার করার থেকে ভালো কাজ আর কী আছে?

প্রমিতা আবার নিজেকে বিকশিত করবার সুযোগ পেয়ে যায়। ঘাড় দুলিয়ে ভুরু নাচিয়ে বলে, আপনি তো সে কথা বলবেনই ডাক্তার সাহেব। আপনার নিজেরও যখন ওই নেশা। জানো তো মামী এই ডাক্তার সাহেবটির বিনা ফীতে রোগী দেখাই পেশা বা নেশা।

অদম্য আবার আশ্চর্য হলো। এতোদিনের মধ্যে প্রমিতাকে তো এমন উচ্ছল প্রগলভ দেখেনি। তার মানে সেখানে 'মাঠ'এর অভাবে বল নামায়নি।

এখন অদম্য অনুভব করছে কেন প্রমিতা অবিরতই খুঁৎ খুঁৎ করে আর ঘোষণা করে, কলকাতায় দামি পাড়ায় একটা চেম্বার না থাকলে কেউ 'বড় ডাক্তার' বলে গণ্যই করে না।

আসলে ওর প্রকৃতির উপযুক্ত পরিবেশ জোটেনি ওর।

অদম্য ভাবলো, মহামুস্কিল। যুগে যুগেই মেয়েদের জীবনে এই এক সমস্যা। তবে এ যুগে বেশ প্রখর। সেই যে সেকালে একটা কথা ছিল (শুনেছে

অবশ্য কোনো সেকালের বুড়ি টুড়ির কাছে) 'স্বামী যেখানে। আমি সেখানে। বনে বনে অরণ্যে।' —অথবা 'স্বামী যেখানে 'সকল' আমি সেখানেই সুখী।'

একদা ছিল এমন যুগ। তখন তো স্বামীর সঙ্গে স্বামীর কর্মস্থলে যেতে পেলেই ধন্য হয়ে যেতো বৌরা। তা সে 'স্থল' যেমনই হোক। হোক মরুভূমির দেশে, হোক বা পাহাড় চূড়োয়, বরফ ঝরা দেশে, হোক বা জলে জঙ্গলে। শত অসুবিধের মধ্যেও 'সুখেই থেকেছে। মেনে নিয়েছে, মানিয়ে নিয়েছে।

অদম্যদের পাড়ায় এক পাড়াতুতো ঠাকুমা ছিলেন। তাঁর মুখের গল্প— তোদের ঠাকুর্দা এক এক সময় এমন সব বিতিকিচ্ছিরি জায়গায় বদলি হতেন যে রাতদিন ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করত। বাঙালিয়ানা খাবার জিনিস মিলত না, মাছ পাওয়া যেত না, কাজ করবার লোক জুটত না। আর ধারে কাছে এমন একটা লোক থাকত না যে বাংলা কথা বোঝে। সত্যি বলতে একেবারে বেঁধে মার খাওয়া অবস্থা। তো তিনি সেটা বুঝতেন। তাই কেবলই বলতেন, 'তোমার তো দেখছি এখানে বড়কষ্ট, বড় অসুবিধে, তোমায় বাড়িতে রেখে আসি।'

তাই কখনো এসেছি আমি? আসা যায়? সেই মানুষটা চাকরির দায়ে ওই দুর্গতি পোহাবে আর আমি দেশে এসে সুখসুবিধে ভোগ করব? আমি বিহনে ওর খাওয়াদাওয়া যা জুটবে সে তো মনে মনেই মালুম। হাঁড়ির হাল হবে। না খেয়ে মরবে। আর সব জেনে বুঝে আমি খাব, আরামে থাকব! গলায় দড়ি আমার।'

এমন অনেকেই ছিলেন তখন।

এই 'গলায় দড়ির' সিদ্ধান্তটি কি শুধুই 'দাস' মনোভাব থেকে? যুগযুগ ব্যাপী অন্যায় সমাজ ব্যবস্থার শিকার হওয়ার ফল? কেবলমাত্র অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাবে নিরুপায়তা? চিরাচরিত সংস্কার মাত্র? আর কিছু নয়? 'ভালবাসা' বলে জিনিসটা কোনো কাজই করেনি?

মেয়েরা যে স্বামীপুত্রের সংসারে জীবনপাত করে সে শুধুই এই সমাজ 'পুরুষশাসিত' বলে? শুধুমাত্র শাসক পুরুষের সেবা করতে বাধ্য হওয়া? 'স্নেহ প্রেম মমতা ভালোবাসা' এসব কিছুই না? ভালোবাসার শক্তিতেই কি সব কিছু সওয়া যায় না? বওয়া যায় না?

আজকের মুক্তি আন্দোলনকারিণীদের জ্বলন্ত বাক্যশুনে মনে হয়, 'ভালোবাসা' বলে বস্তুটা কোনোদিন কোথাও ছিল না। একপক্ষ শক্তির দম্ভে শুধু শাসন করেছে। আর অপরপক্ষে শুধু নিরুপায় হয়ে বশে শাসিত হয়ে দাসত্ব করেছে।

মনের মতো পরিবেশ না পাওয়াটা অবশ্যই কষ্টের। কিন্তু পুরুষ

জাতটাই কি সব সময় তা পাচ্ছে? তাদের কি কারুরই মনের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলতে হয় না?

এইসব ভাবা কথাগুলোই আর একবার ভাবলো অদম্য। এবং প্রমিতার প্রতি মমতা এলেও মনে না করে পারলো না ওর এতটা উচ্ছলতা যেন কৃত্রিম। সবাইকে দেখানো এই 'বর' নামের জীবটিকে আমি এখনি কেমন করায়ত্ত করে ফেলেছি। ওকে নিয়ে যা খুশি বলতে পারি।

মামী বললেন, তা' সেটা খুবই ভালো বাবা। ডাক্তারের ধর্মই তো তাই হওয়া উচিত। তো সামনে পেয়েছি এখন থেকেই বলে রাখি। যদি ভগবানের ইচ্ছেয় এই বিয়েটি হয়, তোমার শত কাজ থাকলেও আসতে হবে।

প্রসঙ্গ পরিবর্তনে বাঁচলো অদম্য। নিজের সম্পর্কে আলোচনা সামনে বসে শোনা কি কম বিড়ম্বনা?

* * *

বৈশাখীর 'চাকরিটি' গেল।

যদিও অবৈতনিক চাকরি। কেবলমাত্র 'খোরপোষের' বদলি। কিন্তু সেটাই কি কম? ওই চাকরিটির জন্যেই না এ সংসারে বৈশাখীর থাকাটা মূল্যবান ছিল। দোতলার এককোণার ঘরে থাকা সেই অনড় অচল বুড়িটির জন্যেই না বৈশাখী ছিল 'পরম প্রয়োজনীয়'। কিন্তু সে প্রয়োজন ফুরল। ভদ্রেশ্বরের এই মিত্তির বাড়ির 'গিন্নী' গত হলেন!

এরপর?

এখন অবশ্য কয়েকটা দিন কাজের চাপ বেশি বৈ কম নয়। এতগুলো মানুষের 'অশৌচের' র‍্যালা। কত নীতি নিয়ম বিধি নিষেধ। বৈশাখী একটা ভিন্ন গোত্রের মানুষ। অতএব ওকে দিয়ে ঠাকুর ঘরের 'পাট' করিয়ে নেওয়া যায়। ভাঁড়ার ঘরের শুচিতা রাখার 'সমস্যা' থাকে না। এমন কত কী।

শ্রাদ্ধ কার্যের সময় যা কিছু পুজোর দিকের ব্যাপার ওর ওপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

কিন্তু তারপর?

শতকর্মের ফাঁকে একদিন নীতুর কাছে কথাটা পাড়লো বৈশাখী।

চাকরিটা তো গেল। এখন একটা কিছু তো চেষ্টা করতে হয় ছোটো-মামী। এরপর শুধু বেকার বসে থাকলে গলা দিয়ে কি ভাত নামবে?

ছোটোমামী চকিত হয়ে বললো, এই সংসারখানি কি কাউকে বেকার বসিয়ে রেখে ভাত দেবে ভাবছিস? ঠিক খুঁজে খুঁজে কাজ আবিষ্কার করবে।

বৈশাখী হাসলো।

'কাজ করা' আর 'কাজে লাগা' দুটোয় তো তফাৎ আছে ছোটোমামী! নিজেকে সর্বদা 'ফালতু' ভাবতে হলে জীবন মহানিশা হবে না ?

নীতু বলেছিল তাহলে খুঁজতে লেগে যা একটা চাকরিবাকরির। বিদ্যে তো 'ইস্কুল ফাইন্যালেই' শেষ। খুঁজলে একটা রাঁধুনী ঘরমুছনি কাপড়কাচুনির চাকরিই খুঁজতে হবে।

হেই ছোটোমামী, তুমিও বাবা রেগে যেও না। তুমি রেগে গেলে আমার পৃথিবী অন্ধকার। কিন্তু তুমিই বলো যেখানে অধিকারের মাটির ছিটে-ফোঁটাও নেই, সেখানে ফালতু হয়ে সেই মাটিটা আঁকড়ে পড়ে থাকাটার মতো শান্তি আর আছে কিনা। না না তুমি বাপু আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটু ভাবো।

ভবিষ্যৎ ? তোর ?

নীতু বললো, ঠিক আছে। ভাবতে চেষ্টা করব। আগে শাশুড়িদায়টি উদ্ধার হোক। ততদিন পর্যন্ত তো তোর পুরনো চাকরিটা বজায় থাকছে।

নীতু ততদিন পর্যন্ত ভাবনার দায় থেকে মুক্ত হলেও কিছুই কি ভাবছিল না ?

* * *

নীতুর ভাসুররা মাতৃশ্রাদ্ধে ঘটাপটা একটু করলেন বৈকি। গ্রামে গঞ্জে সাত-পুরুষের ভিটেবাড়িতে বাসকরিয়েদের এ সব বিষয়ে চক্ষুলজ্জা মেনে চলতেই হয়। শহরে চলে এসে ফ্ল্যাট বাড়ির বাসিন্দা হতে পারলে অবশ্য আলাদা কথা। সেখানে তো 'শতচক্ষুর' নজরদারি নেই, কাজেই নিজের চক্ষুটাও বুজে থাকতে পারলে চলে।

দেশের বাড়িতে সেটা চলে না।

মাতৃদায় জানাতে দিকে দিকেই ছুটলেন দুই ভাই 'কাচা গলায়' দিয়ে। তাই বলে বেধবা ভাদ্রবৌয়ের জ্ঞাতি ভাইপোর দরজায় গিয়ে হাজির হতে পারেন না। সেখানে 'ডাক' এর চিঠিই যথেষ্ট। তবু তাতেই কাজ হলো।

নীতু আহ্লাদে উল্লাসে বললো, এসেছিস। বাঁচলাম ভাবছিলাম একখানা 'ডাক' এর চিঠিতে জানানো—আসবি কি না আসবি !

অদম্য বলে উঠলো, কী যে বলো ! আমার সম্পর্কে তো বেশ উচ্চধারণা দেখছি। আর শুধুই কী সরকারি ডাকের চিঠি ? মনের মধ্যে তোমার 'ডাক'টি কি পৌঁছয় নি বাবা ?

সেই ভরসাতেই তো খানিকটা নিশ্চিত ছিলাম। যাক এসেছিস যখন

সৌজন্য দেখিয়ে কর্তাদের সঙ্গে দেখা করেই কেটে পড়িস না বাপু। খুব দরকারি কথা আছে তোর সঙ্গে।

অদম্য বললো, এই গোলমালর মধ্যে কথাবলার সময় আছে তোমার? তার থেকে বরং এ সব মিটলে চলে এসো পিতৃভিটেয়। সেখানেই কথা হবে। যা চলছে—

বাইরে কীর্তনের আসর বসেছে, তার জগঝম্পের আওয়াজে আকাশ বাতাস উত্তাল।

নীতু একটু হেসে বললো, ওটা একটা সুবিধেও। কেউ কারো কথা শুনতে পাবে না। তাছাড়া—চটজলদি দরকারি কথাও তো থাকে রে। পালাবি না

তোমায় না বলে পালাব?

তা বটে। তবে শুভস্য শীঘ্রম। এখনি বলে নিই আয়। পরে কখন কী পরিস্থিতি।

তারপর ভাইপোকে নিজের ঘরে এনে বসিয়ে বলে, আসলে একটা দুঃস্থ বেচারির জন্যে আর্জি! বেচারির সম্প্রতি চাকরিটা গেছে ভবিষ্যতের ভয়ে সারা হচ্ছে—তুই যদি।

অদম্য অবাক হয়ে বলে, চাকরি? আমি, কি চাকরি দিতে পারব? কী শিখেছে সে? কমপাউণ্ডারির কাজ পারবে?

পারবে কিনা তুই নিজেই জিগ্যেস কর। নিয়ে আসছি।

একটু পরে ফিরে আসে কর্মপ্রার্থীকে নিয়ে।

এই যে। ওর একটা চাকরির বিশেষ দরকার। মনে হয় নার্সিংটা একটু শিখিয়ে নিলে কাজ চালিয়ে নিতে পারবে। অনেক দিনের অভিজ্ঞতা আছে। নে এইবার তোর বক্তব্য নিজেই বল। আমার তো দাঁড়াবার সময় নেই।

হতভম্ব অদম্য বলে এর মানে?

বললাম তো মানেটা ও নিজেই বলবে।

বসলো সে!

প্রথমটায় বললো, চিনতে পারছেন?

অদম্য প্রশ্নকারিনীকে আপাদমস্তক একবার জরিপ করে নিয়ে বলে, না চেনবার মধ্যে আয়োজন অবশ্য হয়েছে, তবে সৃষ্টিকর্তার গড় কাঠামোটা তো সহজে বদলানো যায়না কিন্তু ব্যাপার কী? পিসি তো কাটু মারলো।

উপায় নেই। অনেক কাজ। তাছাড়া ইণ্টারভ্যুটা তো আমিই দেবো।

কিন্তু হঠাৎ কী ঘটলো?

বাঃ। ঘটনার মুখোমুখিই তো রয়েছেন। এ বাড়ির একদার গিন্নি বুড়ো ভদ্রমহিলাটি তো গেলেন। তিনিই ছিলেন আমার আশ্রয়দাতা! আর তাঁর জন্যেই ছিল আমার দরকার। পক্ষাঘাতের রোগী সর্বদা তো চাই কারোকে। কিন্তু আর আমার এখানে অন্ন ধ্বংসাবার যুক্তি কী? তাই ভাবছি—

অদম্য স্থিরভাবে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে কথাগুলো শুনছিল। আস্তে বললো, কিন্তু—

কিন্তু টিন্তু নয় অদম্যদা! আপনি আমার একটা বিহিত করুন। শুনলাম উত্তরপাড়াতেই একখানা নার্সিং হোম বানাচ্ছেন, সেখানে নার্স লাগবে না? নিদেন পক্ষে আয়া? তা ও নাহলে ঝাড়ুদারনি?

ছিঃ এভাবে বলছো কেন?

অদম্য বিচলিত গলায় বলে, নিজেকে এতো ছোটো করতে নেই।

ও প্রশ্নটা যারা 'বড়' তাদের পক্ষে। দুর্বাঘাস এর আর নিজেকে 'ছোটো' করার ভয় কী?

অদম্য আস্তে বলে তোমায় আমি শেষ পর্যন্ত বোধহয় ফ্রক পরাই দেখেছি। ইদানিং তো আর যেতে না পিসির সঙ্গে। দেখছি এরমধ্যে অনেক কথা শিখেছ!

বৈশাখী হেসে উঠে বলে, এরমধ্যে গঙ্গায় অনেক জলও গড়িয়েছে।

তা বটে। কিন্তু 'বৈশাখী তুমি কি আগে আমায় আপনি' করে কথা বলতে?

ওমা। তাই আবার বলতে জানে না কি একটা ফ্রক পরা মেয়ে? আর আপনিও তো তখন ইস্কুলে যাওয়া ছেলে। নাহয় কলেজে! এই তো? কিন্তু এখন সময় বড় মাপা! 'আগের' কথা বলতে বসলে রক্ষে আছে? পরের কথাটাই শুনে নিন। একটা কিছু করে খেতে হবে ভেবেই ঠিক করছি নার্সগিরিটাই বোধহয় পেরে উঠব। ছোটোমামী অবশ্য বলেছিল, 'তোর যা বিদ্যের বহর রাঁধুনি কি ঘরমুছুনির কাজ খোঁজাই উচিত।' সেটায় তেমন মন লাগবে না। তাই আপনার কথাই মনে পড়লো। একটু হাসলো।

বললো, সে চাকরি তো ভদ্রেশ্বরের এই মিত্তির বাড়িতেই মজুত। তবে অবৈতনিক তো। ওতেও মন নেই।

হঠাৎ একটু বেশি ব্যগ্র গলায় বলে ওঠে, আসলে এই পুরনো দেওয়ালগুলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে যেতে চাই অদম্যদা। বিনা অধিকারে এতদিন বাস করে এসেছি। এখন বড় ধিক্কার আসছে। নার্স এর কাজ আমি ঠিক পেরে যাব।

অদম্য ওর মুখের দিকে তাকায়।

একদা যখন এই মুখটা নিতান্ত বালিকার ছিল, তখন অদম্যর বাবা বলতেন, 'মেয়েটার মুখটা দ্যাখ! যেন দেবী প্রতিমার মুখ।'

না কাঠামো সহজে বদলায় না। মুখের গড়ন ঠিকই থাকে। কিন্তু ভাব তো বদলায়? অনেকই বদলেছে অবশ্যই। সংসারে পোড় খাওয়া ভাগ্য বিড়ম্বিতার একখানা প্রতীকই। তবু অদম্যর এখনও মনে হলো বাবা ঠিকই বলতেন।

এই মুখ সেবানিষ্ঠ নার্সের পক্ষে আদর্শ।

কিন্তু?

কিন্তু ওর সিদ্ধান্তটা কি এতো সহজে মেনে নেওয়া যায়?

বললো, এখানে তোমার এইসব গার্জেনরা রাজি হবেন?

বৈশাখী হেসে ওঠে, গার্জেনদের এক্তার থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতেই তো অদম্যদা। নইলে এরকম সংসারে একটা মেয়ে যদি জীবন পাত করে চলে তার ভাত কাপড়টা জুটে যাবেই!

বৈশাখী।

কী বলুন?

আবারও বলছি নিজেকে এভাবে 'ছোটো' করে কথা বলতে নেই। নার্সিং পড়তে চাও ভালো তবে উত্তরপাড়ায় তো তেমন কোনো শিক্ষণ কেন্দ্র নেই। হাওড়ার দিকে আছে। খোঁজ নেব। তবু বলছি সংকল্পটা বদলাবার চেষ্টা করে দেখ না?

বৈশাখী হতাশ গলায় বলে, আর কোন কাজ হবে আমার দ্বারা অদম্যদা? বিদ্যের বালাই তো নেই।

অদম্য লক্ষ্য করছিল খোলা দরজার সামনে দিয়ে বেশ কয়েকবার যেন ক'জন ঘোরাঘুরি করে গেল! একটু শঙ্কিত হলো। নিজের জন্যে নয়, বৈশাখীর জন্যেই।

উঠে পড়লো।

বললো, আচ্ছা ঠিক আছে। নীতুপিসি তো কদিন পরে যাচ্ছে? তখন—

নীতু ঘরে এলো।

ব্যস্তভাবে বললো, হয়েছে তো আবেদন পেশ? আচ্ছা এখন, অমু চলে আয়। ওনারা খুঁজছেন। বলছেন 'চলে গেল নাকি?'

তা খুঁজতেও পারেন। হলেও বিধবা ভাদ্রবৌয়ের বাপের বাড়ির লোক। তবু একটা কেষ্টবিষ্টু ডাক্তার তো। সমীর একটু থাকবেই।

মা বলেছিল দিন দশেক থাক। আর তারপর বলেছিল হেসে হেসে, যা একখানি পুরাতন ভৃত্য আর বামুনমাসি আছেন ওর ওখানে তুই এখানে যতদিন ইচ্ছে থেকে যেতে পারিস।

বলেছিলেন অবশ্য অাহ্লাদ করেই। কিন্তু প্রমিতার মনে হলো তাহলে তো কখনোই প্রমিতার অনুপস্থিতিতে তার সংসারে কোনো অভাব অসুবিধে দেখা দেবে না। এটাও তো ঠিক নয়। কী করা যায়! ওই 'বামুনমাসিটি' স্রেফ একটা বিরক্তিকর। সব কথায় সর্দারি করতে আসা। যেন সত্যিই মাসিপিসি। আর অদম্যও সেই রকম সম্মানটি দিয়ে চলে।

কী অসহ্য!

অথচ সেই অসহ্য জায়গাটার কথা মনে পড়তেই প্রমিতার আর বাপের বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না। নিজস্ব অধিকারের স্বাদই আলাদা।

এখানে আদর আছে আঠারো আনা। কিন্তু 'আমার' বলতে অধিকারের কীই বা আছে? যা আছে তাও তো এখন অকিঞ্চিৎকরই মনে হয়।

তাছাড়া—সেখানে সেই যে একটা মানুষ যেন কেবলমাত্র প্রমিতার জন্যেই 'মজুত' আছে! সেও তো সাধারণ জিনিস নয়।

'মনকেমন' কথাটা হাস্যকর ভাবালু। ওটা ভাবাও যায় না। তবে অভাববোধ' বলে একটা কথা। সারাদিন লোকটাকে হাতের কাছে পাওয়া না গেলেও রাতটা তো প্রমিতার! যখন তাকে 'হাতের মুঠোয়' পাওয়া যায়!

নাঃ। পরিবেশটা যতই অপছন্দকর হোক আস্ত একটা মানুষকে 'আমার নিজস্ব' বলে অনুভব করার—মাদকতা একটা আছেই। অস্বীকার করা যায় না সেই মাদকতার প্রভাবেই প্রমিতা দশদিনের জায়গায় সাতদিনেই চলে এলো।

অদম্য উদ্ভাসিত মুখে বললো, বাঁচলাম। দারুণ ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল! তবে তোমার মা বোধহয় আমার ওপর চটে গেলেন?

কেন? চটবার কী আছে?

ভাবলেন হয়তো আমিই তোমায় প্ররোচনা দিয়ে—

প্রমিতা বিজয়িনীর গলায় বললো, আমার মা তাঁর মেয়েকে খুব চেনেন। জানেন কারো প্ররোচনায় কিছু করার মেয়ে নয় সে। ইচ্ছে হলো চলে এলাম।

খুব ভালো। এরকম সদিচ্ছা আমার পক্ষে মঙ্গল। আচ্ছা আসছি। আমার তো ইচ্ছেমত কিছুক্ষণ বসে থাকার উপায় নেই। বলে চলে যায়।

প্রমিতা এঘর ওঘর ঘুরে-ঘুরে দেখে বেড়ায়। যেখানে যা ছিল যেমনটি

ছিল ঠিক তেমনই রয়েছে।

কিন্তু অদম্য ডাক্তার কি ক'দিন শোবার ঘরে না শুয়ে এই বসবার ঘরটাতেই শুয়েছিল নাকি? দেয়ালধারে সাবেকি ধাঁচের চওড়া ডিভানটার ওপর একটা বালিশ কেন? তার পাশে কয়েকটা বই।

এ আবার কী! 'ছন্নছাড়া'র সেই কবিতার বইটাও এখানে কী করতে? ও পড়ত নাকি!

প্রমিতা বসলো। বইটা হাতে তুলে নিয়ে পাতা উল্টে উল্টে দেখতে লাগলো কোথাও কোনো 'মন্তব্য' বসানো হয়েছে কিনা। অথবা আণ্ডারলাইন।

নাঃ সে সব কিছু না।

কিন্তু এখানে কেন? তাহলে কি ও ওই কবিতাগুলোর নিহিত অর্থ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছে? অর্থাৎ—এটাকে মন থেকে তাড়াতে পারছে না? ওকে আবার এখানে আমন্ত্রণ জানানোটা একটা প্যাঁচ? যাচাই করবার স্কোপ পেতে? তার মানে সন্দেহটা রয়েই গেছে ওর মধ্যে।

তার মানে যতো সরল ভাবা হয় ততো সরল নয়।

মনটা বিরূপ হয়ে গেল।

* * *

কথাটা পাড়লো প্রমিতা।

তুমি কি এই ক'দিন বসবার ঘরেই শুয়ে রাত কাটিয়েছ নাকি?

অদম্য হেসে ফেলে বললো, ব্রজদা লাগিয়েছে বুঝি?

কারো লাগালাগিতে কান দেওয়া আমার স্বভাব নয়। একটু 'লক্ষ্য' থাকলেই অনেক কিছু বোঝা যায়।

অদম্য কুণ্ঠিত হাসি হেসে বলে, আসলে ঘরটা হঠাৎ কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগলো।

ওটাই তো শুনেছি তোমার বেডরুম।

ভুল শোনোনি। কিন্তু ওই মাঠের মতো খাটটা ছিল না তখন।

ও! তা আজকাল কি আধুনিক কবিতারও ভক্ত হয়ে উঠছো না কি? বালিশের পাশে আধুনিক কাব্যগ্রন্থ। মনে হলো পড়া হয়েছে।

অদম্য বললো, তা হয়েছে। সত্যি বলতে—বারবারই পড়েছি।

বার—বা-র। কেন? কোন রহস্য আবিষ্কার করার চেষ্টা করছিলে নাকি?

রহস্য?' না রহস্য আর কী! তবে বলতে পারো কবির 'হৃদয় রহস্য'।

দেখো আসলে আমরা অনেক ব্যাপার—'আমি ওসব বুঝি না' বলে ঠেলে সরিয়ে রাখি। কিন্তু চেষ্টা করলে অনেক কিছু বোঝা যায়। আমিও চেষ্টা করছিলাম বোঝবার। আসলে এঁরা বোধহয় 'প্রতীক'টাই একটা 'অন্য কিছু' নিয়ে শুরু করেন। সেটা ধরতে পারলেই বুঝে ফেলা যায়। ওই যে একটা কোন কবিতায় রয়েছে—'এখানে একটা খোলা দরজা! দরজাটার কপাট দুটোর ছিটকিনি নেই। তাই ঝোড়ো হাওয়ায় খুলছে আর আছড়ে আছড়ে এসে পড়ে আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।' এর মানেটা—

কী হলো? থেমে গেলে যে?

নাঃ থাক। শুনলে হয়তো হাসবে তুমি। হয়তো আমি যা ভাবছি তা নয়।

কী ভাবছো সেটাই শুনি না।

পরে শুনো। এখন তোমার কথা শুনি।

আমার আবার কথা কি? তবে দেখে অবাক হলাম, ওই রাবিশ কবিতার বইটা নিয়ে তুমি এখনো মাথা ঘামাচ্ছো।

বাঃ। রাবিশ বলছো কেন? মন দিয়ে পড়ে পড়ে তো দেখছি কবির মধ্যে একটি 'ভালবাসার হৃদয়' আছে। এবং তার ব্যাকুলতাটাও ফুটেছে অনেক জায়গায়। তবে এতোটা মাথা হয়তো ঘামাতাম না লেখককে চোখে না দেখলে, আর বইটা 'শুধু তোমাকেই' উৎসর্গ না করলে। তা নইলে কে এতো খাটতো। সহসা তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে প্রমিতা। তীব্র হয়ে ওঠে।

সেইটাই আসল কথা। সন্দেহ আর জেলাসি! সেটাই এতো খাটিয়ে মারছে।

অদম্য এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায়।

তারপর গম্ভীর গলায় বলে, ছিঃ। মিতা!

এই ছিঃটা বড় সাংঘাতিক। মরমে মেরে দেবার মতো।

প্রমিতা তবু শিথিল গলাকে চেষ্টা করে চাঙ্গা ক'রে বলে, কেন ছিঃটা কীসের? নিজের স্ত্রী যদি অন্যের প্রেমপাত্রী হয় ঈর্ষা হয় না?

কী আশ্চর্য! কেন তা' হতে যাবে আমি তো ভেবে পাই না। 'আমার ভালবাসার পাত্রকে জগৎসুদ্ধ সবাই ভালো বাসুক' এটাই তো স্বাভাবিক।

তোমার নিয়মে কেউ ভাবে না।

না ভাবুক। আমি আমার নিয়মেই ভাববো।

প্রমিতা হঠাৎ প্রসঙ্গটাকে হালকা খাতে টেনে আনে। হয়তো বিপদজনক' কোনো পথে পা দিয়ে বসেছে ভেবে ভয় পায়। তাই বলে ওঠে, তবে

আর কী। তাই ভাবুন মহাপুরুষ মশাই। তাদের ডেকে বাড়িতে এনে বাগানের আম খাওয়ান। কবিরা কাঁঠাল খায় না এমন নয়। চালিয়ে যেতে পারো।

অদম্য হেসে ওঠে।

তারপর প্রমিতার হাতের ওপর একটা হাত রেখে বলে, আসলে বোধহয় আমিই ওর প্রেমে পড়ে গেছি! সত্যি ভারি ভালো লেগেছে ছেলেটাকে।

তা 'ছেলেটাকে' বলতেই পারে। প্রমিতার সহপাঠী তো। অদম্যর চাইতে কয়েক বছরের ছোটো তো নিশ্চয়ই। আর অদম্য ডাক্তারের সঙ্গে এমন সমীহ ভাবে কথা বলে!

কিন্তু আসছে কই ছেলেটা?

প্রমিতা বলে ভয়ে আসছে না বোধহয়।

কী আশ্চর্য! ভয়ের কী আছে?

নার্ভাসরা অকারণেই ভয় পায়। একটু হেসে বলে প্রমিতা, তাছাড়া এও তো ভাবতে পারে কোনো সহজ সুস্থ মানুষ কি নিজের নতুন বিয়ে করা বৌয়ের পুরনো প্রেমার্থীকে আদর করে বাড়িতে ডাকে? হয়তো কোনো ভয়ঙ্কর অভিসন্ধি!

অদম্য হেসে ওঠে। বলে, তুমিও বোধহয় কলম ধরতে পারো। কবিতা না হলেও 'রহস্য কাহিনী' বা 'ক্রাইম নভেল'। আরে আমি যখন ভদ্রলোককে আসতে বলেছিলাম খুব তো খুশিই দেখেছিলাম। আমাকে একটা ভিলেন ভেবে ভয় খেয়েছে এমন মনে হয়নি।

* * *

গরমকাল শেষ হয়ে বর্ষা এসে গেল।

কবি পলাশকে অদম্য ডাক্তারের নেমন্তন্ন রক্ষে করতে আসতে দেখা গেল না! তবু অদম্য ব্রজকে বলে রেখেছে, কোনো সময় যদি সেই সেদিনের না বলে চলে যাওয়া রোগা লম্বা ফর্সা ভদ্রলোকটি আসে যত্ন করে বসাবে। তোদের বৌদির কাছে নিয়ে যাস। ওর কলেজের বন্ধু।

এমন কি যেদিন পিসির শাশুড়ির শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রাখতে ভদ্রেশ্বর গেল সেদিনও বলে গেল ভালো করে। প্রমিতাকেও বলে গেল হেসে, এমনও হতে পারে যেদিন আমি নেই, সেদিনই আমার 'প্রেমপাত্র'টি এসে গেল। আগ্রহ টাগ্রহ একটু দেখিও। যত্ন 'আত্তি' কোরো। ঠিক হয়তো আজই এসে হাজির হবে।

কিন্তু আশ্চর্য! ফিরে এসে জিগ্যেসও করলো না কেউ এসেছিল কিনা।

আর তারপর থেকেই যেন কি এক ভয়ংকর ব্যস্ততার মধ্যে কাটাচ্ছে।

পিসির শাশুড়ি বিয়োগে তোমার যেন খুব শোক লেগেছে মনে হচ্ছে।

পিসির শাশুড়ির শোকে!

তাই তো দেখছি! সেই থেকেই সদাই অন্যমনা, গম্ভীর বিষণ্ণ চিন্তাক্লিষ্ট।

ওরে বাস এতগুলো অপরাধের 'কেস?'

অদম্য হাসে। তবে তেমন হো হো করে নয়।

বলল, আসলে 'নার্সিং হোমটা'র কাজ এগোবার জন্যে—টাকাকড়িও লাগবে অনেক।

ও! সেই এখানেই অনেক খরচা করে নার্সিংহোম হচ্ছে?

'হচ্ছে' বলা যায় না 'হবে'। কিন্তু সেটাই তো কথা ছিল।

আমি অবশ্য প্রথম থেকেই বলে চলেছি ওটা কলকাতায় না হলে কোনো মানেই হয় না।

এটা তোমার ভুল ধারণা মিতা। সত্যি যদি কিছু 'মানে' থাকে তো এখানে করতে পারলেই। কলকাতায় তো রোজ রোজই ব্যাঙের ছাতার মতো পাড়ায় পাড়ায় প্রাইভেট নার্সিং হোম গজাচ্ছে। এ অঞ্চলে একটা সত্যিকার ভালো যন্ত্রপাতিওয়ালা ভালো নার্সিং হোমের যে কী দারুণ অভাব জানো না।

প্রমিতা তাচ্ছিল্যের গলায় বলে 'অভাব' সর্বত্র। খোঁজ নিলে দেখবে ওই ব্যাঙের ছাতা গজানো শহরেও অনেক জায়গায় সে রকম অভাব আছে। কোথাকার অভাব কতো অভাব কমাতে পারবে তুমি? আসলে সাধারণ লোকেরা নিজের অভাব কমাতেই চেষ্টা করে। এখানে নার্সিং হোম খুলে 'লাভ' এর আশা আছে?

অদম্য একটু হাসলো। বললো, আর্থিক লাভ ছাড়াও আর একটা লাভ থাকে মানুষের। তবে একথা ভেবো না এখানে অবস্থাপন্ন লোকের অভাব আছে। বাধ্য হয়েই তাদের কলকাতায় ছুটতে হয়। ভাবো একজন আচমকা হার্ট অ্যাটাকের পেশেন্ট তাকে নিয়ে ছুটতে হচ্ছে পঁচিশ তিরিশ চল্লিশ কিলোমিটারের রাস্তায়। তবু কাছাকাছির মধ্যে একটা আছে জানলে —এখানে আদৌ নেই তা অবশ্য নয়, তবে ঠিক সেরকম মডার্ণ—এই রে হঠাৎ জোর বৃষ্টি এলো যে—আরে। আরে। তুমি জানলা বন্ধ করতে যেও না। ছাটে ভিজে যাবে। ইস! কী রকম বেদম ছাট! সোফাটোফা সব ভিজিয়ে দিল। বোসো দেখি কে কোথায়—ব্রজদা! পাঁচু!

এ পাঁচু একটা বালক ভৃত্য। ফাইফরমাস খাটাই তার কাজ। কার ফরমাস? বলতে গেলে বামুনমাসির এবং ব্রজরাজের।

পাঁচু এসে দাঁড়ালো।

ব্রজদা বলে পাঠালো বৌরানীদির সেই কলেজের বন্ধু এয়েছে।

*　　　　*　　　　*

এর মানে?

প্রমিতা বলে ওঠে, এতদিন পরে তুই হঠাৎ এই বৃষ্টির সময় কাক ভিজে হয়ে? হি হি হি। স্রেফ আমসত্ত্ব। এতকাল কী করছিলি? আহা! আম বাগানের আমেরা তো কবেই হাওয়া হয়েছে কবিরা খায় কিনা জানি না তো কাঁঠালও বোধহয় উধাও হয়েছে। থাকার মধ্যে দেদার পেয়ারা। গাছে উঠতে পারিসতো—

বলতে গেলে ছেদ ভেদহীন ভাবে মাঝে মাঝে হেসে গড়িয়ে পড়ে কথাগুলো বলে নেয় প্রমিতা। হয়ত আরো বলতো অদম্য বাধা দিলো। বললো, কী আশ্চর্য! এখন এইসব বাজে কথা বলে চলেছ? দেখতে পাচ্ছো না? ভদ্রলোকের অবস্থা? একটু ব্যবস্থা না করে—

মুখ ফিরিয়ে ডাক দেয় ব্রজদা! চটপট এর জন্যে আমার একটা ধোপ পায়জামা গেঞ্জি আর দুটো তোয়ালে নিয়ে একে বাথরুমে দিয়ে দাও। আর তার থেকেও চটপট গরম জলের ট্যাপটা খুলে খানিকটা গরম জল—

পলাশ ব্যস্ত ভাবে বলে না না ওসব কিছু লাগবে না। এমনি হাওয়ায় শুকিয়ে যাবে। রাস্তায় কত সময় ভিজে যেতে হয়—

অদম্য একটু হাসলো।

ভুলে যাচ্ছেন এটা রাস্তা নয়। একটা গৃহস্থের বাড়ি। শুনুন সবটাই যখন ভিজে গেছেন গরম জলে একেবারে পুরোপুরি স্নান করে নিন। তারপর শুকনো তোয়ালে দিয়ে ভালো করে ঘষে মুছে শুকনো গেঞ্জি পায়জামা পরে নিয়ে বেরিয়ে এসে আদা চা খেয়ে নেবেন।

প্রমিতা আর একবার হেসে ওঠে, তোমার গেঞ্জি পায়জামা? হি হি হি! ওই তালপাতার সেপাইয়ের গায়ে?

কী আশ্চর্য! ওঁর গায়ে ফিট করতে পারে এমন জামা এ বাড়িতে কোথায়? মানছি, ওনার তুলনায় আমি 'অতিকায়।' উপায় কী?...কী রে ব্রজদা? দাঁড়িয়ে রইলি যে? শুনুন আপনি এত অস্বস্তি বোধ করছেন কেন? আপনার যে কোনো বন্ধুর বাড়িতে গেলেই তো—হ্যাঁ হ্যাঁ যান! ব্রজদা!

কিন্তু অত সুব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও আদা চা খাবার পরও কবি পলাশকে যেন শীতে কাঁপতে দেখা গেল। অতএব একটা চাদর জড়াতে হয়।

প্রমিতা বললো, ভালোই হলো। ওই বিগসাইজের পোশাক পরার জন্যে তোকে যা অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। শীত করবে না? বাবাঃ। এত চুল! মেয়েদের থেকে বেশি। ও কি আর তোয়ালে ঘষে শুকোয়? যাক গে এখন বল কী খাবি?

অদম্য বললো, সে ব্যবস্থা ব্রজদা এতক্ষণে করে ফেলেছে মনে হয়। কিন্তু পলাশবাবু কী ব্যাপার বলুন তো? জ্বর আসছে না কি? দেখি পালসটা—

পালস দেখবার আগেই হাতে হাত ঠেকিয়েই বললো, আরে এতো বেশ জ্বর দেখছি—শরীর খারাপ নিয়ে বেরিয়েছিলেন?

প্রমিতা বললো, তা কেন? এই তো ভিজে আমসত্ত্ব, হওয়ার ফল।

অদম্য বললো, বৃষ্টিতে ভেজার সঙ্গে সঙ্গে এতটা জ্বর এসে যায় না। আগে থেকেই বোধ হয়—

পলাশ অপ্রতিভের একশেষ হয়ে বলে, তেমন কিছু না। ওরকম তো প্রায়ই হয়। এই যে এতদিন আসতে না পারার কারণই তো তাই। বেরোবে ভেবেও বেরনো হয় না। জ্বর ফর এসে যায়। এতো খারাপ লাগছিল। আপনি কি মনে করছেন।

অদম্য ওর নাড়িটা দেখে নিয়ে হাতটাকে ফের চাদরের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে বলে, মনে করার প্রশ্নটাই বড় কথা নয়। প্রায় প্রায় আপনার এরকম জ্বর হয়?

কিছুদিন থেকেই তো দেখছি।

কতটা পর্যন্ত ওঠে?

কতটা পর্যন্ত!

পলাশ একটু উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে তা, কী করে বলব? আমি কি আর থার্মোমিটার নিয়ে মাপতে বসি?

মাপা উচিত। একটা ব্যাপার বার বার হলে—

ব্রজ ঘরে ঢুকে এলো।

ট্রের ওপর রেকাবি বসিয়ে।

ফুলো ফুলো লুচি, আলু, পটল ভাজা, কিছু একটা তরকারি আর গোটা চারেক মিষ্টি নিয়ে।

প্রমিতা বলে উঠলো, কার জন্যে আনছ? ওর জ্বর এসে গেছে। নিয়ে যাও।

অদম্য বললো, দাঁড়া ব্রজদা। এই শুনুন আপনার কি মোটেই খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না?

পলাশ সামনের পাত্রটার দিকে তাকিয়ে দেখে। অনুভব করে পেটে খিদেও আছে, আর মনে ইচ্ছেও।

বললো, সামান্য খেলে হয়। মানে অনেক আগে তো বেরিয়েছিলাম।

প্রমিতা বললো, জ্বরের ওপর এই সব খায় মানুষ? খাওয়া উচিত?

অদম্য একটু হেসে বললো, খেতে পারলে অনুচিত নয়। যা পারেন খান।

প্রমিতা মুখ বাঁকিয়ে বলে কী জানি বাবা! বরাবরই তো জানি জ্বর হলে ঘি তেলের জিনিস টিনিস সব বাদ।

অদম্য আর একটু হাসলো, থিয়োরি পালটাচ্ছে আমরা ডাক্তররা আগে যা জানতাম, এখন তা ভুলতে হচ্ছে। 'জল সাবু পাতিলেবু বলে গেছেন ডাক্তারবাবু'—সে যুগ আর নেই। তাছাড়া উনি যা বলছেন, তাতে তো মনে হলো ব্যাপারটা আচমকা নয়। এ ধরনের জ্বরে খেলে ক্ষতি হবে না। খান। খান।

মনে মনে বলে, তোমার খাওয়ার ধরণটা দেখেও তোমার শারীরিক অবস্থা কতকটা বোঝা যাবে।

পলাশ প্রমিতার দিকে তাকাতে সাহস করে না। আবার ওই 'করুণাঘন' দৃষ্টি মানুষটার দিকেও নয়। তবু সাগ্রহেই খাবারের পাত্রটা সামনে টেনে নেয়। কে কবে তাকে এমন যত্ন করে সুখাদ্যর পাত্র মুখের সামনে ধরে দেয়?

দৈবাৎ পকেটে পয়সা থাকলে আর খিদে অদম্য হলে হোটেলে রেস্টুরেণ্টে ঢুকে 'কিছু' খেয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু সেসব জায়গায় এমন 'ঘরোয়া' জিনিস কোথায়?

ঘরোয়া খাবারের সঙ্গে যেন 'ঘরের' ভালবাসাও অনেকখানিটা মাখানো থাকে। একটা 'ছন্নছাড়া' পুরুষের কাছে এই 'ঘর' বস্তুটা যেন স্বর্গের সুষমা বহন করে আনে। কিন্তু এখনই সুষমার মধ্যে, কি এই ঘরের ঘরণীর স্পর্শ আছে? আছে তার চোখের দৃষ্টিতে একছিটেও সস্নেহ প্রশ্রয়?

* * *

অনেকক্ষণ ধরে বারকয়েক হাত বদল ক'রে ক'রে টেলিফোন আলাপ সাঙ্গের পর মনোবীনা ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে পাশের ঘরে এসে তার চির বশংবদ অথচ চির অভিযোগের পাত্র স্বামীটির কাছে এসে প্রায়

ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে উঠলো, সেদিন বলিনি তোমায় 'তোমার আমার' থেকে খুকুটার বাস্তব বুদ্ধি অনেক বেশি।

মনোবীনা তার 'খুকু' সম্পর্কে এত রকম কথা বলে থাকে মনে থাকা শক্ত।

বিভূতিভূষণ চোখ থেকে চশমাটা খুলে মুছতে মুছতে বললেন কী হলো ?

হলো আর কী ? যা বলেছিল তাই ফললো। সেদিনকে জামাই যখন ওই পলাশকে আদর করে নিজেদের বাড়িতে যাবার জন্যে 'নেমন্তন্ন' জানালেন, খুকু বলেনি—'সেটা হবে কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখানোর মতো।' পরে তুমি বললে, জামাইয়ের সামনে ওভাবে কথা বলাটা খুকুর ঠিক হয়নি। এখন বোঝো।

বিভূতি কথার মর্মার্থ অনুধাবন করে চশমাটা আবার চোখে তুলে বললেন কেন ? খুব যাওয়া আসা করছে বুঝি ?

'যাওয়া আসা!' তাহলেও তো ভালো ছিল। শুধুই 'যাওয়া' আসার কোন প্রশ্ন নেই। ওখানেই রয়ে গেছেন 'তিনি'।

বিভূতি এবার সচকিত হলেন। অবাক গলায় বললেন রয়েছে ? তার মানে ?

মানেটা তুমিই বোঝো।

আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তুমিই বোঝাও। বলছেটা কী খুকু ?

কী আর বলব তোমায়। তোমার মহানুভব জামাইটি যে এরকম বিদঘুটে সৃষ্টিছাড়া তা কে ভেবেছে ? সেই হতভাগাটা নাকি একদিন ওদের ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল বৃষ্টিতে ভিজে একশেষ হয়ে। আর সেই তখনি সঙ্গে সঙ্গে নাকি ধুম জ্বর। বাস! ডাক্তার একটা রুগি পেয়ে গেলেন। আর স্ত্রীর কাছে মহত্ত্ব দেখাতে রুগিটিকে বাড়িতে পুষে ফেললেন। কী 'জ্বর' তাই জানবার জন্যে বারে বারে তার ব্ল্যাড টেস্ট, তারপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রকম টেস্ট আছে তাই চলছে। রীতিমত রাজসূয় আয়োজন।

বল কী! খুকুর কী এতে ? মানে ওরই তো সহপাঠী ?

'সহপাঠী' বলে তো খুকু একেবারে মরে যাচ্ছে। ওর তো সারাক্ষণ হাড় জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু মুখে তেমন কিছু বলাও তো মুস্কিল। 'মহৎ স্বামী' হয়তো ভেবে বসবেন আমার স্ত্রী কি নিচমনা। উঃ। খুকুর ভাগ্যে যে এমন ছিল কে জানতো।

বিভূতি মনে মনে একটু হাসলেন।

'স্বামীরা' কী ভাববেন!' এ ভেবে স্ত্রীরা তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে

বিরত থাকেন নাকি ?

অবশ্য তাঁর তো বরাবরই সব মনে মনে ! মুখে বললেন, ওই পলাশের বাড়ি থেকে কিছু বলছে না ?

আহা ! 'বাড়ি' যে কেমন তা তো শুনেইছো। একটা হাড় কিপটে কাকা, আর একটা দজ্জাল কাকি, আর তাদের গোটা তিন চার ছেলেপুলে। ওই মা বাপমরা বেকার ছেলেটা তো বাড়িতে 'ফালতু' আপদ। এতো তো বেঁচেছে। অসুখে পড়ে গেছে খবর দেওয়ায় কাকাটা বুঝি একবার গিয়ে দেখে, চিকিৎসার ব্যবস্থা দেখে খুব আহ্লাদ প্রকাশ করে চলে এসেছে, আর ও মুখো হয়নি। অর্থাৎ 'যা শত্রু পরে পরে।'

মুস্কিল তো ! কতদিন হলো ?

যা হিসেব দিল খুকু তাতে তো মনে হলো দিন দশ বারো হয়ে গেছে। ঢালাও খরচপত্র চলছে।

বিভূতি এই অভাবিত সংবাদে বিরূপতা প্রকাশ করবেন, না মুগ্ধতা ? কর্তব্যটা ঠিক করে উঠতে না পেরে আলগা ভাবে বললেন, এখনো সেরে ওঠেনি ?

সেরে উঠবে ? অমন আরাম, অমন রাজাই সেবাযত্ন দিব্যি পরের ওপর দিয়ে চলেছে। এতে কারুর চটপট সেরে উঠতে ইচ্ছে করে ? এখন খুকুর জ্বালাটা ভাবো ? পাঁচজনে জানছে—লোকটা ডাক্তারের বৌয়ের 'বন্ধু'। কাজেই মনে মনে ভেবে নিচ্ছে 'ডাক্তারবাবু' বৌকে প্লিজ করতেই এত কাণ্ড করছেন।

বিভূতিভূষণ বলে ফেললেন জামাই নিজে হয়ত সেই মোটিভ নিয়েই—

থামো তো। খুকু বলে গোড়া থেকেই খুকু বিরক্তি প্রকাশ করেছে। তা খুকুকে হতমান্য করে উত্তর দিয়েছিল কী জানো ? 'ভুলে যেও না আমি একজন ডাক্তার।'

হ্যাঁ সেদিন সেই কথাই বলেছিল অদম্য ডাক্তার।'

যেদিন প্রমিতা বলেছিল ওর কাকা এসেছে ? বাঁচা গেছে বাবা ! এখন ওর ওষুধপত্র যা আছে, সঙ্গে দিয়ে গাড়ি করে পাঠিয়ে দাও কাকার সঙ্গে !

অদম্য অবাক হয়ে বলেছিল,—এই অবস্থায় পাঠিয়ে দেবো ? এখনো সবরকম ব্লাড রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। তাছাড়া অনেক কিছু টেস্ট করার আছে। মনে হচ্ছে কিছু গোলমেলে ব্যাপার রয়েছে ওঁর শরীরের মধ্যে।

ও ! তা যা আছে তা আছে, ওর নিজের লোক বুঝবে।

'নিজের লোক।'

অদম্য একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলেছিল, তা যদি বুঝত তাহলে এ অবস্থায় এসে পৌঁছত না। আসলের শরীর তার প্রাপ্য পাওনাটা না পেয়ে পেয়ে একসময় প্রতিশোধ নেয়। এমন দারুণ অ্যানিমিক তার ওপর লো প্রেসার যে অবাক হতে হয় ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল কী করে লোকটা!

প্রমিতা মনে মনে বলেছিল, আর ঘণ্টাবয়েক বেড়িয়ে স্বস্থানে প্রস্থানে করলেই তো ল্যাঠা মিটে যেত বাবা! এখানে এসেই ঝটকে পড়তে ইচ্ছে হলো। আর মুখে বলেছিল, তা সেইটাই ওর কাকাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে মানে মানে ফেরৎ দাও? বেশি ভুগে পড়লে—

বেশিই ভুগে পড়েছে মিতা!

আর সেটা বুঝেও তুমি ওই ভারি ব্যাপারটা নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছো? তোমার কিসের দায়িত্ব?

অদম্য তখন হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। গাঢ় গভীর গলায় বলেছিল, ভুলে যেওনা আমি একজন 'ডাক্তার।'

তা এতেও সম্মান আহত হবে না প্রমিতার? প্রমিতার মায়ের ভাষায় 'হতমান্য'।

তদবধি অবশ্য প্রমিতা এই ছন্নছাড়া কবির সম্পর্কে আর বিশেষ কোন মন্তব্য করেনি, শুধু মনে মনে ভেবেছে—সত্যিই আমি আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। লোকটা আমার কাছে দুজ্ঞেয়। আর সহজ অঙ্কে ফেলে যদি বিচার করতে হয় তো ওই দয়ারসাগরের হাতে পড়ে তো আমার জীবন মহানিশা। কিন্তু একটা বিদ্যেসাধ্যিওলা বিদেশ ঘুরে আসা লোক এতোটা 'অ্যানপ্র্যাকটিক্যাল' হবে? পৃথিবীতে 'হতভাগ্যে'র অভাব আছে? ক'জনকে বাঁচাবে তুমি? আর এই 'পলাশবাবুটি!' এর ওপর 'মায়া।' আমার তো বাবা কখনোই আসে না 'ওর ওই কাকার কাছে' পড়ে থাকার দরকার কী? 'নিজের' মত ব্যবস্থা করে নিতে পারিস না? টিউশনি করে করে এম. এ. পড়ার থেকে অনেক বুদ্ধির কাজ হতো গ্রাজুয়েট হয়ে বেরিয়েই জোরালো ধান্ধায় ঘুরে অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা। তা নয় এম. এ. পাশ করব কবিতা লিখব, 'প্রেম প্রেম' ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়াব। ওদিকে—স্বাস্থ্যের বারোটা বেজে যাচ্ছে।—মামী সেদিন বললো, ওর কাকিটা নাকি এত পাজি যে ভালো করে খেতেই দেয় না। আধপেট খেয়ে খেয়ে অ্যানিমিক। অথচ ওদের ওই বাড়িটার তো কাকাদের সঙ্গে সমান ভাগ আছে ওঁর। বলুক না কেন 'আমার অংশে আমি ভাড়াটে বসাব।' তাহলেই তো আজবের দিনে যথেষ্ট আয়।

এমন কি ভাড়াটেদের কাছে পেয়িং গেস্ট হয়েও থাকতে পারে। এসব কিছু করবে না। বোকার মতো কাকার সংসারে আশ্রিতের মতো পড়ে থাকবে। তো মুখ্যুদের ভাগ্যে এই রকমই হয়। আমার যদি মায়া না হয়, মায়ার বদলে রাগ আসে, আমি নিরুপায়।

*　　　*　　　*

পলাশ বলল, জ্বর তো কমে গেছে, আর কেন আমায় নিয়ে ব্যস্ত হবেন? এবার আমায় যেতে দিন।

অদম্য বললো, আপনি পাগল হতে পারেন, আমি তো পাগল নই।

বাঃ। আপনার কত কাজ। শুধু শুধু আমায় নিয়ে অসুবিধেয় পড়া—

অদম্য বললো, আমার 'কত' কাজ তো পেসেণ্টদের নিয়ে? তা আপনিও তো তাদের মধ্যে একজন।

কিন্তু ইয়ে—বুঝছেন না মানে হচ্ছে—

আপনার 'কিন্তু' 'ইয়ে' 'মানে' ইত্যাদির সবটাই বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার মা বাবার দেওয়া একটা নাম আছে সে নামটার মানে জানেন তো?

হেসে উঠলো।

পলাশ শুয়ে আছে প্রায় বিছানার সঙ্গে মিশে। গায়ের রং ফ্যাকাসে চোখের কোনে কালি। ছড়িয়ে থাকা হাতটার সরু সরু লম্বাটে মাংসবর্জিত আঙুলগুলো যেন সাঁড়াশির মত দেখতে লাগছে।

অদম্য বললো, আপনার কাকার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। যতদিন না আপনাকে সম্পূর্ণ সারিয়ে তুলতে পারছি, ছাড়ব না। বলে কয়ে রাজি করিয়েছি।

বলে কয়ে।

বুদ্ধির ঘরে ঘাটতিওয়ালা কবি পলাশও একটু সূক্ষ্ম হাসি হাসলো।

রাজি করাতে 'খুবি বেশি' বলা কওয়া করতে হয়েছে এমন তো মনে হচ্ছে না।

অদম্য হেসে ফেলে বলে এক্ষেত্রে তো আপনাকে সংসারজ্ঞানহীন কবি বলে মনে হলো না।

পলাশ একটু বিষণ্ণ হাসি হাসলো।

তারপর বললো, সংসারে বাস করতে করতে অতি বোকারও বোধহয় কিছুটা জ্ঞান জন্মে যায়। কিন্তু এখন আবার—

কী হলো? থেমে গেলেন যে?

পলাশ আস্তে বলে, আপনাকে দেখার পর থেকে আমার হিসেবি ধারণাটা

যেন বদলে যাচ্ছে।

'ধারণা' জিনিসটা তো নিত্য পরিবর্তনশীল।

নাঃ। আপনি যেন আমার কাছে একটা ধাঁধা।

ধাঁধা। সর্বনাশ। বলেন কী? আমি যে এমন একা ভয়ংকর জীব তা তো জানতাম না!

কী বলব ঠিক বুঝতে পারছি না। ধাঁধা শব্দটা ব্যবহার করা বোধহয় ঠিক হলো না। কিন্তু আমি সারাক্ষণ যেন একটা ধাঁধার উত্তরই খুঁজে চলেছি।

অদম্য খুব হালকা কৌতুকের গলায় বলে, ব্যাপারটা কি বলুন তো? ধাঁধাটা কী?

পলাশ বালিশটা পিঠে ঠেকিয়ে একটু উঁচু হয়ে বসে বলে, কুণ্ঠা ত্যাগ করেই বলছি, আপনি যে আমাকে এইভাবে সমাদর করে বাড়িতে রেখে সেবাযত্ন আর চিকিৎসা চালিয়ে চলেছেন এর রহস্যটা কী? আমার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধের সূত্রটা কোথায় তা ভেবে দেখেছেন কোনো সময়?

অদম্য অবলীলার গলায় বলে, কী আশ্চর্য এর আর নতুন করে ভেবে দেখার কী আছে? আপনি প্রমিতার বন্ধু, প্রমিতা আপনার ভালোবাসার পাত্রী, এতো জানাই আছে।

পলাশ একটুক্ষণ অপলকে ওর দিকে তাকিয়ে বলে হিসেব মতো আমার সম্পর্কে আপনার বিরূপতা আর তিক্ততা আসার কথা।

অদম্য একটু আশ্চর্য হয়। এই ছেলেটাকে এভাবে স্পষ্ট পরিষ্কার গলায় কথা বলতে শোনেনি কোনোদিন। বিশেষ করে প্রমিতার উপস্থিতিতে তো ছেলেটাকে একটা বোকা গবেট মনে হয়। আসলে তা নয়। আসলে একটু বেশি নার্ভাস। তবে মনে হচ্ছে যেন আজও এই প্রশ্নটা করবে বলে সংকল্পে স্থির ছিল।

অদম্যও একটু পিঠ খাড়া করে বসলো। শান্ত গলায় বললো, আমার গিন্নিটিও যেন এই ধরনের কথাই বলেন। আপনাদের এই হিসেবের সঙ্গে আমার হিসেব পদ্ধতি মেলে না। আমার ভালোবাসার পাত্রীটি যদি আপনারও ভালোবাসার পাত্রী হয়, তাহলে তো একটি সুন্দর একাত্মতাই আসবে। আপনিও আমার ভালোবাসার পাত্র হয়ে উঠবেন! আসুন হাতটা বাড়ান।

পলাশ নীরবে তার শীর্ণ হাতখানা বাড়িয়ে অদম্য ডাক্তারের সুপুষ্ট হাতখানার কাছে সমর্পণ করে। ওর বোজা চোখের কোণ দিয়ে বোধহয় একটু জলের ধারা নেমে আসে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে বলে,

আপনাকে দেখে আমার আবার পৃথিবীর ওপর ভালোবাসা ফিরে আসছে, মানুষের প্রতি বিশ্বাস ফিরে আসছে।

ফিরে আসছে!

অদম্য জোরালো গলায় বলে, বলেন কী? অ্যাঁ! ওই দুর্দান্ত জিনিস দুটো হারিয়ে ফেলেছিলেন নাকি? আঃ। অমন কাজও করবেন না! আপনি তো আবার কবি! পৃথিবীর ওপর ভালোবাসা আর মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারালে, আপনার থাকছে কী? স্রেফ দেউলে বনে যেতে হবে যে! 'চশমার' পাওরার বদলান। পরিষ্কার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখুন। দেখবেন আপনার পুরনো হিসেব বদলে যাবে।

একটু হেসে ওঠে।

আবার বলে, আর সত্যি বলতে—আমিও যে মশাই আপনার প্রেমে পড়ে গেছি। 'কবুল করেও এসেছি আপনার প্রেমিকার কাছে।···আরে এ কী! আবার চাদর টেনে ঢাকা দিচ্ছেন কেন? শীত করছে? কী মুস্কিল! কাঁপুনিও এসে গেল যে! আবার জ্বর আসছে না কি?

* * *

ব্রজ বললো, রাতে তো ওনার কাছে থাকিই গো খোকাদা-বাবু! আজ নয় কম্পাউন্ডার বাবুর ছোট ছেলেটাকেও থাকতে বলবো। তুমি আবার যেন মাঝরাত্তিরে ব্যস্ত হয়ে উঠে এসো না।

তারপরই নিচু গলায় বলে, আচ্ছা খোকাদাবাবু বন্ধুবাবুর অসুখটা কী?

অসুখটা কি একটারে ব্রজদা? অনেকগুলো অসুখ জট পাকানো।

তো সেই ভাবনার ব্যাধিটি নাই তো?

ব্যাধি মাত্রেই তো ভাবনার রে।

না মানে। মোক্ষম ভাবনার বলছি। 'ক্যানছার' ফ্যানছার নয় তো?

আজন্ম ডাক্তার বাড়ি কাজ করেও ব্রজ রোগ ব্যাধি ওষুধের নামটামগুলো ঠিকমতো বলতে রাজি নয়। অদম্য তো তাই বলে। বলে, 'পারবে না কেন? বলবে না। ভুলভাল বলাই শখ।'

অদম্য বললো, ওটার সন্ধান অবশ্য এখনো পাইনি।

ব্যাস বাবা। তাহলেই নিশ্চিন্দ। নিশ্চয় ভালো হয়ে উঠবে। স্বয়ং ধন্বন্তরীর ব্যাটার হাতে পড়েছে। দরাজ হাতে চিকিচ্ছে—

আবার গলা নামায়, কিন্তু একটা কথা তোমায় শুধোই। আসলে উনি বন্ধু তো বৌরানীদির? তো যতো গরজ তো দেখি তোমারই। উনি কেন ব্যাজার?

দূর। কে আবার বলেছে তোকে সে কথা ?

ব্রজকে কারুর কিছু বলতে হয়না।

আরে বাবা তোদের বৌরানীদের মেজাজই তো ওইরকম 'মহারানী মহারানী !'

তা হবে। আমার যেন কেমন উল্টোপাল্টা লাগে।

মায়ের সঙ্গে টেলিফোনে ওনাকে নিয়ে কথা কয় কী রেগে রেগে ! বলে ওই একটা বাজে আপদ ঘাড়ে নিয়ে তুমি আর কোনোদিকে তাকাচ্ছো না, জলের মতোন পয়সা খরচ করছো। তোমার মাথার গোলমাল আছে কী না এইসব—

মাথার গোলমাল ! তাই না কি ? বলে বুঝি একথা ?

নিজের মতো ভঙ্গিতো হো হো করে ওঠে অদম্য তারপর বলে, তো একা তাঁরই বা দোষ দিচ্ছিস কেন ? সেকথা তোরাই কী না বলিস ?

ব্রজও হেসে ফেলে। বলে, মিথ্যে বলব না। তা বলি। কখনো কখনো বিনি পয়সার রুগিদের জন্যে যখন পয়সার রুগিকে অন্য ডাক্তার ধরিয়ে দাও, তখন, বলতে হয় না সে কথা ? তো বন্ধুবাবু মানুষটা বড় ভালো। এতটুকু 'কিছু' করলে এমন 'হাঁ হাঁ করে। আর সেবা যত্নয় যেন বর্তে যায়। কেবলই বলে, 'আমি তো কেউ না, তবু আমার জন্যে এতো। খুব লজ্জা করে।' আহা যেদিন সেরে উঠে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে, সেদিন তোমার এ সব সার্থক !

অদম্য একটু হাসলো।

'ঘরটর' ওর নেই রে। একটা জায়গায় থাকতে হয় তাই থাকে ! দেখলি তো কাকাকে ?

হুঁ। তা দেখেছি। ঘাড়ের বোঝা নামাতে পেরে বেঁচে গেল মনে হলো। যাক তোমার নার্সিং হোমের বাড়ি তৈরি হবার আগেই এই বসতবাড়িতেই তার একখানা গোড়াপত্তন হলো বলতে হবে। কী বলো ? এই তো একখানা বেড পড়েছে। আরও দুখানা ঘরতো বেকার পড়ে রয়েছে। আর দু'খানা বেড পেতে ফেলো। এটা হবে 'মিনি হোম।'

হেসে ওঠে দু'জনেই।

আর সেই শব্দে একজন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে ঝটু করে উল্টো মুখো হয়ে আবার দোতলায় উঠে যায়।

অসহ্য।

* * *

পড়ন্ত বিকেলে কলকাতা থেকে ফিরলো প্রমিতা। গিয়েছিল ভোরসকালে।

মা বলেছিল, 'কতদিন আসিসনি কতদিন আমার কাছে খাসনি।'

আর বলেছিল 'মেয়েজামাইকে একসঙ্গে ডেকে কাছে পাবার আশা তো নেই। রাজপুত্তুর তাঁর রাজ্যের প্রজাদের নিয়েই থাকবেন যখন তাই থাকুন! কী আর করা। এই গরিব বেচারিদের তো একটা মাত্তর প্রজা তাকে মাঝে মাঝে না দেখলে—'

বিভূতিভূষণ অবশ্য বলেছিলেন 'ডাক্তার পাত্র চয়েস করাই মোক্ষম ভুল হয়েছিল তোমার। কিন্তু সে তো মনে মনে।

ড্রাইভারকে নিয়ে গাড়ি করেই গিয়েছিল প্রমিতা। গাড়ি থেকে নামার সময় অদম্যকে দেখতে পেল। এগিয়ে আসছে। যেন তাড়াতাড়ি কিছু বলতে চায়।

বললো তাই।

এই, শোনো তুমি ওপরে উঠে যাবার আগে একবার পলাশের ঘরে ঘুরে যাও না। দেখে খুব খুশি হবে।

প্রমিতা মনে মনে বললো, বিশ্বসুদ্ধু সকলকে খুশি করার মহানব্রত নিয়ে বসে আছো বাদে আমি।

মুখে বললো, এখন পারছি না। দারুণ টায়ার্ড!

গাড়ি চেপে গিয়ে মায়ের কাছে নেমন্তন্ন খেয়ে আবার গাড়ি চেপে ফিরেছে। দূরত্ব মাত্র মাইল কয়েক। তবু অনায়াসে বললো 'দারুন টায়ার্ড'।

অদম্য বললো, তবে থাক। রেস্ট নাওগে।

আচ্ছা ঠিক আছে। যাচ্ছি।

বাঃ। বললে যে টায়ার্ড। এখন থাক না।

না ঃ। তুমি হয়তো ভাবতে বসবে কী 'হার্টলেস মহিলা।'

আজ জ্বর নেই। তবু বুকের নিচেটা পর্যন্ত চাদর ঢাকা।

লোকটা বলে, 'চাদর ঢাকা থাকলে যেন একটু স্বস্তি আসে।'

মনে হয় আমি একটা রোগী। অকারণ বিছানায় পড়ে আরাম খাচ্ছি না।

প্রমিতা ঘরে ঢুকে এলো। অদম্য এলো না।

প্রমিতাকে দেখে ওর বিবর্ণ মুখে হঠাৎ যেন হাজারবাতির আলো জ্বলে উঠলো।

প্রমিতা বিছানার পাশে রাখা চেয়ারটায় বসে পড়ে হেসে হেসে বললো, কী রে ছন্নছাড়া! আছিস কেমন?

ঠিক এই মুহূর্তে দারুণ ভালো।

ওঃ। গ্যাস দেওয়া হচ্ছে? এখনো জ্বর চলছে?

জ্বরটা তো 'চলে না। হঠাৎ হঠাৎ আবির্ভূত হয়।

তার মানে জ্বরটাও তোর মতো 'ছন্নছাড়া'। এখান সেখান ঘুরে বেড়ায়। তো ডাক্তারববাবুর হেফাজতে বেশ ভালোই আছিস বোধহয় ?

পলাশের স্বর গাঢ় গভীর হয়ে এলো, ওঁর মতো লোকের কাছাকাছি থাকতে পাওয়া একটা সৌভাগ্য।

তাই বুঝি ? হি হি হি। তাহলে বল তোর এই অসুখটি তোর সৌভাগ্যের ফলেই ? সেই বাবদই তো থাকতে পাচ্ছিস।

মাঝেমাঝে তাই মনে হয় !

লোকটাকে তোর কী মনে হয় বল তো ?

পলাশ একটু তাকিয়ে থেকে বলে, 'কী' মনে হবে ?

মানে বলছি—লোকটা ভগবান না শয়তান ? কী মনে হয় তোর ?

পলাশ আস্তে বললো, ছিঃ। একথা বলছো কেন ?

বলছি ওর রীতিনীতি দেখে। বল তো ইচ্ছে করে ঠেলে ঠুলে কেউ নিজের স্ত্রীকে তার প্রতি প্রেমাসক্তের কাছে পাঠিয়ে দেয় ?

পলাশ আরো আস্তে বললো,—হয়তো 'ভগবানই' দেয়।

বুঝলাম। আচ্ছা এখন চলি।

প্রমিতা !

কী রে ?

আমার অসুখটা কিন্তু ছোঁয়াচে নয়।

তা জানি। তাতে কী ? ভোগাচ্ছে তো ?

সে কথা নয়। বলছিলাম আমার কপালে তোমার হাতটা একটু রাখবে ?

সেরেছে। সেই ন্যাকামার্কা কবিয়ানা। এই তো রাখলাম ! কী হলো তোর ? ডানা গজালো ?

পলাশ সেই হাতটার ওপর হাত রেখে একটু চেপে ধরে বলে, যদি বলি তাই গজালো। এখন আমি পাখির মতো আকাশে উড়তে পারব।

তাহলে ওড়। দেখিস বাবা। যেন আবার জানলা দিয়ে ফুড়ুৎ করে পালিয়ে যাসনি। তাহলে তোর ডাক্তারবাবু আমায় বলবে 'তুমিই আমার প্রাণের পেশেন্টটাকে হাপিস করে দিয়েছ। ···উঃ তোর হাতটা এত ঠাণ্ডা তবু কী ঘাম ! ছাড়। চলি।

রুমাল দিয়ে হাতটা মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

ভেবেছিল বেরিয়েই বোধহয় অদম্যকে দেখতে পাবে। ধারে কাছে কোথাও দেখলো না। ওঃ আর কিছু নয়। ভাব দেখানো হলো, 'দ্যাখো বাবু। আমি আড়াল থেকে পাহারা টাহারা দিচ্ছি না।'

বেশ রাগ রাগ ভাবেই সিঁড়িতে উঠে এলো। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে বুঝি সেই 'পাহারা'টাই কাম্য ছিল ওর।

কিন্তু দেখবার আশাটা তো ভুল। এ সময় তো ডাক্তারের নিঃশ্বাস ফেলবারও সময় থাকে না। নেহাৎ প্রমিতার গাড়িটাকে ফিরতে দেখেই—একটু এগিয়ে এসেছিল।

* * *

তবে প্রমিতার ভাগ্যকেও 'ধন্য ধন্য' করা যায় না।

দুর্দান্ত একখানা আশা আর উন্মুখ যৌবন নিয়ে সে যখন তার 'ভাগ্যের' উপহারের প্রতীক্ষা করছিল, তখন যদি ভাগ্য তার সঙ্গে এমন খামখেয়ালী ঠাট্টা করে বসে, তো কী করে 'ধন্য ধন্য' করা যায়?

স্বামীর মহত্ব 'সুধা' ধুয়ে জল খেলে কি তার তীব্র বাসনা আর তীব্র স্বপ্নের পিপাসা মিটবে? ওই লোককে প্রমিতা মুঠোয় পুরে ফেলে নিজের ইচ্ছেয় চালিত করতে পারবে এমন আশা থাকছে আর?

* * *

মেয়েকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে গাড়িটা চোখছাড়া হয়ে চলে যাবার পর পর্যন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে বাড়িতে ঢুকে এসেই মনোবীণা সামনেই বসবার ঘরের সোফায় বসে পড়ে বললো, শুনলে তো সারাদিন খুকুর কথা?

আসলে সেইজন্যেই তো আরো আগ্রহ করে মেয়েকে ডাকা। টেলিফোনে আর কতো জানা যায়?

বিভূতিভূষণ বললেন, শুনলাম বৈকি। মায় ওদের 'দুটিমাত্র প্রাণী'র সংসারে যে দৈনিক দুকিলো করে চালের ভাত রাঁধা হয় তাও তো শুনলাম। সে চাল আবার 'মোটা নয় রোগা' সেও শুনলাম।

মনোবীণা ক্রুদ্ধ মুখে বললো, 'ঠাট্টা করা হচ্ছে?'

বাঃ। ঠাট্টা কেন? 'সব' শুনলাম কি না জিগ্যেস করলে তাই বললাম। সবই তো শুনেছি। ওই অনাত্মীয় ছেলেটাকে নিয়ে এতোটা বাড়াবাড়ি! সুস্থ মগজের পরিচয় নয়।

ঠিক সেই কথাই হচ্ছে। তাকে না কি এখন কেবল কেবল 'ডায়ালিসিস' দিয়ে দিয়ে রাখা হচ্ছে।

তাই তো শুনলাম। সোজা ব্যাপার তো নয়।

আমি বলছি মহত্ব ফহত্ব কিছুই না, এ হচ্ছে স্রেফ অহমিকা দেখানো।

খুকু ঠিকই বলেছে—এ যেন খুকুর সামনে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মারা হয়েছে। এর চাইতে যদি—

বিভূতিভূষণ বললেন, কী হলো? থেমে গেলে যে?

নাঃ। বলছিলাম এর চাইতে যদি তোমার সেই রাঙাপিসির দেওয়া সম্বন্ধটা নিতাম ছাই! তাও ভালো হতো।

রাঙাপিসির দেওয়া—

আহা সেই যে গো ক্যানাডার ছেলেটা? ইঞ্জিনিয়ার! মেয়ে দূরে চলে যাবে ভেবে তেমন গা করলাম না তখন। এখন ভাবছি সে না হয় আমি এক আধবার গিয়ে দেখেই আসতাম। তবু মেয়েটাতো সুখী হতো!

বিভূতি একটু গম্ভীর হলেন।

বললেন, 'সুখী হতোই' এমন গ্যারান্টি ছিল?

থামো। তুমি আর দার্শনিক তত্ত্ব ফাঁদতে এসো না! একটা সভ্য শহরে সুখে আরামে স্বাধীনতায় আর আধুনিক জীবনের মধ্যে থাকতে পেতো তো?

বিভূতি বললেন, ওই শেষেরটার অবশ্যই গ্যারান্টি ছিল। তবে বাকি গুলো তো অনিশ্চিত।

অনিশ্চিত? ওখানে অনেক বেশি আরাম স্বাচ্ছন্দ্য স্বাধীনতা নেই।

আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্যকে যদি 'সুখ' বলো তো অবশ্যই 'সুখ'। তবে এখনই বা স্বাধীনতার কী এমন অভাব আছে তোমার মেয়ের? ওই তো বললো, যখন ইচ্ছে গাড়ি নিয়ে বেরোয় যখন ইচ্ছে ফেরে। কলকাতায় চলে এসে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দেয় ফাংশানে টাংশানে আসে। এখানেও ইচ্ছে হলেই চলে আসতে পারে বাধার প্রশ্ন নেই। এমন কী জামাই ওকে বলেছেন ড্রাইভিংটা শিখে নিলে লাইসেন্স করিয়ে দেবেন। গাড়ি একখানা তো দিয়েই রেখেছে। নিজে না কি বাপের পুরনো গাড়িখানা ব্যবহার করে। এর বেশি স্বাধীনতা আর কী হবে?

মনোবীণা তিক্ত ব্যাঙ্গের গলায় বলে, ইচ্ছেমত একখানা গাড়ি ব্যবহার করতে পেলেই 'সব হয়ে গেল।' কেমন? পুরুষের বুদ্ধি তো! আর কতোই হবে? বলি আসল জায়গাটাতেই তো শূন্য! 'সংসারের' সব অধিকার তো ওই কতকগুলো সুযোগসন্ধানী কাজের লোকজনের। তাদের হাতেই সব কলকাঠি। খেতে বসার আগে খুকু জানতেই পারেনা কী বাজার এসেছে, কী রান্না হয়েছে! চারবেলা শুধু কুটুম্বর আদরে মুখের সামনে খাবার এসে পৌঁছচ্ছে

আঁ্যা! তাই নাকি

বিভূতিভূষণ উৎফুল্ল গলায় বলেন, তা এখনকার মেয়েদের পক্ষে তো এ একেবারে আইডিয়াল অবস্থা!

আহা! বলেছে তোমায় এ কথা মেয়েরা। তাদের মধ্যে আর 'সংসার বাসনা' নেই না?

সংসার বাসনা? মানে হলুদ পাঁচফোড়ন তেল নুন লকড়ির হিসেবের দায়? যা করতে করতে তোমার সারাজীবন 'হাড়ে হলুদ' না কি যেন। খুকুর মধ্যে তেমন বাসনা আছে? বল কী?

দ্যাখো। বেশি রাগিও না বলছি। আমার জীবনভোর টানাটানির সংসারে খাটুনির কথা বাদ দাও। তা'বলে নিজের সংসারটি নিজের হাতের মুঠোয় রেখে নিজের মতো চালাব এ ইচ্ছে আর কোন মেয়ের মধ্যে না থাকে? খুকু তো আর নিয়ম ছাড়া নয়? ভেবেছিলাম—এখানে শাশুড়ি ননদ হ্যানোত্যানোর বালাই নেই, কর্তৃত্বটি সম্পূর্ণই ওর থাকবে। তা নয় এক বিদঘুটে ব্যবস্থা। 'গিন্নি' হচ্ছেন পুরানো চাকর, আর 'হেড' হচ্ছেন কে এক বুড়ি রাঁধুনি বামনী। খরচের ঘটা চলছে চোখের সামনে। আরো একটা বাচ্চা চাকরও না কি আছে বাড়ির ছেলের মতো তার আধিপত্য। ছাতে উঠছে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, অসময়ে 'খিদে লেগেছে' বলে বায়না করছে। এইসব নীরবে দেখতে হচ্ছে খুকুকে। সংসারটা হাতে পেলে খুকু সিকি খরচে চালাতে পারতো।

বিভূতিভূষণ হঠাৎ দুঃসাহসী হয়ে ওঠেন না কি? তাই হেসে বলে ওঠেন, আমার কিন্তু ধারণা ঠিক উল্টো। খুকুর হাতে পড়লে আরো চারগুণ খরচা হতো।

হঠাৎ এরকম ধারণার মানে? আমি তোমার সংসারে তাই করছি চিরকাল?

বিভূতি নিজেকে সামলে নেন।

আহা তোমার কথা কে ধরছে? তুমি তো সেকালের মেয়ে। কথা হচ্ছে একালের মেয়েদের। ওদের মিতব্যায়িতা দেখতে পাবে ওই 'সরুচাল মোটাচালে' হলুদ পাঁচফোড়নে। এদিকে খিড়কি দিয়ে হাতি গলে যাবে। রাগ কোরো না—তোমার মেয়ের শুধু নিজের জন্যেই মাসে কতো টাকার পেট্রল খরচ হয় ভেবেছো কোনোদিন? তাছাড়া অকারণে মার্কেটিঙে?

ওঃ। তার মানে তোমার ইচ্ছে খুকু সেইখানে অশোকবনে সীতার মতো সর্বদা চেড়ি পরিবেষ্টিতা হয়ে নিরুপায় নিশ্বাস ফেলে দিন কাটাক।

কেমন? তোমার জামাই বাবাজীর তো স্ত্রীকে একটু সাহচর্য দেবারও টাইম নেই। একটু গাড়ি চড়ে বলে—

আরে বাবা। আমি কি তাই বলেছি? বলছি যে—থাক থাক। তুমি যে কী বলতে চেয়েছ তা খুব বুঝেছি। মার্কেটিং। সে খোঁটাও দেওয়া হলো। বান্ধবীদের সঙ্গে বেরিয়ে, হৈ চৈ করে কিছু কেনাকাটা না করলে মানায়? তাদের বা তাদের কারো বাচ্চা থাকলে তাকে কিছু উপহার না দিলে প্রেস্টিজ থাকে? এই যে মাঝে মধ্যে আমার জন্যে হুটহাট একখানা শাড়ি কিনে আনে তাতেও বোধহয় তোমার চোখ টাটায়?···বর ওকে 'হাত খরচ বলে যে টাকাটা দেয় সেটা খরচা না করে জমালেও তো বর ওকে 'কিপটে' বলবে! আসলে সবটাই ওর হাতে থাকলে কে বুঝতো কী রাখছে, কী খরচা। এমন অবস্থাকে তুমি 'স্বাধীনতা' বলতো পারো আমি পারি না। স্বামীর রোজগারে স্ত্রীর পূর্ণ অধিকার থাকা দরকার। বুঝলে? তা থাকলে আর অদম্য ওই একটা ফালতু লোককে মাধ্যম করে অহঙ্কার দেখাতে আসতে পারতো না। আমার খুকুর ভাগ্যেই যে এতো জটিলতা ছিল কে জানতো!

ক্ষোভে দুঃখে ঘর থেকে উঠে যায় মনোবীণা।

বিভূতিভূষন ভাবেন জটিলতা কি শুধু তোমার খুকুরই? এ যুগে কোন মেয়েটাই বা ওই 'জটিলতার জালে' পড়ে হাঁপাচ্ছে না? প্রত্যেকের মধ্যেই তো অভিযোগ আর অসন্তোষ। মেয়েগুলো স্বামীটাকে ক্রীতদাস রূপেও পেতে চায়, আবার তাকে 'শৌর্য' বীর্য' সাহস শক্তি' সম্বলিত একখানি সর্বগুণের আধার রূপেও দেখতে চায়। দৈনন্দিন জীবনে—নিশ্চিন্ততা সচ্ছলতা প্রাচুর্য পেতে চায় প্রভূত পরিমাণ, আবার তারসঙ্গে স্বামীটাকেও সর্বদা সঙ্গে পেতে চায়। ওই দুটো বস্তু যে একসঙ্গে পাওয়া যায়না এ বোধ নেই। ···আবার যারা নিজেরা উপার্জন করতে বেরোয়, তাদের জীবনে তো সত্যিই দারুণ জটিলতা। তবে এই সমস্ত মেয়েদের আখের ঘোচাতে চান, তাদেরই পরিণত বয়স্কা অপরিণত বুদ্ধি···স্নেহময়ী জননীরা। মেয়েদেরকে, 'অ্যাডজাস্ট' করতে না শিখিয়ে, শিখোতে বসেন বিচ্ছিন্নতাবাদের শিক্ষা।

তাঁদের শিক্ষা হচ্ছে, কেন? তুই কিসের জন্যে সব মেনে নিবি মানিয়ে নিবি? তোর ইচ্ছেমতো তুই চলবি। পড়ে মার খাবার যুগ আর নেই।

অথচ এই বৃহৎ জগতে সর্বত্রই তো 'মেনে' আর 'মানিয়ে' নিতে হয়। রাস্তায় ঘাটে যান বাহনে কর্মক্ষেত্রে কোথায় নয়? মানিয়ে নিতে না

পারলে 'ডিসিপ্লিন' জিনিসটাকে থোড়াই কেয়ার করলেই তো ছন্দপতন।

কিন্তু বিভূতিভূষণের ওই চিন্তাধারা তো এ যুগের উপযুক্ত নয়। তাই তাঁর সব বক্তব্যই মনে মনে।

*   *   *

কর্মঅন্তে দোতলায় উঠে এসে অদম্য স্নান করতে যাবার আগেই প্রমিতার কাছে এসে উৎফুল্ল গলায় বললো পলাশ আজ দারুণ খুশি! চোখ মুখ দেখে মনে হলো যেন অসুখ অর্ধেকটা কমে গেছে।

প্রমিতা অবশ্যই অদম্যর বক্তব্যের অর্থ অনুধাবন করলো। তবু অবোধের ভঙ্গিতে বললো, হঠাৎ এত খুশির কারণ?

কারণ? সেটা কি আর বলে দিতে হবে? সত্যি তোমার ওর কাছে যাওয়া, একটু কাছে বসা এ ওর পক্ষে মস্ত ওষুধের মতো।

তাই বুঝি?

প্রমিতা ওর স্বভাবগত ব্যাঙ্গের গলায় বলে, তাহলে তোমার আর এত অর্থ সামর্থ্যব্যায় করার দরকারটা কী? আমিই ওই তোমার মিনিনার্সিংহোমের ঘরে গিয়ে বাসা বাঁধি।

সর্বনাশ! এস্পারের পরই এতটা ওস্পার?

হেসে ওঠে অদম্য।

তারপরেই গভীর গলায় বলে নাঃ সত্যিই মনে হচ্ছে তুমি যদি রোজ একটুখানি সময় ওর জন্যে দাও। বেচারি তোমার যে কী চোখে দেখে। প্রায় স্বর্গের দেবীটেবীর মতোই।

যাই বল এতটা ভালোবাসা একেবারে 'তুচ্ছ বস্তু' নয়। তুমি চলে আসার পর ও নাকি ব্রজদার কাছ থেকে একটু কাগজ আর ডট্ পেন চেয়ে নিয়েছিল। আমি দেখি বুকের ওপর বই রেখে কাগজ আটকে কিছু লিখছে। আমায় দেখে তাড়াতাড়ি রেখে দিয়ে ভারি সুন্দর একটু হেসে বললো, বকুনি দেবেন না তো? হঠাৎ একটু লিখতে ইচ্ছে করলো!

বললাম, বকুনি দেবো কি বলেন? লিখতে ইচ্ছে এতো ভালো লক্ষণ। তবে আপত্তি না থাকলে দেখাবেন কী লিখলেন!

প্রমিতা বলে উঠলো, কী 'লিখবে' তা অবশ্যই বুঝতে অসুবিধে হয়নি তোমার?

অদম্য বললো, অবশ্যই কবিতা।

হ্যাঁ। ন্যাকামার্কা একখানি প্রেমের কবিতা। আর সেটি তোমারই বৌয়ের উদ্দেশে। দেখে খুব ভাল লাগবে?

অদম্য প্রমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো।

ঠিক তীব্র রাগ নয়, তার সঙ্গে যেন কিছুটা প্রশ্রয়ের কৌতুক। এর নামই বোধহয় 'কোপ'। যা লীলাচ্ছলে ব্যবহার করা হয়। চেয়ে থেকে বললো, কেন নয়? কবিরা তো 'নিরেট'দের খুব সাহায্যকরী বন্ধু। নিরেটরা তো নিজের মনের কথা গুছিয়ে বলে উঠতে পারে না, অথচ বলবার জন্যে অস্থির আকুল হয়ে ছটফটিয়ে মরে। সেই অবস্থায় 'কবি'ই তো তার মুখে ভাষা জোগায়।

বাঃ! কাব্যতত্ত্বটা তো ভালোই জানা আছে দেখছি। তবে 'মনস্তত্ত্ব' দেখছি সার্জারির ডাক্তারের ভীষণ কম।

কেন? কিসে প্রমাণিত হলো সেটা?

প্রতিপদেই হচ্ছে।

আচ্ছা! এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা এসে হবে। বলে হাসতে হাসতে স্নানের ঘরের দিকে চলে যায়। আর প্রমিতা সেই দিকে তাকিয়ে একটা আক্রোশে মেশা হতাশ দৃষ্টিতে তাকায়। কিছুতেই বুঝতে পারা যায় না লোকটাকে, এ কি কম বিরক্তিকর! ওই হ্যাংলাটা আমায় নিয়ে প্রেমের কবিতা লিখছে বুঝে আহ্লাদে ভাসছে! এ কি একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপার!

স্নান সেরে এসে দুজনে একসঙ্গে খেতে বসলো।

আর সেই সময়ই একসময় বলে উঠলো অদম্য, আচ্ছা প্রমিতা সত্যিই কি তুমি একটু ভালোবাসতে পার না! একটু মমতা করতে? প্রমিতার মুখটা রাগে লাল হয়ে ওঠে।

কী অদ্ভুত নাছোড়বান্দা 'লোকটা।'

বললো, পারি না পারি সেটা কি তোমার কাছে খুবই জরুরি?

খুব। মিতা। খুব। আমার কেবলই মনে হয় ওর মানসিক গড়নটা এমন যে-রকম গড়নের মনের কাছে 'মমতা' ভালোবাসা এ দুটো সত্যিই মস্ত ওষুধের মতো। বেচারা অল্প বয়সে মা বাপকে হারিয়েছে, নিকট আত্মীয় হলেও 'অনাত্মীয়ের' মতো এমন একজনের কাছে বাস করতে হয়েছে বন্ধু টন্ধুরাও কেউ তেমন পাত্তা দেয়নি ঘনিষ্ঠ হয়নি। তাই—

'তাই'টা কী?

তাই টা? ওই যে তোমার মা সেদিন বলেছিলেন, 'স্নেহের কাঙাল'। তাই মনে হচ্ছিল তুমি যদি ওকে একটু মমতা ভালোবাসার স্বাদ দিতে পারতে—

অত্তর দরকার কী?

প্রমিতা চাপা তীক্ষ্ম গলায় বলে স্বয়ং আপনি তো সেটা যথেষ্ঠরও বেশি

ঢালছেন ডাক্তারবাবু ! আপনি ও তো ঘোষণা করেছেন ওর প্রেমে পড়েছেন ।

অস্বীকার করছি না । তবু—

একটু হেসে বলে অদম্য সেই যে চিরকালের প্রবাদ দুধের স্বাদ ঘোলে কি মেটে ?

হঠাৎ গলার স্বর খুব নামিয়ে অনুনয়ের গলায় বলে, একটু চেষ্টা করে দেখো না মিতা ?

ওঃ। চেষ্টা। চেষ্টা করে করে ওই ল্যাগবেগের প্রেমে পড়তে বসবো আমি ? কি জন্যে ? কিসের দায়ে ?

মিতা : যদি বলি মানবিকতার দায়ে।

তোমার মতো অত মানবিকতা বোধ নেই আমার।

মিতা ! মানুষ মাত্রেরই মানবিকতার দায় থাকে। দ্যাখো না। ভালোবাসার অভিনয় করতে করতেও আস্তে আস্তে ভালোবাসা এসে যায়।

অভিনয়। তুমি আমায় ভেবেছ কী ?

টেবিল ছেড়ে ঠিকরে উঠে পড়ে প্রমিতা। তুমি আমায় ভেবেছো কী ? যা খুশি করিয়ে নেবে ? সে আশা ছাড়ো ! জীবনটা সিনেমার গল্প নয় বুঝলে ? তুমি ডাক্তারবাবু তোমার এক্সপেরিমেন্টের সুবিধের জন্যে তোমার স্ত্রীকে দিয়ে প্রেমের অভিনয় করিয়ে রোগীর রোগ সারাবে। সব কিছুরই একটা মাত্রা থাকা দরকার বুঝলে ? আমি থাকব না। আমি মার কাছে চলে যাব ।

মিতা ! আমায় ক্ষমা করে দাও। বুঝতে পারিনি তুমি এতে এতো রেগে যাবে। ভাবলাম হরদম তো সিনেমা টিনেমায় দেখা যায় রোগী টোগী সারিয়ে তুলতে—

বলেছিতো— জীবনটা সিনেমার গল্প নয় !

চলে যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে তিক্ত গলায় বলে, তোমার মতলবটাই আমি আজ পর্যন্ত ধরতে পারছি না। আমাকে কি অন্যের ওপর চাপিয়ে ফ্রি হতে চাও ? আমি অন্য কিছুতে ভুলে থাকলে বেঁচে যাও ? বিয়ে করার কোনো দরকার ছিল না তোমার।

মিতা ! আমি সব কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। দেখছি সত্যিই আমি খুব বোকা। এছাড়া আর কোনো সন্দেহ কোরোনা আমায়।

'বোকা ?'

আবার ফিরে দাঁড়ায় মিতা।

বলে, বোকা মোটেই নয়। তুমি হচ্ছো একটি 'শয়তান।' ক্রমশই স্বরূপ ধরা পড়ছে।

*   *   *

পেশাটা বড় নিরুপায়ের। অদম্য যখন ভাবতে বসেছে প্রমিতার এই ভুল ধারণাটা, আর তার ফল তীব্র অভিমানটি কীভাবে দূর করা যায়, ঠিক তখনি খবর এলো 'বান্দরের নাহিকো সময়।'

সতীশ মাষ্টার এসে কেঁদে পড়েছে, হঠাৎ তার মা যায় যায়। রাঁধতে রাঁধতে দুম করে অজ্ঞান হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে।

বুড়ো ধাড়ি লোকটার মায়ের জন্যে যা পাগলপারা ভাব খোকাদাদাবাবু, হাসব না কাঁদব!

অদম্য তাড়াতাড়ি 'প্রস্তুত' হতে হতে বলে, হাসবার কী হলো?

তো মা বুড়ি কোন না সত্তর বাহাত্তরে পৌঁছেছে।

বয়সে পৌঁছেছে বলে মায়ের জন্যে কাতর হবে না? তুই বলিস কী ব্রজদা? মতিবুদ্ধি এমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন? ছিঃ।

বলে বেরিয়ে পড়ে চটপট।

গিয়ে দেখল করার আর কিছু নেই।

কাঁচা পাকা চুল সতীশ মাষ্টার মায়ের পায়ে গড়াগড়ি খেয়ে মেয়েদের মতো কথা বলে বলে কাঁদছে, ওমা তুমি দুদশ বছর পক্ষাঘাত হয়ে পড়ে থাকলে না কেন? আমি তোমায় সেবা যত্ন করার সময় পেতুম! ওমা তুমি সকালেও কেন বলনি তোমার শরীর খারাপ। কেন তাড়াতাড়ি আমার জন্যে রান্না করতে বসেছিলে!

বাল্যে পিতৃহীন অকৃতদার সতীশ মাষ্টারের সংসারে চিরদিনই কেবলমাত্র মা আর ছেলে। ভেঙ্গে পড়তেই পারে।

অদম্যকে করার মধ্যে শুধু 'ডেথ সার্টিফিকেটটা' দিয়ে আসতে হলো।

ফেরার সময় বাবার একটা কথা মনে পড়লো অদম্যর। তাকে ডাক্তারি পড়াবার সংকল্পের সময় বলেছিলেন বাবা, ডাক্তারের জীবন মোটেই সুখের নয় রে অমু, খুবই দুঃখের। নিজের আরাম আয়েস চিন্তাভাবনার কথা বাদ দিয়েও বলছি—মানুষের সুখ আহ্লাদের দৃশ্যগুলোর সময়টা দেখবার ভাগ্য হয় না আমাদের, সর্বদাই মুখোমুখি হতে হয় তাদের রোগ শোক দুঃখ যন্ত্রণা আর হাহাকারের। কত মাথা খোঁড়াখুঁড়ি, কত বুক চাপড়ানি আর কত

গড়াগড়ি খাওয়াই দেখলাম রে এ জীবনে। অথচ মানুষের সুখ আনন্দের সময় একটু ডাকলেও সে দৃশ্য দেখতে যাবার অবকাশ সহজে মেলে না। কত জনা আগ্রহ করে ছেলেমেয়ের বিয়েটিয়ে নাতনি নাতির অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন করে যায়, ডাক্তারবাবু নিশ্চয় যাবেন। দৈবাৎই সে অনুরোধ রাখতে পেরে ওঠা যায়রে। হয়ত কারুর মেয়ের বিয়েতে যাব বলে বেরোচ্ছি ছুটতে হলো আর কারুর নাভিশ্বাস উঠেছে দেখতে।···তবু বাপ হয়ে তোকে এই 'কর্ম্মে'ই' ঢোকাতে চাইছি। কেন চাইছি জানিস?···রোগ ব্যাধি সারাতে পারি আর না পারি, তার চেষ্টাটায় একটা স্বর্গীয় সুখ আছে বুঝলি? তাছাড়া মানুষের কাজে লাগবার উপযুক্ত পেশা বোধহয় এর থেকে বেশি নেই। তবে জীবনে সেটা মনে রাখতে হবে। শুধু রোগ নির্ণয় করতে শিখলাম আর তার উপযুক্ত চিকিৎসাবিদ্যে শিখলাম এটাই শেষকথা নয়। শেষকথা হচ্ছে দরদ ভালোবাসা। সব মানুষকেই 'মনিষ্যি' বলে ভাবতে শেখা! 'ডাক্তারি'শুধু 'জীবিকা' নয় একটি 'ব্রত।'

বাবার কথাগুলো ভাবতে ভাবতে খুব পিছনের দিকে চলে গিয়ে মনটা হারিয়ে যায়।

বাবা মা অদম্য আর নীতুপিসিকে দিয়ে গড়া সেই ছোট্টবেলার জীবন। একদিন মা চলে যাওয়ার বিশাল শূন্যতা। নীতুপিসি বিয়েহয়ে চলে যাওয়ার আর এক শূন্যতা, শেষ অবধি বাবাকেও হারিয়ে ফেলা।

আশ্চর্য! এত হারিয়ে হারিয়েও মানুষ আবার কী করে ঠিকঠাক দাঁড়িয়ে উঠে দৌড় দেয়! শূন্যতাগুলো কীসে ভরে ওঠে?···

অদম্য ভাবলো, তখন ভরতে থাকে 'কাজ' দিয়ে। কাজের পর কাজের ঢেউ, সেটাই ঠেলে নিয়ে যায়। তারই মাঝখানে মাঝখানে 'নতুন' মুখ! নতুন নির্ভরতা। নতুন প্রেরণা!

কিন্তু এইখানেই কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে অদম্যর। 'নির্ভরতা?' কই সেখানে তো কোনো নতুনের স্পর্শ আসেনি অদম্যর। আর প্রেরণা? তাই বা কোথায়? প্রমিতা এখনো মনে প্রাণে তার মর্মসঙ্গিনী হয়ে উঠলো কই?

তারপরই ভাবলো, আমি কেবল আমার নিজের দিকটাই ভাবছি, ওরও তো নিজস্ব একটা দিক আছে? আসলে দু'জনের মানসিকতার মধ্যে অনেকখানি তফাৎ! এমন কোন শক্তি আছে যে সেই তফাৎটাকে দূর করে পরস্পরকে কাছাকাছি এনে দিতে পারে? ভালোবাসা ছাড়া এতখানি বিপ্লবী শক্তি আর কার আছে?

অদম্য ডাক্তার এ যুগেও সেই শক্তিতে বিশ্বাসী। সাধে ওর বৌ বলে 'সৃষ্টিছাড়া!'

*　　　　*　　　　*

বাড়ি ফিরেই দেখলো প্রমিতা যাবার জন্যে প্রস্তুত।

বসে পড়ে বললো, মিতা তুমি আমায় বড্ড ভুল বুঝছ। একটু ধৈর্য ধরে দেখো। লোকটা আমি সত্যিই শয়তান নয়। তবে অবশ্যই নির্বোধ। নিতান্তই মিনতি করছি তুমি এ ভাবে চলে যেও না।

প্রমিতা বললো, আমার অসহ্য লাগছে।

'অসহ্য' অবস্থাকেও 'সহ্য' করতে পারাও তো একটা শক্তি মিতা!

আমার অত শক্তি নেই।

কার মধ্যে যে কতখানি শক্তি থাকে, অনেক সময় সে নিজেও জানে না। এবারটার মতো তুমি তোমার সংকল্প থেকে নিবৃত্ত হও। কথা দিচ্ছি আমি তোমায় তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে বলব না।

প্রমিতা চুপ করে থাকে।

অদম্য আবার বলে খুব শান্ত গলায়, কিন্তু আমি কি কোনো সময় তোমার ওপর আমার ইচ্ছের জোর খাটিয়েছি?

প্রমিতা মনে মনে চেঁচিয়ে ওঠে, সেটাই তো বেশি জোর খাটানো। জোর খাটালে তো লড়াইয়ের স্কোপ থাকে। তুমি আমায় কোনো কিছুতেই বারণ করনা। কেন? কেন তুমি এমন 'উদারের' ছদ্মবেশে আমার মধ্যে একটা কমপ্লেক্স এনে দেবে? আমি একটা সংঘর্ষ চাই। সেই সংঘর্ষের মধ্যে সোচ্চার হতে চাই। তোমার সংসারের এই পুরনো ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার করে ফেলতে চাই। আর না হয়ত তোমায় এই চির অভ্যাসের অক্টোপাসের বন্ধন থেকে ছিঁড়ে কেটে মুক্ত করে নিয়ে গিয়ে নিজের মতো করে জীবন গড়তে চাই। সে সুযোগ দেবে তুমি আমাকে?

কিন্তু চিৎকারটা মনে মনেই।

অদম্য আস্তে বললো, মিতা! তুমি কি সত্যিই চাও পলাশ এখানে না থাকুক! তাহলে আমি ওকে অন্য কোন ব্যবস্থায়—কিন্তু কি জানি কদিনই বা বাঁচবে!

প্রমিতা আবার রেগে ওঠে।

আমি তাই বলেছি? ভারি একটা পলাশ। ওকে নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই! ও থাকুক যাক আমার কিছুই এসে যায় না। তুমি কেন!

তুমি 'কেন! কেন ভাববে আমাকে দিয়ে তুমি তোমার একটা এক্সপেরিমেণ্ট করবে! আমি তোমার একটা গিনিপিগ?

অদম্য অবাক হয়।

অদম্য থতমত খায়।

প্রমিতা যে প্রতিটি ব্যাপারই এত বেশি সিরিয়াস ভাবে নেয় তা এতদিনেও টের পায়নি কেন ভেবে লজ্জা পায়।

কিন্তু কোনো কিছু বলার আগেই ঘরের বাইরে নীতুপিসির কণ্ঠস্বর ঝংকৃত হয়, অমু! বাড়ি আছিস তাহলে? বাঁচলাম বাবা! আজই ফিরতে হবে, এসে দুদশঘণ্টা বসে থাকতে হলে—

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো অদম্য।

কী অসম্ভব দৈব ঘটনা! বিনা নোটিশে আর বিনা আমন্ত্রণে তুমি!

খুব যে কথা শিখেছিস! আমার বাপের বাড়ি আমি যখন খুশি আসতে পারি। তুই ব্যাটা কে রে, যে তোর আমন্ত্রন নেমতন্ন ধার ধারব?

যেন কোথা থেকে অকস্মাৎ একটা দমকা হাওয়া ছুটে এলো। যেন আকাশ কালো করে জমে ওঠা মেঘ মুহূর্তে ছিঁড়ে খুঁড়ে উড়ে গেল।

অদম্য বললো, একশোবার মানছি সে কথা? কিন্তু 'ইচ্ছাময়ীর' ইচ্ছেটা যে বড়ই দুর্লভ! তো এইমাত্র এলে নাকি?

না তো কী এসে লুকিয়ে বসেছিলাম? তো এক্ষুনি বেরোবি নাকি?

নাঃ। এইমাত্র একটা বুড়িকে শ্মশানে পাঠিয়ে দিয়ে ফিরলাম।

নির্মল একটা হাসির হাওয়া বয়ে গেল সারা জায়গাটায়। তারপরই পিসি বলে উঠলো, কই। আসল মানুষটি কই? যেটাকে কনে বৌ দেখে বিদেয় নিয়েছিলাম।

তবু ঈষৎ কণ্টকিত হচ্ছিল অদম্য প্রমিতা যদি সংকল্পে স্থির থেকে এখুনি বেরিয়ে যায়, অদম্যর জীবনের দৈন্যটা বড়বেশি ধরা পড়া যাবে। নীতুপিসির কাছে তো আর মিছে করে বানিয়ে কিছু বলা যাবে না? কিন্তু খুব স্বস্তির চোখে তাকিয়ে দেখলো, প্রমিতা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নম্রভাবে প্রণাম করলো পিসিশাশুড়িকে। আর অদম্যকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠলো, আহা! আসল মানুষটির জন্যে তো ভারি ভাবনা ছিল আপনার। মস্ত একটা খালি বাড়িতে তাকে একা ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়ে আর আসাই নেই।

অদম্য অবাকের অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে প্রমিতার হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে।···অথচ প্রমিতার 'অভিনয়ে' এত আপত্তি ছিল।

না কি অবিচার করছে প্রমিতার ওপর ?

সত্যিই খুশি হয়েছে প্রমিতা নীতুকে দেখে ?

নাঃ। কেউ কাউকে ঠিকমত বুঝতে পারে না !

তবু ভারি খুশি হলো। প্রায় বর্তে গেল। তবে হয় তো প্রমিতা—

* * *

না প্রমিতা সংসারে একটা সাড়াতুলে কলকাতায় চলে যায়নি। বরং বলে উঠেছিল আজই ফিরে যাবেন মানে? তা যদি যান্ আমিও সঙ্গে সঙ্গে আপনার বাপের বাড়িটি ছেড়ে আমার নিজের বাপের বাড়িতে চলে যাব !

প্রমিতা কি নতুন সংকল্পে দৃঢ় হয়েছিল, অদম্যকে ক্ষণে ক্ষণে চমকে দেবে বলে ? না কি ওদের মতো সরস বাকভঙ্গি যে তারও আয়ত্ত আছে সেটা দেখিয়ে দেবে ?

কিন্তু এতো কিছুই না।

আরো কতখানি বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল অদম্যর জন্যে তা কে জানতো। অদম্য জানলো ! জেনে প্রথমটা প্রায় স্তব্ধই হয়ে গেল। তারপর বিচলিত।

নীতু বলল, আজই ফিরতে হবে বলছি কি সাধে রে বাবা ? তুই সেদিন একটা বেচারি মেয়েকে চাকরি দেবার আশ্বাস দিয়ে এলি ! সে তো বসে বসে দিন গুণছে। আর নিজের চেষ্টায় ট্রেনিং নিচ্ছে। তো তদবধি তোর আর সাড়াই নেই। ভাবলুম যাক গে একবার সেটাকে নিয়ে চলেই আসি। সরেজমিনে তদন্ত হয়ে যাক। সুরাহা দেখি তো রেখে যাব, নাহলে নিয়ে যাব। তো এসেই 'ব্রজবাবু'র কাছে যা শুনলুম তাতে আশা হচ্ছে হয়তো সুরাহা হলেও হতে পারে। এখন বল তোর কী মতামত ?

* * *

এভাবে চলে আসায় খুব রেগে গেছেন নিশ্চয় ?

বৈশাখী খুব শান্ত গলায় বলে, আমি যখন আপনার আশ্বাসের আশায় হতাশ হয়ে ঠিক করে ফেলেছিলাম ওখানেই ওই লক্ষ্মীছাড়া হাসপাতালটাতে নাহয় একটা আয়ার চাকরিই নিয়ে নিই, তখন মামারা ঘোষণা করলেন, এতে তাঁদের মুখ পুড়বে প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাবে। তখন ছোটোমামী বললো, চল একবার গিয়ে দেখে আসি। তারপর—

অদম্য খুব কষ্টে বললো, 'তারপর ?'

তারপর আর কী ! সেই কবে যেন একবার কার গলায় মালা ঠেকিয়েছিলাম, সেখানেই ঠেলে গিয়ে উঠে যারা আছে তাদের সঙ্গে লাঠালাঠি করে অথবা

তাদের পায়ের কাদা হয়ে সেখানেই বাস করতে যেতে হবে। এখানে মামাদের ভাত আর গলা দিয়ে নামানো যাচ্ছিল না তো।

এমন শান্ত ভাবে কথাগুলো বলেছিল বৈশাখী, যেন অন্য কারো সম্পর্কে গল্প করছে।

অদম্য বললো, তুমি আসায় রাগ করেছি বলছো? হ্যাঁ রাগ করেছি। প্রচণ্ডভাবে রাগ করেছি। নিজের ওপর। নিজেকে চাবকাতে ইচ্ছে করছে। ভেবে চলেছি এদিকে একটা কিছু ব্যবস্থা করে তবে জানাব। কিন্তু কোনখান দিয়ে যে কতগুলো দিন চলে গেছে, খেয়ালই করিনি। খুব উচিত ছিল একটা যোগাযোগ করা। কিন্তু দেখছি একটা নার্সিং হোম-এর বাড়ি বানিয়ে ফেলে তাকে চালু করা—নেহাৎ দু'দশদিনের ব্যাপার নয়। অথচ—

বৈশাখী মৃদু হেসে বললো, কেন? আমাদের ব্রজদা যে খবর দিলেন, বাড়িতেই একটা মিনি নার্সিং হোম খুলেছেন? একটা রোগীও ভর্তি আছে। তবে উপযুক্ত নার্সের অভাব—

ব্রজদা বলেছে একথা?

তাই তো বললো। তাই ছোটোমামী বলল, তবে 'ডক্টর বোসের' কাছে একটা দরখাস্ত দিয়েই দ্যাখ।

* * *

সংসারে অভাবিত ঘটনাও ঘটে বৈকি। অন্তত সৃষ্টিছাড়াদের সংসারে ঘটে। না হলে—সত্যি সত্যিই বৈশাখী নামের মেয়েটার ডাক্তার বোসের মিনি নার্সিং হোমে, একটা নার্সের চাকরি জুটে যায়?

তার 'রক্ষয়িত্রী পালয়িত্রী' অথচ নিজ সংসারে সসম্মানে পালনে রক্ষণে অক্ষম ছোটোমামীটি অবশ্য তক্ষুণি তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়নি, থেকে গেল ক'দিন। এবং তার বাপের বাড়ির সংসারের অনেক কিছু সুব্যবস্থাও করে গেল।

এ তোমার কেমন আক্কেল ব্রজরাজ? বাড়ির গিন্নিকে সংসারের কুটোটি ভাঙতে না দিয়ে কুটুমের মতো বসিয়ে রেখে তোয়াজ মারছো? একটা মেয়ের তাতে প্রাণ হাঁপাবে না? তোমার কর্তাত্বি একটু কমাও না বাবা। বুড়োও তো হচ্ছো? নাকি হচ্ছো না?···বামুনদি, তুমিই বা এখনো 'খোকার খাবার' বলে মাছ মাংস ছুঁয়ে মরছো কেন বুড়ো বয়েসে? ছাড়ো তো। ওটুকু বৌ খুব পারবে! এখনকার মেয়েরা রান্নায় কতো পটু জানো তুমি? দিশি বিলিতি বোম্বাই মাদ্রাজি রান্না রাঁধতে পারে বুঝলে? জজ ম্যাজিস্ট্রেটি করছে তারমধ্যেও রকম রকম রান্না করে স্বামীপুত্তরকে খাওয়াচ্ছে।···ও ব্রজরাজ,

এই পাশের সরু ঘরটাতেই বৈশাখী দিদির বেশ চলে যাবে, ওই মাঝখানের বড় ঘরে বিছানাপত্তর নিয়ে দাপাদাপি করতে বোসো না। ওই যে গোবিন্দ না কেষ্ট কী নামের একটা ছেলে ঘুরছিল কে ও? উঃ বামুনদিদির পুষ্যি? তো ওই ছেলেটাই রাত্তিরে শোবে ও ঘরের মেজেয়।

এমন অবলীলায় বলে, যেন এ বাড়ির সবকিছু ম্যানেজমেণ্টের অধিকার তারই।

তারপর ফিরে যাবার সময় বৈশাখীকেই হেসে হেসে বলে, কী রে? কী মনে হচ্ছে? ছোটোমামী তো একটা অসম সাহসিক কাজ করে বসলো, তার মুখটা রাখতে পারবি এ গ্যারাণ্টি রইলো তো?

বৈশাখী চোখে উপছানো জলকে কষ্টে চোখের মধ্যে রেখে বললো, অবিশ্বাস করছো? তাহলে রেখে যাচ্ছ কোন সাহসে?

ধ্যেৎ! অবিশ্বাস তোকে নয়। ভয় আর অবিশ্বাস—পৃথিবীকে। কিন্তু তুই যখন জোর গলায় বললি, 'ভদ্রেশ্বরের ভাত আর নয় ছোটোমামী। শেষমেষ না হয় সেই বনগাঁতেই গিয়ে ঠেলে উঠতে হবে, তখন মরিয়া হয়েই,—

তারপর গলা নামিয়ে বললো, অমুর বৌকে কেমন লাগলো?

তুমি যা বলেছিলে, তার থেকেও অনেক সুন্দরী।

যাক। 'সুন্দরীর' কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে ওর ধারে কাছে ঠিকভাবে থাকতে পারবি?

ওমা! পারবো না কেন? 'আগুন' না কি? যে ধারে কাছে ঘুরলে গায়ে ফোস্কা পড়বে? · ব্রজদা থাকছে না? বামুনমাসি থাকছে না? আর ওই গোবিন্দ কিংবা কম্পাউণ্ডারবাবুর ছোটছেলে? কাজের লোকেরা যেমন ভাবে থাকে সেইভাবেই থাকব।

থাম মুখপুড়ি। দুর্গা দুর্গা। 'কাজের লোক?' তা 'কাজের লোক' যখন, তখন মাইনেপত্তর ভালো করে ঠিক করে নিয়েছিস তো?

'বৈশাখী দয়ার অবতারের' ভঙ্গি করে বলে, এখুনি আর ওটা নিয়ে চাপ দিলাম না। হাজার হোক নতুন ব্যবসা খুলেছে ডাক্তারবাবু! তাও একটা মাত্তর রুগি। আপাতত থাকা খাওয়ার বদলেই হি হি হি!

হেসে গড়াতে গিয়ে সামলে নিয়ে মুখে আঁচল চেপে হাসতে থাকে।

*　　*　　*

নার্স?

পলাশ অবাক হয়ে বলে কী বলছেন আপনি?

অদম্য একটু হেসে বলে, কেন? পছন্দ হচ্ছে না? গ্রাম-গঞ্জের ব্যাপার, নার্সের পোশাকটা জোগাড় হয়ে ওঠেনি। ওতে আর কী ক্ষতি? নার্সিং-এর ট্রেনিং কি রকম সেটাই দেখা যাক।

পলাশ ব্যস্ত হয়ে বলে, না না! মানে বলছিলাম যে—

ক্লান্ত হয়ে একটু চুপ করে যায়। আবার আস্তে বলে ঠিক বাড়ীর লোকের মতো লাগলো।

তা নার্স টার্সরা তো আকাশ থেকে পড়ে না। কোনো একটা বাড়িরই মেয়ে তো! নাকি? বেশ তো বাড়ির লোকের মতো ভেবেই সহজ হবেন। যখন যা দরকার বলবেন!

কিন্তু ডক্টর বোস! বলছিলাম যে—

হাঁ। আজকাল এই নামটাই ব্যবহার করছে পলাশ! কেবল 'আপনি' 'ইয়ে' 'শুনুন' বলে কতোই আর চালানো যায়?

কী? বলুন আর কী বলার আছে?

বলছি—আমার জন্যে কেন আপনি এতো—

প্রশ্নটা বড্ড পুরনো হয়ে গেছে পলাশবাবু! মনে হচ্ছে উত্তরটাও বলা হয়ে গেছে অনেকবার। 'আপনার' জন্যে নয়, আমার একজন পেসেন্টের জন্যে। যার অসুখটা আমি—কী বলবো, ধরে নিন একটা চ্যালেঞ্জের মতো নিয়েছি। আপনি দয়ালু ব্যক্তি যতগুলিকে পেরেছেন, আপনার এই ক্ষুদ্র ঘরখানিতে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। দেখি কীভাবে তাদের উচ্ছেদ করা যায়।

পলাশ ক্লান্তিতে চোখ বোঁজে। তারপর বলে, সর্বদা ভাবি এতো পাওয়ার বোঝা বইবো কী করে? আর এতোটা বোঝা নিয়ে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হলে—

থামুন তো মশাই! চলে যেতে আপনাকে দিচ্ছে কে? ওটা যদি ভাবতে থাকেন তো বুঝতে হবে লড়াইয়ে আপনি আমার হারজিৎ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। বাজে চিন্তা ছেড়ে দিয়ে সর্বদা ভাবতে থাকুন, আপনি আমার বন্ধু। আমার 'জয়' চান।

*　　　*　　　*

রাতে বিছানায় গা এলিয়ে প্রমিতা ব্যঙ্গ হাসি হেসে বললো, ব্যাপারটা তাহলে বাল্যপ্রেম?

অদম্য একটু চমকালো।

এই দু দিনের অভিজ্ঞতা তো এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবার সংকেত দেয়নি। যতোটা যা দেখেছে, অথবা যখনি দেখেছে নীতুপিসি আর তাঁর ভাগ্নির

সঙ্গে বেশ খোলামেলা ভাবে হাসি গল্প করতে দেখেছে প্রমিতাকে। না 'গল্পটা' অবশ্য ওনারা মামী ভাগ্নিতেই করেছেন দেদার তবে হাসির অংশে তো প্রমিতাকে দেখেছে সব সময়ই।

বৈশাখীর তো কলকল্লোল।

অমুদার বিয়েতে আমি আসতে পাব না, এ কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। তো দিদিমা বুড়ি সেই মোক্ষম সময়টিতেই বেশি ভুগে পড়ে এমন বাদ সাধলো! ...'দুধের স্বাদ ঘোলে'র মতো ছোটমামীর কাছে বিয়ের গল্প শুনে শুনেই যতোটা যা। তা যাই বলো বাপু ছোটোমামী তোমার মুখের ওপরই বলি, বৌয়ের 'রূপের' বিবরণটি একটু চেপেচুপেই দিয়েছিলে। হবে না কেন? যতোই হোক 'শাউড়ি' তো! বৌয়ের রূপ গুণের কথা প্রাণ খুলে বলতে বাধে! না একখানা বৌয়ের মতো বৌ হয়েছে বটে এই বোস বাড়ির।

নীতু বলে উঠেছে, যাই না রেখে ঢেকে বলেছিলুম বলেই তো এখন এতো মোহিত হতে পেলি। সেই ভেবেই—

আহা! তা আর নয়। কে আমায় বৌ দেখাতে নিয়ে এসেছে শুনি? যাই ভাগ্যে বুড়ি শেষ পর্যন্ত সদ্বিবেচনা দেখালো মরে বন্ধনমুক্ত করল, আর আমিও আর কতদিন বসে মামাতো মামাদের অন্ন ধ্বংসাবো বলে মরিয়া হয়ে ঝুলে পড়ে চলে এলাম। তাই না ভাগ্যটা ফললো। তুমিই বলো বৌদি একদা বাধ্য হয়ে ঘাড় পেতেছে বলেই কি চিরকাল তাদের ঘাড় ভাঙতে হবে? স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করতে হবে না?

প্রমিতা নিরীহ গলায় বলেছে সে তো ঠিক।

বৈশাখীর আবার কলকল্লোল,—তা বিদ্যেয় তো মা সরস্বতী। চাকরি করতে চাইলেই তো আর মিলবে না। ভেবে দেখলাম পাঁচ সাত বছরকাল এক প্যারালিসিস আর হাঁপানি বুড়ির দ্যাখভাল করতে করতে রুগি সামলানোর বিদ্যেটা কিছু শেখা হয়ে গেছে। তাই বুড়ির শ্রাদ্ধে অমুদাকে পেয়ে ধরে পড়লাম, ডাক্তারবাবু যে করেই হোক একটা নার্স ফার্সের কাজ জুটিয়ে দিন না বাবা। তো তাই কি গা করছিল নাকি? শেষ পর্যন্ত আইন নিজের হাতেই তুলে নিতে হলো।

কথার স্রোত!

যেন জমানো জলের পাত্রটা গড়িয়ে পড়েছে।

কিন্তু প্রমিতার মুখে তখন তিক্ততার ছাপ দেখা যায়নি।

নীতু পিসি যখন বললো, সব কথাগুলো একঘণ্টায় শেষ করে ফেলবি? ভবিষ্যতের জন্যে রাখ কিছু!

' আর তার ভাগ্নি উত্তর দিলো ওমা! শোনো কথা? 'কথা' জিনিসটা কী একটা জমানো স্টক ছোটোমামী? তাই খরচ করলে ফুরিয়ে যাবে বলে মেপে জুপে খরচ করতে হবে? কথা নতুন করে গজায় না?...

তখন তো বেশ হেসেই ফেলেছিল প্রমিতা।

দালানের এ ধারের ঘরে দাড়ি কামাতে চোখে পড়েছিল অদম্যর ওদের ওই মহিলা মজলিশ!

কিন্তু এখন এ কী? এরজন্যে তো ঠিক প্রস্তুত ছিল না।

তবু অদম্য অদম্য সাহসেই বললো, তা ব্যাপরটা যখন বাল্যেরই তো তাই বলা যায়।

ও! তা বিয়েটা হলো না কেন?

প্রমিতা যে একদম সাধারণের মতো এমন সরাসরি প্রায় গ্রাম্যভাবে প্রশ্ন করে বসবে তা ভাবেনি অদম্য। তাও বিচলিত হলো না। হেসে বললো, সব 'প্রেম'-এর পরিণতিই কি 'বিয়েতে' এসে ঠ্যাকে? ঈশ্বর প্রেমও প্রেম, দেশপ্রেমও প্রেম, প্রকৃতি প্রেমও প্রেম, আবার জীবে প্রেমও প্রেম!

চালাকরা চিরদিনই কথার ফুলকি ছড়িয়ে আত্মরক্ষা করে। তো এটিকে বোধহয় 'জীবে প্রেম' বলেই চালাতে চাইবে? নাকি 'ঈশ্বরপ্রেম'? একদম স্বর্গীয় বস্তু। মহিলাটির ভাবভঙ্গি যা 'ইনোসেণ্ট।'

হ্যাঁ ও ওই রকমই। সব মানুষকেই আমাদের গড়া বাঁধা ধরা ছকে ফেলা যায় না। বাবা ওকে ভীষণ ভালোবাসতেন।

বাবার ছেলেও খুব কম নয়।

অদম্য সহজ গলায় বললো, তা সত্যি মিতা! মেয়েটাকে সত্যিই খুব ভালোবাসি। তুমিও দেখো, ভালো না বেসে থাকতে পারবে না। অদ্ভুত একটা সরলতা আছে ওর মধ্যে। আর বিশ্বাস।

পুরুষ জাতটাই তো 'রংকানা!' মেয়েদের কতটুকু বোঝে?

অদম্য মনে মনে একটু হাসলো।

তা' সত্যি কতটুকুই বা বোঝে? এই যে তুমি শ্রীমতী প্রমিতা দু'দিন ধরে কী আশ্চর্য নিখুঁৎ অভিনয় করে গেল! নীতুপিসি নিশ্চিন্ত হয়ে যাবার সময় বলে গেল, মেয়েটাকে নির্ভাবনায় রেখে গেলাম রে অমু! তোর বৌ খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে! ভালো মেয়েও। আত্মমর্যাদা বোধ আছে। এমন জায়গায় ভাবনা নেই!

সেই কথাটা মনে পড়লো অদম্যর।

একটু হেসে আস্তে বললো, তা পুরো জাতটাই যদি তাই হয়, আমি তার

ব্যতিক্রম হব কী করে ?

বিশ্বাস করি না। তুমি এমন বোকা নও যে, ওই মেয়ের মুখ চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝতে পারো না, ও তোমায় ভালোবেসে মরে যাচ্ছে ?

'মরে যাচ্ছে' এতোটা বুঝতে পারি না। আসলে ভাগ্যটা তো দুঃখের। পরের আশ্রয়ে মানুষ। যেখানে অবজ্ঞা অনাদরের চেহারাটা স্পষ্ট। তেমন দুঃখীরা কোথাও একটু স্নেহমমতা ভালো ব্যবহার পেলে কৃতার্থবোধ করে। যেমন তোমার কবি বন্ধু !

হঠাৎ প্রমিতার মুখটা বিদ্রূপে কুঁচকে ওঠে, তাহলে তো একটা প্রবলেম সলভ্ করতে পারো। দুজনেই যখন স্বজাতি ! আমাকে পীড়ন না করে তোমার ওই বাল্যপ্রেমকেই গিনিপিগ হিসেবে বেছে নাও না ?

অদম্য থতমত খেয়ে বলে, কী বললে ?

যা বললাম সেটা ধীরে সুস্থে বুঝো।

বলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে প্রমিতা।

*　　　*　　　*

বৈশাখী ! কী অদ্ভুত সুন্দর নাম !

পলাশ তার সেবিকার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলে, এর আগে এমন সুন্দর নাম আমি শুনিনি।

বৈশাখীর পরিচয় এখন সেবিকা। সেবিকাদের পক্ষে প্রগলভতা মানায় না। তবু স্বভাব কোথায় যাবে ? তাই বলে, এমা ! এমন কী নতুনত্ব দেখলেন ? নামের সঙ্গে জন্ম মাসটার ইতিহাসও ধরিয়ে দেওয়া তো কতোই হয়। শ্রাবণে জন্মালে 'শ্রাবণী' ফাল্গুনে জন্মালে 'ফাল্গুনী' চৈত্রে 'চৈতালী' বৈশাখে 'বৈশাখী।'

তা হবে। তবে 'বৈশাখী'টাই সব থেকে সুন্দর।

থেমে গিয়ে আবার বলে, 'যেন একটা উজ্জ্বল আলো আলো আর এলোমেলো হাওয়ার মতো।'

এসেই শুনেছিলাম আপনি কবি। এখন নিশ্চিত হলাম। কিন্তু এখন তো অকবির মতো একটা কাজ করতে হবে। পরপর দুটো ওষুধ খেতে হবে। আপত্তি টাপত্তি চলবে না।

ওষুধ খেতে তো আমি কোনোদিনই আপত্তি করি না।

তাহলে তো বলতে হয় 'গুড বয়'। বেশিদিন ভুগলেই তো পেশেন্টরা সবথেকে খাপপা হয় ওষুধের ওপর, এবং শেষ পর্যন্ত সেবা করিয়ের ওপর।

সারাজীবন ভুগলেও কেউ আপনার মতো কারো ওপর খাপ্পা হতে পারবে না।

ইস। দুদিনেই এতটা সার্টিফিকেট দিয়ে বসবেন না! স্বমূর্তি প্রকাশ করলে বুঝবেন ঠ্যালা!

শব্দ করেই হেসে ওঠে বৈশাখী। তারপর বলে, একটু স্থির হয়ে থাকুন, আপনার নোখগুলো কাটার দরকার হয়েছে। কি দারুণ হয়ে উঠেছে।

পলাশ প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে হাত দুটো চাদরের মধ্যে চালান দিয়ে বলে, না না! ও কিছু না। ব্রজদা দেবে অখন। নাহলে আমায় একটা ছোট কাঁচি বা নেলকাটার দিলে।

বৈশাখী একটু হেসে বলে, বাড়িতে ব্রজদাও ছিল, তবু তো প্রায় 'নখী' দন্তীদের একজন হয়ে উঠেছেন। এরপর বিছানা চাদর ছিঁড়ে বসবেন।··· একদম চুপচাপ থাকুন।···নড়বেন না!

বৈশাখী যখন কাঁচি সরিয়ে রেখে পলাশের হাড়সার আঙুলগুলোর ডগাগুলো ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছে দিচ্ছে পলাশ আস্তে বললো— আপনাকে কী বলে ডাকবো বলুন তো?

কেন 'নার্স' বলে!

নার্স! বিশ্রী!

তা আমার একটা নামও তো রয়েছে। যা শুনে অত প্রশংসা করলেন।

নাম ধরে? অসম্ভব।

একেবারে অসম্ভব?

হুঁ।

ঠিক আছে। সম্ভব মতো একটা কিছু আবিষ্কার করতে হবে। তবে ইচ্ছে করলে 'দিদি' বলতেও

দি-দি!

কেন? পছন্দ হচ্ছে না?

খুব। তবে লোকে শুনলে হাসবে।

হাসির কী হলো?

আপনি আমার থেকে বয়সে কতো ছোট।

'কতো' নয়। যৎসামান্যই। ওতে কিছু এসে যায় না। অথচ আমার অনেকখানিটা সুবিধে হয়ে যায়।

আপনার সুবিধ!

হ্যাঁ। আমাকে আর সারাক্ষণ 'আপনি আজ্ঞে বাবুমশাই' করতে হয় না।

স্রেফ নাম ধরে পলাশ !

হেসে উঠে তর্জনী উঁচিয়ে শাসনের ভঙ্গি করে বলে, পলা-শ ! ব্রেকফাস্টটা চটপট শেষ করে ফেলো ।···পলা-শ ! সব সময় শুয়ে থাকে না, উঠে বোসো। পলা-শ আমার সঙ্গে ওই বাগানের ধারের বারান্দায় বসবে চলো। এতো ঘরকুনো হয়ে থাকা ঠিক নয় । ···পলাশ। মেয়েদের মতো এতো চুল কেন ? এতো কবিয়ানা ভালো নয়। সেলুনে যাবার ক্ষমতা নেই ? ঠিক আছে আমিই কাঁচি চালিয়ে দুরস্ত করে দিচ্ছি !···

সব কথার খাঁজে খাঁজে হাসির আলো ছড়িয়ে পড়ে।

পলাশ একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, আপনার মতো একটি দিদিও যদি থাকত আমার !

ছিল না। এখন হয়েছে।

মনে হচ্ছে 'টু লেট।' সব কিছুই হারিয়ে গেছে।

কোনো কিছুই হারায়নি। আপনার বাদে স্বাস্থ্যটা। সেটাকে ফিরিয়ে আনার জন্যেই তো ডাক্তারবাবুর এত চেষ্টা !

ডাক্তারবাবু আপনার আত্মীয় হন ?

এ কথা আবার কে বললো ?

ব্রজদা বলছিল।

ব্রজদার কথা বাদ দিন।

ও !

ওনার তো সবাই আত্মীয় ! বিশ্বসুদ্ধই ও'র নিকট আত্মীয় পরমাত্মীয়। সে হিসেবে বলতে পারেন আত্মীয়। আপনাকেও তো উনি পরমাত্মীয়ের চোখে দেখেন।

পলাশের মুখটা দেখে মনে হলো উদ্ভাসিত হয়ে অনেক কিছু বলতে চায়, কিন্তু বোধহয় ক্ষমতায় কুলোল না। আস্তে বললো, তা ঠিক !

* * *

অদম্য ভয়ে ভয়ে কাটাচ্ছিল, হঠাৎ কখন বুঝি সুটকেস গুছিয়ে প্রমিতা বলে বসে, 'মার কাছে যাচ্ছি।'

কিন্তু তেমন ঘটনা ঘটলো না। প্রমিতা রয়ে গেছে।

সকালবেলা বাড়ির পুরনো গিন্নি ব্রজ এবং বাড়ির হেড বামুনমাসি এসে সবিনয়ে শুধোয় কী রান্না হবে ? কী বাজার হবে ? কী জলখাবার হবে ?

প্রমিতা অগ্রাহ্যের গলায় বলে, ওর আবার আমি কী বলব ? তোমারই তো বোঝো।

পিসিমা বলে গেছেন আপনাকে শুধোতে।

আপত্তি তো সেইখানেই। 'পিসিমা'র নির্দেশে প্রমিতার কর্তৃত্ব লাভ? অসহ্য সে নিজে যখন বুঝবে কি ভাবে অধিকারটা আয়ত্ব করা যায় তখন দেখা যাবে।

বললো, ঠিক আছে শুধানো তো হয়েছে।

হঠাৎ একদিন বলে উঠলো, তোমাদের নতুন দিদিমনিকে রান্নাঘরে রাঁধতে দেখলাম মনে হলো!

রান্না কিছু না। রুগির পথ্যিটা উনি নিজেই করে নেন।

ও! আচ্ছা যাও!

মনে মনে ভাবলো, খুব ধুরন্ধর মেয়ে বটে! দেখা যাক কতটা দৌড়! প্রমিতা ওকে সুবিধে দেবার জন্যে মাঠ খালি করে চলে যাচ্ছে না!

* * *

ভিজে তোয়ালের ওপর একটা ঢাকনি দেওয়া স্টেনলেস স্টিলের পাত্র করে গরম ঝোল টোল কিছু বসিয়ে নিয়ে সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল বৈশাখী। অদম্য সিঁড়ি উঠতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

এই যে শ্রীমতী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল! কাল থেকে দেখা হয়নি! আপনার পেশেণ্টের খবর কী?

খুব ভালো! মুখের রং ফিরে গেছে।

জানতাম!

কী জানতেন?

তোমার হাতে পড়লে, এক সপ্তাহেই মুখের রং ফিরে যাবে। দু সপ্তাহে চেহারা।

সার্টিফিকেটটা কাগজে লিখে দেবেন। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

নতুন চাকরিতে যোগ দিতে যাবার সময়?

তাছাড়া আর কি? পেশেণ্ট যখন চেহারা ফিরিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে, তখন আর নাইটিঙ্গেলের কী কাজ?

আমার নার্সিং হোমের বাড়ি উঠলো বলে।

ওঃ। তাই বুঝি? তবে আর চাকরি যাবার ভয় নেই কি বলেন? যাবজ্জীবনের মতো নিশ্চিন্দি। অ্যাঁ?

তুমি এত চমৎকার কথা বলো। যাক—পেশেণ্টকে তোমার কেমন লাগছে?

অতি উত্তম। এমন সরল আর বোকাটে ছেলে আজকাল আর দেখাই যায়

না ! ভারি ভালো লাগে।

তোমারও ভালো লাগে ? আমারও তাই। কিন্তু তুমি এমনভাবে কথা বলছ, যেন ছেলেটা তোমার থেকে কতো ছোটো ?

তা এক হিসেবে ছোটই ! আমায় ভীষণ ভাবে ভালোবেসে 'দিদি' ডাকছে ?

'দিদি' ডাকছে ?

ডাকছে তো !

চমৎকার ! আমার দারুন প্ল্যানটা একদম ভেস্তে দিলে।

ওমা ! এর মধ্যে আবার আপনার কী প্ল্যান ছিল।

ছিল। কিন্তু এখন আর বলে লাভ নেই। 'দিদি' ডাকটি বোধহয় তোমারই প্ররোচনা।

প্ররোচনা আবার কি ? বললো, 'কী বলে ডাকব আপনাকে ?' তো ওটাই মনে এলো।

আর কিছু মনে এলো না কেমন ? তোমার হাতে তো গরম ঝোল। যাও রাখো গে। ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে তোমার পেশেণ্ট নিয়ে একটু আলোচনা করব। তা আর হলো না।

আরে। হলো না কেন ? আমি এক্ষুণি আসছি। পলাশের তো এখনও খাবার টাইম হয়নি। কোথায় আসব বলুন ?

তুমি আর ওই 'আপনি' 'আজ্ঞেটা' ছাড়তে পারলে না।

এক্ষুণি পারি। যদি আপনি আমায় 'তুই' করে কথা বলতে শুরু করেন।

'তুই' করে।

বাঃ। একটু উঁচু নিচু ভেদ থাকবে না ?

ও। তাই থাকতে হয় বুঝি ?

নিশ্চয় ! কিন্তু আপনার কী প্ল্যান আমি ভেস্তে দিলাম সেটা না শুনতে পেলে তো রাতে ঘুম হবে না।

আচ্ছা বলব। তবে বলে কোনো লাভ হবে না। ভেস্তে যাওয়া প্ল্যান তো আর কাজে লাগবে না। আশ্চর্য ! সাত তাড়াতাড়ি ওর দিদি 'বনে' যাবার সাধ হলো !

ওমা ! তাতে কী দোষ হলো ? এটা নিয়ে এতো রাগ কিসের ?

তা তুমি বুঝবে না।

* * *

'চলে যাব' হয়ত 'চিরতরেই চলে যাব' এই সংকল্প করে সুটকেস গুছিয়েও

সেটাকে ঠেলে সরিয়ে রেখে গেছে প্রমিতা। আশ্চর্য, আর কিছুতেই যেতে পারছে না। যাওয়ার কথা ভাবতেও পারছে না। মনে হচ্ছে চলে গিয়ে ও যেন কোথাও কারো খুব সুবিধে করে দেবে। তবে? কেন তা দেবে প্রমিতা? অপরের সুবিধে করে দেয় বোকারা। প্রমিতা কি বোকা হবে?

সেই অবধি অবশ্য প্রমিতা পলাশকে আর দেখতে যায়নি লজ্জার মাথা খেয়ে। কিন্তু ওই বৈশাখীটা যে সর্বদা সেখানে, এটা ভেবে হাড় জ্বলে যাচ্ছে তার। একদিন অদম্যকে প্রশ্ন করে বসলো, তোমার নার্সের ক্যাপাসিটি কেমন?

প্রসঙ্গটা হাতে পেয়ে হাতে চাঁদ পেল অদম্য। বললো, দারুণ। মনে হচ্ছে পেশেন্টের চেহারা ফিরে গেছে।

এই ক'দিনেই। বলতে হবে ম্যাজিক। তা শুধু চেহারা ফিরলেই তো হবে না, সেরে উঠছে?

আশা করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

প্রমিতার হঠাৎ দেখতে ইচ্ছে করছে অদম্যর কথাটার মূল কোনো ভিত্তি আছে, না সেই মেয়েটার 'সেবা যত্নের' তারিফ করতে কথাটা বানিয়ে বললো, অসহ্য!

হঠাৎ একদিন দেখা গেল সেই ঘরটায় নেমে এসেছে প্রমিতা। পলাশ তখন সবে ভাত খেয়েছে। খেয়ে উঠে ঘুমোনো বারণ। তাই বালিশে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে বৈশাখীর নির্দেশে।

প্রমিতা দরজার বাইরে থেকেই দেখতে পেল দুজনকে। বোধহয় দুপুরের রোদের ঝাঁঝ বাঁচাতে বাগানের দিকের জানলায় মোটা কাপড়ের পর্দা। তবু পুবের জানলা দিয়ে যথেষ্ট আলো আসছে এই মস্তবড় খোলামেলা ঘরটায়।

প্রমিতা দেখতে পেল বৈশাখী বিছানার ধারে রাখা নিচু বেতের মোড়াটায় বসে বেশ সোচ্চার হাসির সঙ্গে কিছু কথা বলছে, আর পলাশ হাস্যোদ্ভাসিত মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

দেখে আপাদমস্তক জ্বলে গেল প্রমিতার। তার মুখ দেখে মনে হলো বৈশাখী নামের ওই উড়ে এসে জুড়ে বসা মেয়েটা যেন প্রমিতার একটা দামি জিনিস হাতিয়ে নিয়েছে!

এগিয়ে এসে নিজস্ব ভঙ্গিতে বলে উঠল কী রে ছন্নছাড়া কী খবর?

ঘরের দুজনই ওর আবির্ভাবে তটস্থ হয়ে উঠেছে।

বৌদি! আপনি।

বৈশাখী তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার টেনে এনে বিছানার ধারে রাখলো।

প্রমিতা দেখলো বিছানাটা প্রায় রাজকীয়। দুধসাদা চাদর তেমনি দুধসাদা দুটো ঝালরদার, মাথার বালিশ, পায়ের কাছে পাশবালিশ! যত্নের আর নিপুণতার ছাপ ঘরটার সর্বত্র। পারিপাট্যের চেহারা ভালো নার্সিং হোমের মতোই। এ দেখেও রাগ হলো। এত বাড়াবাড়ি কিসের।

পলাশের মুখের দিকে ও ভালো করে তাকিয়ে দেখলো।

এখন অবশ্য সে মুখ কৃতার্থমন্যের। অবস্থা বিগলিত এবং বিচলিতও।

চেয়ারটায় বসে পড়ে প্রমিতা চোখ তুলে সিলিং ফ্যানটার দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে বৈশাখী নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে পাখার রেগুলেটারটা ঠেলে দিয়ে ফুল ফোর্স করে দিল।

প্রতিমা বললো, খবর তো বেশ 'ভালো'ই মনে হচ্ছে। তোর ডাক্তারবাবুর মুখে শুনলাম তাঁর নতুন অ্যাপয়েণ্ট করা নার্সটি নাকি ম্যাজিসিয়ান।

ম্যাজিসিয়ান!

পলাশের মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। কিন্তু বৈশাখীর মুখে তেমন কোনো চিহ্ন ফোটে না। বরং যেন চাপা কৌতুকের একটা ভাব। অর্থাৎ কথাটার প্রয়োগের অর্থ তার বোঝা হয়ে গেছে।

প্রমিতা নিরীহ ভঙ্গিতে বললো, তাই তো শুনলাম। ক'দিনের নার্সিংএই নাকি তোর চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে। তা দেখছিও তাই।

পলাশ আবেগের গলায় বললো, সত্যি উনি যে কী যত্ন করেন!

ওমা। তা করবে না?

প্রমিতা একবার জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা বৈশাখীর দিকে কটাক্ষপাত করে বসে, ওটাই তো ও'র চাকরি!

পলাশ একটু আহত হয়। বুঝতে পারে প্রমিতা ইচ্ছে করেই বৈশাখীকে হেয় করতে চাইছে। তা এটা প্রমিতার নতুন নয়। ওর স্বভাবই তো ওই। বরাবরই দেখেছে অন্যকে 'ডাউন' করতে পারাই ওর আমোদ। পলাশ তো তা ভালোই জেনেছে। তবু আকর্ষণ! ওই অনিন্দ্য মুখশ্রী, ওই কপালের কাছে উড়ন্ত ঝুরো ঝুরো কিছু চুল, ওই সুঠাম সুগঠন অনবদ্য দেহখানি, ও থেকে যে চোখ ফিরিয়ে আনা যায় না।

তুমি এই দুপুরে রেস্ট-এর সময় সিঁড়ি নেমে এসে আমায় দেখতে এলে?

'রেস্টটা' কিসের? আমি কি কয়লা খাদের ফাঁসিল না ইঁট বইবার মজুরানি? তবে এসে মনে হচ্ছে তোদের ডিস্টার্ব করলাম।

পলাশ এর সেই রোগ। প্রমিতার ব্যাঙ্গ কৌতুকে মেশা দৃষ্টির সামনে বাকশক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলে। অথচ সাধ্যমত কত গল্প তো করে বৈশাখীর

সঙ্গে। ছেলেবেলার কথা, মায়ের অস্পষ্ট স্মৃতির কথা, স্কুলের এক দুর্দান্ত রাগী অথচ স্নেহশীল মাষ্টারমশাইয়ের কথা প্রমিতার সামনে কথা জড়িয়ে যায়।

কি আশ্চর্য! ডিসটার্ব কিসের? ইস!

ওমা! তা নয়? বেশ আড্ডা চলছিল।

বৈশাখী বোঝে গায়ে পড়ে এ অপমান করাটা ইচ্ছাকৃত।

কিন্তু গায়ে না মাখলে? কার সাধ্য অপমান করতে পারে? বৈশাখী মনে মনে বললো, যাদের 'মানের কানার' জায়গা থাকে না, তাদের পদ্মপত্রের মতো, হাঁসের পালকের মতো অথবা পাঁকাল মাছের মতো হতে হয়। সে হতে পাবার বিদ্যেটা আমার আবাল্য আয়ত্ত হে মহারানী।

তাই অনায়াস গলায় বললো, আর বেশিক্ষণ আড্ডা দেওয়া চলত না। এবার পেশেণ্টের 'বিশ্রাম ঘুমের সময় হয়ে এলো।'

আরে! আমি যে পেশেণ্ট ম্যাজিকের গুণে ভালো হয়ে গেছে শুনে পুরনো কালের অভ্যাসে একটু জমিয়ে আড্ডা দিতে এলাম! কি রে ছন্নছাড়া খুব ঘুম পাচ্ছে?

পলাশ থতমত খায়। বৈশাখীর মুখের দিকে একটু অসহায় দৃষ্টিতে তাকায়। সেখানে 'বরাভয়' না কাঠিন্য!

বোঝা যাচ্ছে না। নির্লিপ্ত নির্বিকার ভাব।

অতএব পলাশ বলে ফেলে ঘুম পাচ্ছে? এখন? কি যে বল!

বাকিটা অনুক্ত থাকে। সেটা হচ্ছে 'তুমি কাছে বসে থাকলে আমি সারাজীবন জেগে কাটাতে পারি।'

তোর নার্স কি পারমিশান দেবেন?

বৈশাখী একটু হেসে বলে, আপনার জন্যে স্পেশাল পারমিশান। পেশেণ্টের একটু এদিক ওদিক হলে তো ডাক্তারবাবু আছেন। আপনারাই নিজ জন। আচ্ছা তাহলে আপনারা দুই পুরনো বন্ধু গল্পটল্প করুন। এখন আর কোনো ওষুধ খাবার নেই। ফিরে যাবার সময় এই দিকের দরজার পর্দাটা টেনে দিয়ে যাবেন।

বাঃ। তুমি কোথায় যাচ্ছ?

বুঝতে পারছেন না? নার্স আয়াটায়াদের যা স্বভাব। একটু সুযোগ পেলেই ঘুম দেয়।

বোঝে বৈশাখী চলে গেলে আর দু'মিনিটও বসবে না প্রমিতা। সত্যি তো আর পুরনো প্রেম ঝালাতে আসেনি এসেছে এদের একটু জ্বালাতে।

পলাশেরও ওই একই ভয় হয়। বৈশাখী চলে গেলেই প্রমিতাও উঠে যাবে। তাই তাড়াতাড়ি বলে, বাঃ। তুমি সেইরকম না কি? না না তুমিও থাকো না। তিনজনেই—

প্রমিতা বলে ওঠে, কী হলো? মনে হচ্ছে খুব ভয় খেয়ে গেলি? নার্সকে খুব ভয় পাস বুঝি? শুনি যে শুয়ে শুয়েও কবিতা লিখে চলেছিস। গুড। এখন বোধহয় 'ফেন্নারেন্স নাইটিঙ্গেল' কে নিয়ে উচ্ছ্বাসের কাব্যিটাব্যি করছিস? দেখাস দু'একটা। ডক্টর বোসের হাতে দিলেও আমার কাছে পেঁছে যাবে।···যাক গে চলি। আমারই ঘুম পাচ্ছে। জ্বরটর আছে না কি আর?

বলে হাত বাড়িয়ে ওর কপালে আর গলায় একটু হাত ছুঁইয়ে বলে, ঠিকই তো আছিস। আচ্ছা।

একটা হাইতোলার ভান করে চলে যায় বৈশাখীর দিকে আর না তাকিয়ে।

বৈশাখী একটু হেসে পলাশের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার আর এখন ঘুমের আশা বৃথা কি বলো? চাও তো তোমার খাতা কলমটা কাছে রেখে দিয়ে যাই।

পলাশ আবেগের গলায় বলে, ও বরাবর ওই রকমই। তুমি কিছু মনে করো না দিদি—মানে ইয়ে

থাক থাক। তোমায় আর ও নিয়ে ভাবনা করতে হবে না। 'দিদি' অত পলকা নয়। কিন্তু তোমাদের কলেজ টলেজে তো শুনেছিলাম সহপাঠীরা সবাই সবাইকে 'তুই' বলে। কিন্তু তোমার দিক থেকে তো রেখেছি সসম্মান ভাব।

ওটা আমি পারি না। মেয়ে কি ছেলেদেরও 'তুই' করে কথা বলতে পারতাম না কখনও।

সেটা বুঝতে পারছি। ওই প্রেমের কবিতা লেখা ছাড়া তোমার দ্বারা আর কিছু হবে না। ঠিক আছে যাচ্ছি। আবার ঠিক চারটের সময় সেই ওষুধটি মনে আছে তো? আর সাড়ে ছটায় ইনজেকশান। শুয়ে পড়ো।

চলে গেল দরজার পর্দাটা টেনে দিয়ে।

শুয়ে অবশ্য পড়লো পলাশ। কিন্তু আজ আর ঘুমের সাধ্য নেই ওকে কবলিত করে। রক্তহীন শরীরেও রক্তের মধ্যে আলোড়ন উঠছে।···প্রমিতা ইচ্ছে করে জ্বর দেখার ছুতোয় ওকে একটু ছুঁয়ে গেল। সেই ছোঁওয়াটুকুই আমার মধ্যে শব্দের ঝড় তুলছে। খাতা কলমটা সত্যিই যদি রেখে যেত

দিদি। তাহলে শব্দটা এমন এলোমেলো হয়ে ছোটছুটি করত না, লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তো।

মনকে স্থির করে ওদের লাইন দেওয়াবার চেষ্টা করে।

এই হতভাগা শব্দগুলো! এতো এলোমেলো হচ্ছিস কেন তোরা? রেশনের দোকানের সামনের অপেক্ষারত মানুষগুলোকে দেখিসনি কখনও? কেমন পরপর দাঁড়িয়ে পড়ে।

জানি ও আমায় অপমান করতেই এসেছিল! আর কোনো উদ্দেশ্য নয়।
তবু তার মধ্যে থেকেই আমি পেয়ে গেছি একটুকরো সবুজ জমি।
ধু ধু মরুভূমির মধ্যে একটুকরো পরম প্রাপ্তি!
তুমি আমার জ্বর মাপতে চেয়ে আমার মধ্যে
হাজারটা মশাল জেবলে দিলে।
কিন্তু আমার কপাল ঠান্ডা।
তোমার হাতেই উষ্ণতা। কিন্তু সে উষ্ণতা কি
হৃদয়ের উত্তাপে? নাঃ। আমি জানি সেখানে
একছিটেও উত্তাপ নেই। রক্তহীন রোগীর
জ্বরশূন্য কপালের মতোই ঠান্ডা।
তবু তোমার ওই শুধু স্বাস্থ্যের উত্তাপে উষ্ণস্পর্শটুকু
আমার মধ্যে হাজার মশাল জেবলে দিল।
কারণ তার আগে তোমার চোখে এক ঝিলিক আগুন দেখছি।
ঈর্ষার আগুন!

বিকেল চারটে পর্যন্ত লাইনগুলোকে আটকে রাখতে হবে। খাতা কলমটা পাওয়া যাবে তখন।

ঘড়ি কি চলছে?

দিদি কি সত্যি ঘুমিয়ে পড়বে?

হঠাৎ মনে হলো প্রমিতা তো দিদির মতো হতে পারত। নাঃ। প্রমিতা প্রমিতার মতোই গর্বিত অহংকারী রাজেন্দ্রানীরূপে।

*　　　*　　　*

বৈশাখী এদের বাগানের এক জায়গায় গোটাকয়েক গোলাপ গাছ পুঁতেছে। চারা আনতে বেশি দূরে যেতে হয়নি, বাইরের দিকে 'অনন্ত ডাক্তারের' চেম্বারের সামনে যে খানিকটা জমি রয়েছে তাতে অনেক রকম ফুলের গাছ আছে। তার সঙ্গে বেশ কয়েকটা গোলাপ গাছও।

খুব যে একটা সাজানো গোছানো ফুলবাগান তা নয়, মাঝে মাঝে এক একটা গাছ। সবই দেশি ফুলের টগর কাঠচাঁপা বেল মল্লিকা এটা ওটা। জবাগাছই বেশি। যাকে অমর বৃক্ষ বলা যায়। ঘেরা পাঁচিলের ধারে ধারে শিউলি কামিনীফুল কৃষ্ণচুড়া আর কল্কে ফুলেরা। ওদেরই কাছাকাছি একদা ব্রজ কোথা থেকে গোলাপের চারা এনে লাগিয়েছিল। প্রথম প্রথম খুব যত্নও করেছিল, তবে এখন অযত্নেও জীবিত। সেখান থেকেই চারা তুলিয়ে এনে বৈশাখী এই ভিতরের দিকের তরকারির বাগানের মধ্যে চারটে গোলাপ পুঁতেছে। আপাতত এখন যত্নেরও খুব জোর।

এই দিকটা দোতালার ভিতর বারান্দা থেকে দেখা যায়। এই গেরস্হালী বাগানটার পরই ফলের বাগান। রীতিমত বড়সড়। যে বাগানে সেরা সেরা আম কাঠাল জাম জামরুল!

বৈশাখীও অবশ্য গ্রামের মেয়ে, গাছপালা তার কাছে নতুন নয়, তবে তার পরিচিত জনেদের মধ্যে ঠিক এমনটি কারো নেই। যাদের পৈত্রিক আমলের 'ফলের বাগান' ছিল তারা বেশিরভাগই 'জমা ধরিয়ে' দিয়েছে।

বলে, রেখে কী করব? পাড়ার বাঁদর ছেলেগুলো গাছের ফল গাছে পাকতে দেয়? কাঁচা কষুটে থেকেই নিধন করে। তার ওপর সত্যি হনুমানও আছে।

এখানে একটা বৃহতের ছাপ আছে।

ব্রজর অনর্গল গল্পের মধ্যে কানে এসেছে এখানেও ওই জমা ধরানোর ব্যাপার আছে। তবে নিজেদের জন্যে যথেষ্ট রেখে।

সে যাক এদের ফল নিয়ে মাথা ঘামায়নি বৈশাখী, তবে নিজের হাতে গোলাপ গাছ পুঁতে তাতে জল দেওয়া সার দেওয়ায় খুব একটা আহ্লাদ আছে।

ছোট একটা খুরপি নিয়ে গোলাপের গোড়াটা একটু খুঁড়ে দিচ্ছিলো, আর মাঝে মাঝে পলাশের ঘরের কোণের দিকের জানলাটার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। গতকাল ওই জানলাটা দিয়ে পলাশকে নিজের গাছ দেখিয়েছিল বৈশাখী, বলেছিল, এখন এতো দূর থেকে তেমন বুঝতে পারবে না, ফুল ফুটলে দেখবে।

পলাশ বলেছিল, ততদিন পর্যন্ত আমি থাকব?

তার আগে তোমায় ছাড়ছে কে?

ছেড়ে চলে যেতেও তো হতে পারে।

আবার ওইসব পাকা পাকা কথা?

পলাশ ম্লান হাসি হেসেছিল, যেতে কি আর ইচ্ছে? তবে মাঝে মাঝে হঠাৎ

ভেতরটা কি রকম যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে মনে হয় সব হাওয়া ফুরিয়ে যাচ্ছে।

ও কি নিজেই জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে?

না। পর্দাটা দুলছে।

জানলায় কেউ দাঁড়ায়নি পেছন থেকে একজন কথা বলে উঠল, এ কাজটা কাউকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া যায় না?

হাত ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো বৈশাখী।

ওমা! আপনি কখন এলেন?

অনেকক্ষণ।

য্যাঃ। অনেকক্ষণ এলে জানতে পারতাম না?

যা গভীর মনোযোগ। কী হচ্ছে?

এখানে চারটে গোলাপ চারা লাগিয়েছি।

অদম্য হেসে ফেলে বলে সামনে পিছনে মাচায় লাউ কুমড়ো এখানে ওখানে সীম বেগুন উচ্ছেরা এদের মধ্যে গোলাপ!

বৈশাখী হেসে উঠে বলে, সেইটাই তো ঠিক। গোলাপ বাগানে গোলাপ কে আর তাকিয়ে দেখে? এখানেই বরং আদর মান মর্যাদা!

মন্দ বলনি। পলাশকে কেমন দেখছ?

মাঝে মাঝে মনে হয়, বুঝি সেরে উঠছে, আবার মাঝে মাঝে কেমন ঝিমিয়ে যায়।

হুঁ। ওটাই অসুখ। বেচারার ভাগ্যটাই ওকে এভাবে—জানো দিনের পর দিন বাড়ির খাওয়া জোটেনি, খিদের সময় সস্তামার্কা রেস্তোরায় আরো সস্তা খাবার খেয়ে—অথচ তার মধ্যেই টিউশনি করে পড়া চালাতে হয়েছে।

বাড়ির অবস্থা বুঝি খুবই খারাপ?

অদম্য একটু হাসল, কৃপণরা অবস্থাকে সহজেই খুব খারাপ করে তুলতে পারে। তাছাড়া নাকি প্রায় প্রায়ই বাড়িতে কর্তা গিন্নির কলহে রান্নাটান্না হতো না। অসুখ করলে ঝামেলার ভয়ে বাড়িতে বলতো না। শরীর ধ্বংস হওয়ার কারণ অনেক। তবে সবথেকে বড় কারণ কি জানো বৈশাখী? একদম স্নেহহীনতার মধ্যে টিকে থাকতে বাধ্য হওয়া। স্নেহমমতা ভালোবাসা এগুলোই তো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। অতি দীন দরিদ্রের ঘরেও এ জিনিস দুর্লভ নয়। কিন্তু এ বেচারা জীবনে এর স্বাদই পায়নি বোধহয়।

বৈশাখী অদম্যর মুখের দিকে তাকালো। দীর্ঘোন্নত দেহ শক্তি আর সৌন্দর্যে গড়া। চওড়া কপালের টানটান চামড়ার ওপর গাছের ছায়া ভেদ

করে খানিকটা রোদ এসে পড়েছে। যেন একটা অপার্থিব দৃশ্য। তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছে করে।

এই মোহমুগ্ধতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বৈশাখী আস্তে বলে সকলের জীবনে কি-সে প্রাপ্তি মেলে ?

অদম্যও ওর দিকে তাকালো। বললো, হয়তো মেলে না। তবে সকলের মনের গড়ন তো এক নয় ? অনেকেই হয়তো ওই না পাওয়াটাকে ঝেড়ে ফেলে বেপরোয়ামির মধ্যে জীবনের স্বাদ খোঁজে। এই যে যেসব ছেলেকে আমরা 'সমাজবিরোধী' বলে ঘৃণা করি, তাদের মধ্যে হয়তো অনেকেরই এমন না পাওয়ার ইতিহাস আছে। তারা ঘৃণা আক্রোশ আর হিংস্রতা দিয়ে নিজেদের গড়ে তুলে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। কিন্তু যারা সে দলে নয়, তারা ভেঙে পড়ে। এই ছেলেটা সেই দলের একটা নমুনা। বৈশাখী তুমি ওর কবিতা টবিতা পড়েছ ?

বৈশাখী হাসলো, তা পড়েছি। বইটাই তো পড়েছি আধুনিক কবিতা আমি তেমন বুঝি না। তবে সবই প্রেমের কবিতা, তাই না ?

আমিই বা কতো বুঝি ? তবে পড়তে ভীষণ ভালো লাগে। প্রথম দিকে একদিন দেখি ওর বালিশের তলায় একটা পাটকরা কাগজ, খুলে খুলে পড়তে যাওয়ার সময় 'না না পড়বেন না ও কিছু না' বলে হাঁ হাঁ করলো। তারপর বললো, 'আচ্ছা পড়ুন।' তা পড়ে মনে হলো, কে যেন এক মিনিটের জন্যে এসে ওকে ধন্য করে দিয়ে গেছে, এই আর কি ! একে আর কিসের কবিতা বলা যায় ?

অদম্য বললো, ওর ভীষণ বাসনা ওকে কেউ ভালোবাসুক।

সে ইচ্ছে আর কার না হয় ?

তা ঠিক। কবে ইচ্ছের বাইরে তীব্রতার কম বেশি থাকে, তাই নয় কি ? কেউ ওই ইচ্ছে না মেটার অভাবে বিষণ্ণ হয়, কেউ বা বিচূর্ণ হয়। ও শেষের দলে। ওর প্রেমপাত্রী ওর দিকে একটু তাকালে ও ধন্য হয়ে যায়, কিন্তু বেচারি এমনই মন্দ ভাগ্য যে, সেই মহিয়সী ওকে মানুষ বলেই গণ্য করেন না।

বৈশাখী মৃদু হেসে বললো, আপনি সব বোঝেন ? ওই গণ্য না করাটা 'ছল'ও তো হতে পারে ?

নাঃ তা নয়।

অদম্য বৈশাখীর দিকে তাকিয়ে বলে তুমি অবশ্যই বোঝো মহিয়সীটি কে ?

বৈশাখী হেসে ফেলে।

বুঝবে না কেন? বোকা তো আর নও। তা মহিলাকে একদিন অনুরোধ করেছিলাম, সিনেমা টিনেমার গল্পটল্পের মতো, ওর সঙ্গে একটু প্রেমট্রেম অভিনয় করলে কি ক্ষতি? তাতে হয়তো একটা লোক মরতে বসে বেঁচে উঠতে পারে অথবা শেষ সময় একটা পরিতৃপ্ত নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারে।·· তা শুনে কি খেপচুরিয়াস। ও তালাক দিয়ে চলে যায় আর কি!

আপনি বড্ড বানাচ্ছেন। উনি মেটেই এরকম না।

অদম্য হাসলো, উনি যে 'কী রকম' তা তুমি তো কোন ছার, স্বয়ং ওঁর সৃষ্টিকর্তাও জানেন কিনা সন্দেহ।···আচ্ছা কি এমন দোষ হতো তাতে? লোকটা তো তাকে পাগলের মতো ভালোবাসে। তার সঙ্গে একটু অভিনয় করলে কি এসে যায়? আসলে তো একটা মৃত্যুপথযাত্রী রোগী। তাকে একটু খুশি দিতে—এটুকু করা যায় না? ওর তো কোনোভাবেই কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। শুধু কৃতার্থ হবে। বলো এটুকু করা যায় না?

বৈশাখী আবারও হাসলো।

বলল, রোগীর চিকিৎসা হিসেবে হয়তো করা যায়।

অদম্য রাগের মতো গলা বার করে বলে ওঠে এই তো। ভেবেছিলাম দ্বিতীয় চেষ্টা করে দেখবো। তো তুমি বলা কওয়া নেই ওকে দিয়ে 'দিদি' ডাকিয়ে নিলে।

বৈশাখী ভিতরে একটু চমকে গেলেও সহজ হয়ে গিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে ওঠে, মাইগড! এটাই বুঝি আপনার সেই প্ল্যান? হায় হায়! গোলাপের জায়গায় ঘেঁটু! আমের জায়গায় আমড়া!

অদম্য গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললো, কে গোলাপ কে ঘেঁটু সে কি নিজেই বোঝে?

বুদ্ধি থাকলে বোঝে।

বুদ্ধির অহঙ্কারটা ঠিক নয় বুঝলে?

বুঝলাম।

বৈশাখী বলে ওঠে, কিন্তু বুঝতে পারছি না আপনার আজ এত 'সময়' কি বাবদ?

কোনো বাবদটাবদ নয়। দৈবাৎই আজ—তবে একটু পরে কলকাতায় ছুটতে হবে।

ও। আপনার সেই মেডিক্যাল কলেজ ? সপ্তাহে দুদিন তাই না ? শনি আর মঙ্গল।

আরে বাস ? মুখস্থ হয়ে গেছে ?

ওটুকু মুখস্থ হতে বেশি কিছু স্মৃতিশক্তির দরকার হয় না।

তোমাদের বৌদি কিন্তু এখনো মুখস্থ করে উঠতে পারেনি। বললে রেগে ওঠে।

ওটা রাগ নয় অমুদা। অনুরাগ। আপনি এতক্ষণের জন্যে চলে যাবেন ! মন খারাপ লাগে না ?

বলি তো সঙ্গে চল। তোমাকে তোমার মা-বাবার ওখানে নামিয়ে দিয়ে চলে যাব, আবার ফেরার সময় তুলে আনব। তাতে ঘোরতর আপত্তি।

কথাটা সত্যি।

অদম্যর এই প্রস্তাবে প্রমিতা অতি বিরক্তির সঙ্গে আপত্তি জানিয়েছিল।

কোন দরকার নেই।

না মানে সপ্তাহে দু দুটোদিন এতক্ষণ একা থাকা—

ওঃ ! একা। ডাক্তার বোস সবসময় আমার কাছে বসে থেকে ভূতের ভয় থেকে বাঁচান। তাই না ?

আমি কি বলেছি ভূতের ভয়ের জন্যে ?

কি জন্যে বলেছ তা আমাকে বোঝাতে হবে না। তবে যদি তোমার অ্যাবসেন্টে আমাকে ও বাড়ি ছাড়া করতে পারলে কারো সুবিধে হয় তো যাব।

এরপর আর কি বলবার থাকে ?

কিন্তু বৈশাখী কথাটা শুনে চোখ কপালে তুললো। ওমা ! মেয়েমানুষের বাপেরবা ড় যেতে আপত্তি ! অদ্ভুত।

থাকতে থাকতে বুঝবে মহিলাটির আরো কতো কিছু অদ্ভুত ! আমি যে খাঁটি বাংলায় কথা বলি সহজে ইংরেজি শব্দ মিশেল করি না, এতে খুব বিরক্তি। আমি টাই ব্যাভার করতে আলস্যবোধ করি এতে দারুণ খাপ্পা !

সত্যিই খাপ্পা হয় প্রমিতা। এতে না কি অদম্যর 'ভেতো'মি প্রকাশ পায়।

যখন তখনই বলে, একটা বিদেশ ঘুরে আসা ডাক্তার যে কী করে এমন 'ভেতো 'বাঙালিয়ানায়' আনন্দ পায় আমার বুদ্ধির বাইরে।

কিছুদিন হলো অদম্য পি. জি. র. অর্থোপেডিক ডিপার্টমেন্টে, যুক্ত রয়েছে। সপ্তাহে দুদিন যেতে হয়। তবে ক্রমেই যে আরো কোনো হাসপাতাল বা নার্সিং হোমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়তে হবে সে সংকেত আসছে।

প্রস্তাব অনুরোধ।···নিজে থেকে আবেদনের প্রশ্ন ছিল না, তবুও।

'বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন, গন্ধ তার লুকাবে কোথায়।'

ডক্টর বোসের সুন্দর চেহারা অতি সুন্দর ব্যবহার, আর 'অপারেশনের হাত' এখনি অনেককে আকৃষ্ট করেছে।

যদিও—এখানে অদম্যার পরিকল্পিত নার্সিং হোমের ভিৎ গাঁথা সাঙ্গ, দেয়াল উঠছে।

প্রমিতার এসব কিছুই ভালো লাগে না। প্রমিতার নিজের কল্পনায় জীবনের যে ছক আঁকা ছিল, তার সঙ্গে জীবনের মিল নেই।

তার মানে 'প্রাচুর্য ঐশ্বর্য স্বাচ্ছন্দ সুবিধে' এসবই গৌণ, মুখ্য হচ্ছে নিজস্ব ছকটি। যেটা মেয়েজাতটার নিজের হাতে বড় একটা থাকে না। তবু জীবনের পার্টনারটিকে হাতের মুঠোয় পুরে ফেলে কব্জা করতে পারলে যাও বা কিছু হয় সেখানে অক্ষমতায় তো সে গুড়েও বালি। এইখানেই তো প্রমিতার রাগ অপমানবোধ বিরক্তি। এই লোককে দেখলে মনে হয় অতি সহজ, নেহাৎ নমনীয়, কিন্তু মুঠোয় চাপতে গেলেই দেখা যায় পিছলে যাচ্ছে! এতে প্রমিতাকে নিজের কাছেই 'ছোটো' হয়ে যেতে হচ্ছে।···

বান্ধবীদের কাছেও আর ঘনঘন যেতে ইচ্ছে করে না। বিয়ের পরই তাদের কাছে প্রমিতার 'লাক' সম্পর্কে যে ধন্য ধন্য ধ্বনি শোনা গিয়েছিল, সেটা ক্রমেই ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে। প্রমিতার 'লাক' এর মূলে যে তার রূপটিও, এ প্রমাণও এখন পুরানো হয়ে গেছে। এখন দেখা হলেই প্রশ্ন 'এমা! এখনো তুই সেই 'উত্তরপাড়ায়' পড়ে আছিস। বরটাকে কায়দা করে ফেলতে পারিসনি?'···লোকটা আচ্ছা কট্টর তো 'পিতৃভিটে' 'পিতৃস্মৃতি' এইসব বুকে নিয়ে বসে রয়েছে।

এসব শুনতে কার ভালো লাগে?

প্রমিতার তাই আর পুরনো দলে গিয়ে সুখ হয় না। তাছাড়া আরও একটা কারণ হয়তো অবচেতনে কাজ করছে। বাড়িছাড়া হলেই কারো যেন খুব একটা 'সুবিধে' হয়ে যাবে। এটা হতে দেওয়া যায় না।

* * *

হঠাৎ একদিন পলাশের কাকা এলেন। আবার এলেন একেবারে সস্ত্রীক। অপরাধের ভারে নুয়ে পড়ার ভঙ্গিতে ডাক্তারের কাছে বক্তব্য রাখলেন।

আসতে পারছি না। একা মানুষ, নানা কাজ। ছেলেটাকে সেই দেখে গিয়েছি—অথচ সারাক্ষণ ওর চিন্তাতেই কাটছে। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন ছেলে, আমাদের কাছেই মানুষ। ওর কাকি তো আমাকে পাগল করছে ছেলেটাকে

একবার দেখবার জন্যে। তা ওই তো বললাম দোষ আমারই। তবে আপনার কাছে যা সেবা যত্ন চিকিৎসা দেখে গেছি বাবা, তাতে বড়ই নিশ্চিন্ত আছি বলেই—তা আছে কেমন এখন।

অনেকটা ভালো। গিয়ে দেখে বুঝুন। আসলে শরীরে অনেক রকম অসুখ জন্মে যাওয়ায়—

কাকি মাথার আঁচল একটু টেনে বিগলিত দুঃখের গলায় বলেন, নিজের দোষেই এতসব রোগ পাকিয়েছে। রাতদিন বাইরে। রাতদিন টোটো করে বেড়ানো। রোদ জলে গ্রাহ্য নেই। নইলে মা-বাবামরা ছেলেটাকে সাধ্যের অতিরিক্ত করেছি। নিজেদের তো ছেলে নেই, মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে, সব যত্ন আদর তো ওই ছেলেবেই। তবু এমন আশ্চয্যি রোগ? শরীরে রক্ত তৈরি হয় না! শুনিওনি কখনো।

অদম্য বললো, ওটা তো একটা অসুখই। তবে তার সঙ্গে গ্যাস্ট্রিক আলসার গলব্লাডার লো প্রেসার অনেক কিছু।

তলে তলে কখন এসব বাধিয়েছে কে জানে! বলে না তো কিছু। ভারি ভেতর গোঁজা ছেলে। কখনো মন খোলে না। তা ভাগ্যক্রমে তোমার মতন এমন একটি মহৎ মানুষের হাতে এসে পড়ায়—তোমার দয়াতেই—

দয়াটয়া এসব কি বলছেন। যে কোনো ডাক্তারেরই এরকম ক্ষেত্রে এটাই কর্তব্য। আমার বাড়িতে বেড়াতে এসে হঠাৎ জ্বরটর হয়ে যাওয়া– চলুন দেখবেন।

কাকা পলাশের হাত ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, কতদিনে ভালো হয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবি বাবা? শূন্য বাড়িতে তো টিকতে পারা যাচ্ছে না।

পলাশ বিছানা ছেড়ে একটা সোফায় বসেছিল তখন। কাকা সেই সোফায় গা ঘেঁষে বসে বলেন, না না, তা বলে আমি তোকে এক্ষুণি যাবার কথা বলছি না বাবা। যে মহৎ আশ্রয়ে এসে পড়েছিস, তার অমর্যাদা করিস না সম্পূর্ণ সেরে উঠলে তবেই! শুনলাম নাকি কি একটা অপারেশনের দরকার আছে। তা সে উনিই বুঝবেন। আমরা শুধু দিন গুনবো কবে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবে।

পলাশ প্রায় হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তার চির পরিচিত আর বর্তমানে ভয়ানক অপরিচিত এই কাকাটির দিকে।

কাকি অবশ্য পলাশের সঙ্গে বেশি কথা বলেন না, তিনি তার 'নার্স'টিকে নিয়ে পড়েছিলেন। এবং অতঃপর ঠেলে দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে দোতলায়

উঠে বাড়ির গৃহিণীর সঙ্গেও আলাপ করার চেষ্টা করেছিলেন। (যার জন্যে তাঁর আসা) তবে চেষ্টাটা খুব বেশি সফল হয়নি।

এমন কি 'ডাক্তারবাবুর বাড়িটা একটু দেখি'—বলে ছুতো করে রান্নাঘর ভাঁড়ারের দরজা পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলেন। কিন্তু কাজের লোকজনেরাও তেমন পাত্তা দেয়নি। কাজেই তুচ্ছ ওই মিনমিনে পলাশটাকে নিয়ে ডাক্তারের এতো মাতামাতির রহস্যটা ঠিক অনুধাবন করতে পারেননি কাকি।

শুধু উনি চলে যাবার পর বৈশাখী পলাশকে বলেছে, তোমার কাকির বাবা বুঝি উকিল ছিলেন? উকিলের মেয়ে না হলে, এত কূটকচালে জেরা করতে শেখে কেউ?

ফেরার সময় ঠাসাগোঁজ হয়ে বাসের একটা কোণের সিটে বসে আঁচল থেকে পান বার করে মুখে দিয়ে কাকি বলেন, তোমার ভাইপোটিকে যতো মিনমিনে ভাবো তা নয় বুঝলে? কেমন একখানা 'ভাব ভালোবাসা' করে রেখেছে দেখলে তো? ধুরন্ধর ছেলে। তো এখনকার ছেলেগুলোকে বলিহারি বাবা। বৌয়ের মনোরঞ্জন করতে তার প্রেমিককে মাথায় তুলে নাচানাচি, রাজসুয়ো চিকিৎসা। রোগ যদি তিল প্রমাণ হয়েছে তো ডাক্তার তাকে 'তাল প্রমাণ' বলে প্রচার করে ঘটা করছে। বৌদের কেনা গোলাম এখনকার ছেলেরা। তবে আমার পোড়াভাগ্যে জামাইগুলো মোটেই তেমন নয়। সেই আদ্যিকাল্যের মতন মাতৃভক্ত সুবোধ ছেলে।

...তো ওই নার্স ছুঁড়িটাকে দেখলে? বেটাছেলে রুগির আবার মেয়েছেলে নার্স কি জন্যে? তাও হাসপাতালের ঢালাও ব্যাপার নয়, একখানা ঘরের মধ্যে একটা মাত্তর রুগি নিয়ে গুজ গুজ ফুসফুস।...ওই ডাক্তারটা লোক সুবিধে বলে মনে হচ্ছে না আমার।...একখানা সুন্দরী তরুণী নার্স জোটানোর উদ্দেশ্য?

মেয়েটাকে তো পলাশ 'দিদি' ডাকছিল।

আরে রাখোতো তোমার দিদি ডাকা। ওসব হচ্ছে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা। বুঝলে? 'দিদি' 'বৌদি' এসব তো রসের ডাক! কতোই দেখলাম জগতে!

কাকা একটু ঘোড়েল হাসি হেসে বলেন, তো আমাদের কোনো লোকসান নেই? ওই বেকার বাউন্ডুলে তাল পাতার সিং ভাইপোটিকে নিয়ে আমার কোন স্বর্গলাভ? ডাক্তার যদি ওর পরিবারের প্রাণ ঠাণ্ডা করতে তার লাভারকে জিইয়ে তুলে বাড়িতে পুষে রাখতে চায়, আমার কী?

কাকি বাসের জানলা দিয়ে রাস্তায় পানের পিচ ফেলে বলেন, দ্যাখো। এ কালের ছেলেদের কাছে 'বৌকে ভালোবাসা' কাকে বলে শেখো।

এখন শিখতে হবে ?

আজ মুড্ ভালো। তাই কাকা কাঁচাপাকা গোফের ফাঁকে মুচকে হেসে বলেন, আছে নাকি তোমার কেউ ?

গলায় দড়ি।

তবে আর শিখে কী হবে। তা যাক ওরা চায়ের সঙ্গে যা জলখাবার খাইয়েছে আজ আর তোমার ওবেলা রান্না না করলেও চলবে।

অ। তাই এতো আহ্লাদ। বেঁচে গেল একবেলার খোরাকি কেমন ? কঞ্জুসের হাড় !

বলেন, তবে মধুর হাসির সঙ্গে।···মন হাল্কা।

একটা মস্ত কর্তব্য সারা হলো। এবং জানা গেল হঠাৎ এক্ষুণি সেই রোগীটা ঘাড়ে এসে পড়বার ভয় নেই। যে রকম বড় গাছে নৌকো বেঁধেছে তাতে আর এসে কাকার সংসারে ঢুকবে বলে মনে হয় না।

*　　*　　*　　*

ক'দিন পরে মনোবীণা এলেন।

তুই তো যাওয়া টাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস। এক একবার চোখে না দেখে থাকতে পারা যায় না। যাস না কেন আর ? শরীর ঠিক আছে তো ?

কেন থাকবে না ?

ওমা ঠিকরে উঠছিস কেন ? শরীরে এদিক ওদিক হতে পারে না ? বিয়েও তো হয়েছে বছর ঘুরলো !

তোমাদের ওইসব পচা হিসেব শুনলে আমার মাথা জ্বলে যায়।

এই রকম সুরে (না বোধহয় আরো চড়া সুরে) বরকে বলেছিল প্রমিতা, তোমার ওইসব পচা সাধ এর কথা শুনলে আমার মাথা জ্বলে যায়। তুমি না একটা ডাক্তার ? এক্ষুণি এ রকম সাধ করতে লজ্জা করে না ?

অদম্য অবশ্য দমেনি। হেসে বলেছিল, লজ্জা জিনিসটা যে আমার মধ্যে খুব কম, সেটা এতদিনেও টের পাওনি ?

বলেই টপ করে প্রমিতার হালকা ছিপছিপে শরীরটাকে তুলে নিয়ে একপাক ঘুরিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল।

মা ভয় খেয়ে প্রসঙ্গ পালটালো, তোর বাপকে এতো করে বললাম চলো দুজনে যাই। বললো, বাড়িতে কে থাকবে ? ওই খুকি কাজের মেয়েটার হাতে একা ফেলে রেখে যাওয়া সেফ নয়। ছুতো ! আর কিছু না। তা আছিস কেমন ?

খুব ভালো।

'ভালো' আর 'খুব ভালো'য় যে আকাশ পাতাল তফাৎ তা বুঝতে অসুবিধে হয় না মনোবীণার। একটু বেজার গলায় বলেন, ভালো থাকলেই ভালো। তো ওই মেয়েটা কি এখানেই গেড়ে বসলো?

বসবার জন্যেই তো এসেছে।

তোদের সংসারটা একটা আজব কারখানা বাবা! সেই রাঁধুনি বুড়ি, সেই ব্রজ। ওদের আয় ক্ষয় লয় নেই?

না থাকলেই ভালো।

প্রমিতা বলে, ক্রমেই বুঝছি ওরা না থাকলে আমারই যথেষ্ট অসুবিধে। আমি কিছুই জানি না কিছুই পারি না।

আহা তুই শিখে যেতিস-।

লাভ কী?

বলে প্রমিতা একটু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে।

বাঃ। তোর সংসারে তুই বুঝে পড়ে নিবি এর আর লাভালাভ কি?

না। বুঝে দেখলাম আসলে ওই তেল নুন লকড়ির হিসেব টিসেব আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওসবের দিকে তাকালেই আমার গায়ে জ্বর আসে।

মা মনে মনে বলে, তোমাদের যে কখন কি রূপ মা! বোঝা দায়। এই তুমিই একদিন কতো আক্ষেপ করেছো।

মুখে তাড়াতাড়ি বলেন, যাই বলিস বাপু তোর শরীরটা খুব ভালো নেই। চেহারাও যেন খারাপ হয়ে গেছে। তা হ্যাঁরে সেই পলাশের খবর কী?

ভালোই।

সেরে উঠছে?

শুনি তো উঠছে। আবার শুনি একটা অপারেশনের দরকার।

প্রমিতার সব কথাতেই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি।

মনোবীণা বিরক্তির গলায় বলেন, কোথাকার আপদ কোথায়! একেই বোধহয় বলে পূর্বজন্মের ঋণ শোধ। তো জামাই কোথায়? দেখলাম না তো।

রাত বারোটার সময় এলে দেখলেও দেখতে পারো।

কি জানি বাবা। একটা স্পেশালিস্ট যে এভাবে জেনারেল প্র্যাকটিস ক'রে শক্তি ক্ষয় করে!

এসব কথা প্রমিতাও বলে। কিন্তু এখন মায়ের মুখে এইসব বিরক্তিকর আলোচনা অসহ্য লাগছে। ওর হঠাৎ মনে হয়, মায়ের এতক্ষণ থাকবারই বা দরকার কি ?

আজকাল যেন কিছুই আর ভালো লাগে না।

আগে আগে তো কলকাতাটা ভালো লাগতো, ভালো লাগতো মা বাবাকে। বন্ধু-বান্ধব আড্ডা সিনেমা ফাংশান মার্কেটিং। সবই নতুনত্ব হারিয়েছে। মনের মধ্যে অহরহ কিসের যেন একটা জ্বালা। তিষ্ঠোতে দেয় না কোনোখানে। যখন তখন ইচ্ছে হয় নিচের তলায় নেমে গিয়ে দেখে আসি 'আমার জিনিসটা'কে ওই বাচাল বেহায়া মেয়েটা কি ভাবে গ্রাস করে নিচ্ছে! ওই সাংঘাতিক মেয়েটা প্রমিতার সর্বস্ব নিয়ে ছাড়বে না কি ? প্রমিতার স্বামী, প্রমিতার প্রেমিক। প্রমিতার সংসারের দাস দাসী সবাই ওর নামে অজ্ঞান। ...ওঃ। ওকে আমি কী করে তাড়াব ?

কিন্তু তাড়াবার জন্যে আলাদা চেষ্টার কি আছে ? প্রমিতা যদি পুরোমাত্রায় নিজের আধিপত্য আর প্রভাব বিস্তার করে, সেই স্রোতে ও খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে না ?

প্রথম জ্বালা ধরেছিল সেই একদিন ওই বুড়ি রাঁধুনির কথায়। প্রমিতা কলকাতা থেকে ফিরেছে সেটা বোধহয় জানা ছিল না ওদের। তাই স্বচ্ছন্দ গলায় বলেছিল কর্তাবাবু অমন আচমকা চলে না গেলে কি আজ তোমার এই ভাগ্য হয় মা! কোথায় তুমিই হবে এখানের সর্বেশ্বরী, তা নয় পোড়াছাই রুগির নার্স হয়ে দাসত্ব করতে হচ্ছে। ওই পাজিটা অবিশ্যি স্বভাব মতো হিহি করে হেসে বলে উঠেছিল আমি স্বেচ্ছায় না এলে কে আমায় দাসত্ব করাতে পারতো বামুনমাসি ? মনে করো এটা আমার শখের খেয়াল।

হঠাৎ দুজনেই চুপ করে গিয়েছিল। বোধহয় প্রমিতার আসা টের পেয়েছিল ...তদবধি এই জ্বালাটা যেন প্রমিতাকে অনির্বাণ দাহর মধ্যে রেখে দিয়েছে।...তারমানে সত্যি দুঃখী অভাগা নয়। খেয়ালের খেলায় দেখতে এসেছে প্রমিতাকে হঠাতে পারে কিনা। আচ্ছা প্রমিতাও দেখবে—

প্রমিতার মধ্যে তাই জ্বালার চাষ।

কিন্তু প্রমিতাকেই বা দোষ দেওয়া যায় কী করে ?

তার জানাশোনা বান্ধবীদের কার জীবনে বিয়ে হতে হতেই এমন অদ্ভুত পরিস্থিতি ঘটছে ? অনেকেরই একবারে 'মুক্তজীবন'। বিয়ে হয়েই বরের সঙ্গে আকাশে উড়ে যাওয়া, ট্রেনে চেপে বসে, অথবা নতুন ফ্ল্যাটের নতুন সংসারে বাবার দেওয়া দানসামগ্রীর ফার্নিচার সাজিয়ে সুখে সংসার করা। যাদের

তেমন নয় অসুবিধের মধ্যে হয়তো শ্বশুর শাশুড়ি ননদ টনদ কতকগুলো হাবিজাবি লোকের উপস্থিতি। সেটা এমন কিছু ব্যাপার নয় সহজেই ম্যানেজ করে ফেলা যায়। হয় তাদের ছাঁটো নয় নিজেরা কাটো।

এইতো প্রমিতার মামাতো বোনের বিয়ে হলো কিছুদিন আগে। বিয়ের আটদিনের মধ্যেই বরের সঙ্গে গৌহাটিতে চলে গেল মহারাণীর মতো।

নাঃ প্রমিতার সঙ্গে কারো জীবনের পরিবেশের মিল নেই। অতএব প্রমিতার যদি সবসময় একটা 'কিছু ভাল না লাগা' ভাব অস্থির করে জ্বালা ধরায়, দোষ দেওয়া যায় না তাকে।

* * *

হঠাৎ হঠাৎ নিচের তলায় চলে আসছে প্রমিতা, পলাশের কাছে এসে বসে পড়ছে। খুব সহৃদয় গলায় জিগ্যেস করছে কেমন আছিস রে পলাশ? আমি বেশি আসি না বলে আমায় খুব হার্টলেস ভাবিস তো? আসলে আমি কারো অসুখের কষ্ট টষ্ট দেখতে পারি না।

হঠাৎ এখন এই পলাশ নামের লোকটার আবেগ বিহ্বল ভালোবাসাটি প্রমিতার খুব মূল্যবান বলে মনে হচ্ছে। এটা 'আর কারো ভাঁড়ারে গিয়ে উঠবে' এমন আশঙ্কায় অস্থিরতা আসছে। সেটা সামলাতে হবে।

অনেকটা যেন হিংসুটে শিশুর মনোভাব। যে শিশুটা নিজের ভাঙা পুরনো ফেলে দেওয়া বাতিল খেলনাটায় আর কোনো শিশু হাত দিলে আমার জিনিস নিচ্ছে বলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে হাত মুচড়ে কেড়ে নেয় সেটা।

পলাশ তার। পলাশ আর কারো দিকে ভালোবাসার চোখে তাকাবে এ অসহ্য। সেই আর কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবে 'আমি কে' আর 'তুমি কে'?

আচ্ছা পলাশ তোর বি এম ডি কে মনে পড়ে? সেই মেয়েমার্কা ন্যাকা প্রফেসরটিকে? তোর তো আরোই মনে থাকবার কথা। তোর মতই ন্যাকামার্কা ছিল। একদিন তাঁর ক্লাসে বন্দনাকে নিয়ে কী মজা করা হয়েছিল মনে আছে?···আচ্ছা পলাশ আমাদের সেই সেবারের সোশ্যালের শকুন্তলা নাটক নামানো তোর মনে আছে নিশ্চয়। বারীন আগে যোগ দিতে রাজি হয়নি। তোকে 'শারদ্বত' আর মৃগাঙ্ককে শার্ঙ্গরব-এর রোলটা দেবার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে বারীন বললো, 'আমি আসছি তোদের দলে।' বাস। সঙ্গে সঙ্গে তোকে 'ছাঁটাই।' তোর সে কি অভিমান। আমরা তো ভেবেছিলাম তুই ফাংশানের দিন আসবি না। ওমা ঠিক এসেছিলি। কি বলেছিলি মনে আছে? হি হি···বলেছিলি না 'তুমি শকুন্তলা সাজছো!' না এসে থাকা গেল না। আর সেই পিকনিকের দিন? বোটানিকসে?

তুই ভ্যাবলা হয়ে একা কোথায় বসে কাব্যি করছিস, কেউ খেয়াল করেনি। খাবার সময় ডাকেনি। তুই এসে দেখলি মাংসর ডেকচি ফর্সা। খিচুড়ির হাঁড়ি সাফ। ওঃ সকলের কি হাসি। শেষে দেবযানী রেগে বললো, একটা লোক খেতে পেল না, আর তোমাদের হাসি? শেষে মিষ্টি টিষ্টি এনে তোকে জোর করে খাওয়ালো। আমারও সত্যি খুব খারাপ লেগেছিল রে। আসলে তুই রাগ করতে জানিস না বলেই—

প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ। যে প্রসঙ্গের মধ্যে ওই বৈশাখী নামের মেয়েটার নাক গলাবার কোনো উপায় নেই। আর এমন ভাবে কথা বলে যাচ্ছে প্রমিতা যেন ঘরে এই দুই একদার সহপাঠী ছাড়া আর কেউ নেই।

পলাশ হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে ওই বিদ্যুৎ বিকশিত মুখটার দিকে। এ কোন প্রমিতা? কবে প্রমিতা পলাশ নামের ছেলেটার সঙ্গে এমন আড্ডার গলায় অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলেছে?···পলাশের সম্পর্কে এতো সব কথা মনে গাঁথা ছিল প্রমিতার?

কথা বলতে বলতে পলাশের চুলে হাত বুলোয় প্রমিতা। কখনো বা ওর আঙুল গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে বলে, ইস! আঙুলগুলো কি হয়েছে রে? স্রেফ লোহার সাঁড়াশি।

পলাশ বুঝতে পারে না এ কি লীলা। অথবা পারে? তবু মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে তাকিয়ে থাকে।

আর প্রমিতা উঠে যাবার পর কেমন অপরাধী অপরাধী ভাবে চুপ করে শুয়ে থাকে।···প্রমিতা যে বৈশাখীর দিকে ফিরেও তাকায় না, চলে যাবার সময়ও একটা কথা বলে যায় না, এটা যেন পলাশেরই লজ্জা!

আচ্ছা কেন এমন করে প্রমিতা? সামান্য একটু সৌজন্য প্রকাশে এতো কি ক্ষতি? আবার ভাবে এটাই তো প্রমিতার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। ইচ্ছা হলেই কাউকে ইচ্ছা করে অগ্রাহ্য ভাব দেখায়। ইচ্ছে করে অসৌজন্য প্রকাশ করে।

লজ্জা করে, বৈশাখীর দিকে তাকাতে পারে না, বৈশাখী যতক্ষণ না এসে ডেকে কথা বলে, ততক্ষণ কথা বলতে পারে না।·· তবু চোখের সামনে বারে বারেই ভেসে ওঠে, বিশেষ একটি ভ্রূভঙ্গি, হাসিতে ভেঙে পড়া একটা মুহূর্ত, কপালের ওপর ঝুরো চুলগুলোর নাচানাচি।···আর যেন মদের মতো পান করতে থাকে প্রমিতার গায়ের বিশেষ তীব্রগন্ধী পারফিউমের সৌরভে আচ্ছন্ন ঘরে ছড়িয়ে থাকা বাতাসটা।

পলাশের বিছানাতেও সেই সৌরভ সারের তীব্রস্মৃতি।

পলাশ কি এতে সুখের স্বাদ পায় ?

না কেমন একটা ভয় আর অস্বস্তি যেন ঘিরে থাকে।

এ কি ? এ কেন ?

বৈশাখী কি ওই পলাশ নামের ছেলেটার হৃদয়ভারের ভাব অনুভব করে ?

বোধহয় করে। তাই প্রমিতা চলে যাবার পর পলাশকে ধাতস্থ হতে খানিকটা সময় দিয়ে অতঃপর কাছে এসে বলে, বাবাঃ। ডাক্তারগিন্নির মর্জি বোঝা দায় ! কখনো মুখে তালাচাবি আবার কখনো ফোয়ারা। তোমাকে তো ফোয়ারার তোড়ে ভাসিয়ে দিয়েছিল একেবারে। হঠাৎ পুরনো বন্ধুর সঙ্গে পুরনো কথা আলোচনা করতে বসলে এই রকমই হয় বটে। স্মৃতির সিন্ধুকটা ভারি সর্বনেশে জিনিস। একবার তার ডালাটা খুলে ফেললে আর রক্ষে নেই। নাও এখন ওষুধ খাও। এই ফলের রসটসগুলো খেয়ে নাও। টাইম পেরিয়ে গেল।...

খাদ্যবস্তুগুলো গোছাতে গোছাতে বলে মুস্কিল এই ডাক্তারের নির্দেশের ধার না ধেরে রোজ তোমার এই রেস্টের সময়টাতেই এসে হাজির হবেন। রেস্টের বারোটা বেজে যায়।

পলাশ কুণ্ঠিত ভাবে বলে, আপনি একটু মনে করিয়ে দিলে ভালো হতো। মানে—

আমি ? মনে করিয়ে ? পাগল ! উনি বাড়ির গিন্নি, ডাক্তার গিন্নি, ওঁর জ্ঞান দিতে যাব আমি ? আর দিলেই কি শুনবেন ? হয়তো রাগের চোটে আরো বাড়াবেন। আমি কে, আর উনি কে তা ভাবো ? বারণ করিয়ে দিতে গেলে যদি সেকথাটি মনে করিয়ে দেন ? আমার অবিশ্যি মন অভিমানের বালাই নেই, তবে বলে কোনো লাভ হতো না। মাঝখান থেকে তোমারই অস্বস্তি বেড়ে যেত। আসলে 'স্মৃতি' বড় ভয়ানক জিনিস। একবার যদি তার সিন্দুকের ডালা খুলে বসো রক্ষে থাকবে না। সবাই বেরিয়ে আসতে চাইবে। তাছাড়া ইস্কুল কলেজের জীবন বলে কথা। তার স্বাদই আলাদা।

এমন ভাব দেখায় বৈশাখী, যেন প্রমিতার এই অনর্গল কথা বলে যাওয়াটা তার স্মৃতির সিন্দুকের ডালা খুলে যাওয়া বলে বিশ্বাস করছে সে।

পলাশ তাতে একটু স্বস্তি বোধ করে।

এই রকম আলোচনার মধ্যে একদিন হঠাৎ অদম্য এসে ঢুকলো। পি জি থেকে ফিরেছে একমাত্র। দোতলায় উঠে যাবার আগে তার পোষ্য রোগীটিকে একবার দেখে যেতে আসে। কিন্তু ঢুকেই বলে ওঠে মহারাণী এসেছিলেন বুঝি ?

বৈশাখী হেসে ফেলে বলে, কে খবর দিল ?

খবর দিলে তাঁর অঙ্গসৌরভ ! বাপস। কি যে একখানা সেণ্ট মাখে ! আমি বলি, তোমার কখনো কোন সময় আত্মগোপনের উপায় নেই। তোমার এই অঙ্গসৌরভই তোমায় ধরিয়ে দেবে। তা হঠাৎ এত দয়া ? পলাশবাবু আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলেন ?

বৈশাখী বলে, কিছুকাল ধরে বোধহয় একই লোকের মুখ দেখে উঠছে। তিনি তো রোজই আসেন। সারা দুপুর কলেজের গল্পটল্প করেন।

গুড।

অদম্য বলে, ভদ্রমহিলা তাহলে একটু সামাজিক হতে শিখেছেন। আমি তো মাঝে মাঝেই বকি, তোমারই বন্ধু অথচ তুমি একটু দেখতে টেখতে যাও না। তা তোমার পেশেণ্ট তো তাহলে বেশ ভালোই আছে। এইবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়বেন কবিতার খাতা ভরাতে। নিয়মিত বিশল্যকরণী পড়ছে যখন।

অমুদা !

বৈশাখী হঠাৎ যে কেন এই নামে ডেকে ফেললো। অবিরতই তো 'ডাক্তারবাবু' নামটা রপ্ত করছে।

অদম্য চকিত হয়ে বলে, কি বলো।

বলছিলাম আজ কটা অপারেশন করে এলেন ?

গোটাকয়েক। হঠাৎ এ প্রশ্ন ?

সবাইয়েরই হাড় ভাঙা ?

ভাঙা, ক্ষয়া, পচে যাওয়া কত কি ! একটা মেয়েকে দেখে এত খারাপ লাগলো। বেচারি কলেজ টলেজ কোথাও যাচ্ছিল, পায়ের ওপর দিয়ে কিনা সামান্য একটা সাইকেলের চাকা চলে গিয়ে পায়ের পাতার হাড়টাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। তাছাড়া এক ভদ্রলোক গাড়ি অ্যাকসিডেণ্টে—আসলে সারাক্ষণই তো মানুষের আকস্মিক দুর্ঘটনার মুখোমুখি হবার জন্যে প্রস্তুত থাকা। এক ভদ্রমহিলা তো বাথরুমে আছাড় খেয়ে হাঁটুকে ছাতু বানিয়ে ফেলে কান্নাকাটি করছেন, ক'দিন পরে আমার মেয়ের বিয়ে—

দেখে দেখে খুব খারাপ লাগে ! তাই না ?

অদম্য হাসলো।

যখন দেখি, তখন তো আর পুরো মানুষটাকে দেখি না। দেখতে পাই না-ই বলতে পারো। দেখি শুধু ওই ভাঙা ফাটা পচে যাওয়া হাড়টা। যেখানে ছুরি বসাতে হবে।

কি কাণ্ড। অমুদা। আমিও যদি হঠাৎ পড়ে গিয়ে কোনোখানের হাড় ছাতু করে বসি, আপনি ছুরি ধরে ওই ভাঙা হাড়টাকেই দেখতে পাবেন? আমায় নয়?

কেন? আছাড় খেয়ে হাড় ভাঙবার শখ হচ্ছে?

ভাবছি 'ছুরি হাতে আপনি' এ দৃশ্যটা কেমন দেখতে লাগবে।

দেখবার অকেশান পাবে না। 'আপনজনের' ওপর ছুরি বসানো ডাক্তারি শাস্ত্রে নিষেধ! 'বিশেষ' আপনজন হলে তো কথাই নেই। কাজেই কোথাও সাবান জল ঢেলে পা পিছলোলে লাভ হবে না কিছু বুঝলে হে বালিকা?

চলে যায় হাসতে হাসতে।

পলাশ বৈশাখীর ফেরানো মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে। গালের ওপর কি জলের রেখা?

কেন? কি এমন বলে গেলেন ডাক্তার? যা বললেন সে তো হাসতে হাসতে।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বৈশাখী বলে ওঠে, ডাক্তারবাবুকে তোমার কি মনে হয় বলো তো পলাশ? খুব হৃদয়বান, না একদম হৃদয়হীন?

হৃদয়হীন? কী বলছেন আপনি? কী করে বলতে পারলেন?

বৈশাখী বললো, হঠাৎ মনে হলো। মনে হলো যারা মানুষের শরীরে ছুরি বসাতে পারে তাদের 'হৃদয়টা' হৃদয় থেকে বাদ দিয়ে ফেলতে হয়।

পলাশ একটু উত্তেজিত ভাবে বলে, ছুরিটা তো মারবার জন্যে বসানো হয় না, হয় বাঁচাবার জন্যে।

বাঁচাবার জন্যে! তা বটে! এই রে তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়ে গেল যে।

*   *   *

কিন্তু বৈশাখী নামের নিতান্ত সাধারণ উচ্চশিক্ষা বিহীন বলতে গেলে মুখ্যু মেয়েটা, সেও তো তার হৃদয় থেকে হৃদয়কে নির্বাসন দিয়ে রাখবার কৌশলটা আয়ত্ত করে রেখেছে। না হলে ভিতরে যখন তুমুল ঝড়ের দাপাদাপি বাইরেটাকে তখন কি আশ্চর্য রকম শান্ত রাখতে পারে।

অনেক রাত্রে অন্ধকার শয্যায় আবার সেই ঝড়ের উন্মোচন।

'আপনজনের' ওপর ছুরি চালানো ডাক্তারি শাস্ত্রে নিষেধ। বিশেষ আপনজনের ওপর তো নয়ই।

আপনজন মানে কী? সমাজ স্বীকৃত আত্মীয়? বৈশাখী কি এ সংসারে তেমন সম্পর্কের শ্রেণীতে পড়ে? তবে? আপজন মানে কি তবে প্রিয়জন? ...সাবানজল ঢেলে আছাড় খাওয়ার কৌতুকটা কেন মুখে এলো ওঁর? উনি

কি বুঝতে পেরেছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে বৈশাখী একটা আছাড় খাওয়ার দৃশ্য কল্পনা করছিল।

ডাক্তারবাবু?

বৈশাখী অদম্যর টেবিলের ধারে এসে দাঁড়ালো।

অদম্য প্রায় উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে বললো, আরে তুমি এখানে চলে এসেছ?

বৈশাখী ঘরটার গায়ে একবার চোখ বোলালো।

রোগী দেখবারই ঘর, তবে এখন রোগীর আবির্ভাবের সময় নয় অদম্যর বাড়ির ভিতরে চলে যাবার কথা। তবু রয়েছে এখন এখানে। সদ্য রেজিস্ট্রি পার্সেলে আসা একটা মেডিক্যাল জার্নাল পড়ছিল। এখন এখানটা বেশ নিরিবিলি লাগছিল ওর।

বৈশাখী বললো, নার্সের যদি ছুটির আর্জি করতে হয় ডাক্তারবাবুর কাছেই তো আসতে হবে?

অদম্য বৈশাখীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো। হাতের পত্রিকাটা মুড়ে রাখলো। তারপর একটু হাসির মতো মুখ করে বললো, হঠাৎ ছুটির আর্জি?

এমনি। বেশি নয় দুদিনের জন্যে।

অদম্য বললো, কিন্তু সিস্টার! নার্স তো একটি ভিন্ন দুটি নেই আমার। তোমার পেশেণ্ট জলে পড়ে যাবে না?

ওই ঈষৎ কৌতুকের হাসিভরা মুখটার দিকে শুধু তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছে হয়। শুধু চেয়ে বসে থাকা।·· তা ইচ্ছেটা তো আর কাজে পরিণত করা যায় না। কারই বা তেমন হয়?

বললো, এখন তো উনি অনেক ভালো হয়ে গেছেন। বাগানে ঘোরাঘুরি করতে পারছেন। বেশিবার ওষুধেরও দরকার নেই। দুদিন ব্রজদাই চালিয়ে নিতে পারবে। তাছাড়া—

কী হলো? তাছাড়া কী?

তাছাড়া বৌদিও তো এখন অনেক সময় এসে কাছে বসেন টসেন।

তাই বুঝি? আমি সেদিন ভেবেছিলাম ক্ষণিকের খেয়াল।···তবে—

বাঃ। আপনার আবার কি হলো? 'তবে' বলে থেমে গেলেন।

অদম্য তেমনি কৌতুকের গলায় বললো, তবে একটা বাজার চালু কথা আছে জানো তো? জানো নিশ্চয়। 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ। ক্ষণে হাতে 'দড়ি' ক্ষণেকে চাঁদ।'

মোটেই তা নয়। রোজই তো আসেন। অনেকক্ষণ গল্প করেন।

মহারাণীর খেয়াল।...তবে ওনার খেয়ালটি তোমার পেশেণ্টের বিশেষ উপকার করে বলে মনে হয় না। ওনার সময় তো দুপুরে? রোগীর রেস্টের সময়।

ডাক্তার সাহেব। 'পেশেণ্ট' ডাক্তারেরই জিনিস নার্সের নয়।

কিন্তু পেশেণ্ট যদি সিস্টারকে একটুক্ষণ না দেখতে পেলেই চক্ষে আঁধার দেখে?

বৈশাখীর কপাল কুঁচকে ওঠে।

এ ধরণের কথা বলার অর্থটা কী?

বললো, আপনার কথাটা ঠিক বুঝলাম না অদম্যদা।

না বোঝবার কী আছে! কবি তো 'দিদি' বলতে অজ্ঞান। 'দিদি' তো ভগিনী আর' 'ভগিনী' মানেই 'সিস্টার'। নাকি নয়?

সে কথা বলছি না। অজ্ঞান বললেন! সেটাতেই আপত্তি। ওটা আপনার ভুল ধারণা।

ডাক্তারের চোখ সহজে ভুল করে না।

সে তো শরীরের ব্যাপারে।

মনের ব্যাপারেও বৈশাখী। মনকে উড়িয়ে দিয়ে শুধু শরীরের চিকিৎসা? নেহাৎ বুদ্ধু ডাক্তারের কাজ। বুদ্ধিমান ডাক্তারের নয়। কবি তোমায় কী পরিমাণ ভালোবাসে সেটা কি তুমি টের পাও না বৈশাখী?

অদম্য টেবিলের ওপর একটু ঝুঁকে গভীর স্বরে কথাটা বলে।

কিন্তু বৈশাখী হঠাৎ সোজা হয়ে বসে। স্থিরভাবে বলে 'ভালোবাসা' জিনিসটাকে দেখতে পান আপনি?

অদম্য তার দীর্ঘ উজ্জ্বল চোখের উজ্জ্বল আলো বৈশাখীর চোখ-এর উপর ফেলে। যে চোখ-এর দৃষ্টি ফটোর মধ্যে থেকেই একদা প্রমিতা নামের মেয়েটাকে আকৃষ্ট করেছিল। আর বৈশাখী? সে তো সেই কবে কতোদিন আগে। ওই চোখের অধিকারী সেই সদ্য কিশোর ছেলেটা বলে উঠেছিলো, 'ও নীতুপিসি। তোমার শ্বশুরবাড়ির এই মেয়েটা এতো লাজুক কেন গো? পেয়ারা দিচ্ছি নিচ্ছে না।'

সেই চোখ।

যে চোখ কথা কয়।

বললো, 'পাই' এ কথা বলার মুখ অবশ্য আর নেই এখন। কিন্তু তুমি তো পাও?

বৈশাখী বললো, সব ভালোবাসাই কি একজাতের ?

অদম্য একটু হাসলো, ভালোবাসা তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করতে বসলে হয়তো অনেক 'শ্রেণী' আবিষ্কার করা যাবে। তবে একটা জায়গায় সমান। সব ভালোবাসারই ধর্ম এক। সে ধর্ম তার প্রিয়জনের কল্যাণ কামনা। আর তাকে খুশি করার প্রেরণা। বলো সত্যি নয় কিনা ? তোমার ওই নানান জাতের ভালোবাসাকে ছাঁকনিতে ফেলে ছাঁকো। দেখবে কে তার প্রিয়জনকে খুশি করতে না চায় ? কে না চায় তার শুভ।

মানলাম। তারপর ? আপনার বক্তব্যটা তাহলে কী হচ্ছে ? ছুটি মিলবে না ?

অদম্য তেমনি গাঢ় গভীর স্বরে বললো, সে উত্তর দেবার আগে জানতে চাই বৈশাখী 'ছুটির' ইচ্ছে কেন ? খুব ক্লান্ত হয়ে গেছ ? অবশ্য হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ক্লান্তিটা নিছক শারীরিক না মানসিক সেটাই জানতে ইচ্ছে করছে।

মনটন বড় গোলমেলে জিনিস অদম্যদা। ওটা বাদ দিন। ধরুন শারীরিকই। দুদিন মামারবাড়ির আদর খেয়ে আসতে ইচ্ছে করছে। ছোটোমামীকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।

ঠিক আছে। আর্জি মঞ্জুর। তবে এই মহামুহূর্তে যদি আমিও একটা আর্জি করে বসি ? মঞ্জুর হবে ?

সেই চোখ। যা কথা হয়ে ওঠে।

বৈশাখী একটু কেঁপে উঠে বলে, বলুন।

আর্জিটা না শুনেই মঞ্জুর করতে পারবে ?

বৈশাখী মনে মনে বললো, তুমিই জানো কী সেই আর্জি। তবু এও নিশ্চয় জানো তোমাকে কোনো কিছুতেই না করতে পারা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় কারণ আমি তো জানি কোনো অসঙ্গত প্রস্তাবই তোমার কাছ থেকে আসবে না।

মুখে বললো, বোধহয় পারবো।

কিন্তু বৈশাখী কি কল্পনা করতে পেরেছিল তার এই বিশ্বাস মুহূর্তে ভেঙে পড়বে ? এমন অদ্ভুত একটা প্রস্তাব করে বসবে অদম্য যা 'অসঙ্গত'র কোঠা ছাড়িয়ে অবাস্তব-এ গিয়ে পৌঁছতে পারে ?

তোমার পেশেন্টের ও 'দিদি' ডাকটা ছাড়াতে হবে। দিদিগিরি ফলানো বন্ধ করেতে হবে তোমায়।

কী আশ্চর্য। হঠাৎ এ একটা কী আর্জি ?

সবটা বলা হয়নি বৈশাখী।···শুনে রেগে উঠে আমাকে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দেবে কিনা ভেবে ভয় পাচ্ছি।

বৈশাখীর মুখটা ভয়ার্ত দেখায়।

কী সব যাতা বলতে শুরু করলেন? বুঝতে পারছি না।

আচ্ছা তাহলে খুব প্রাঞ্জল করেই বলি। বৈশাখী, তোমার ওই ছেলেটার দিদিগিরি করাটা একটা বাজে ব্যাপার। ওকে তোমায় ভালোবাসতে হবে। ···রোসো উত্তেজিত হয়ো না সবটা বলতে দাও। ওকে তোমায় আসল জাতের 'ভালোবাসাটি' দিতে হবে। ওর ভালোবাসার স্বীকৃতি দিতে হবে।···এই আমার আর্জি।

অদম্যদা।

বৈশাখীর মুখটা লাল হয়ে ওঠে। বুকটা ঘন ঘন ওঠাপড়া করে। অদম্যদা আমি বুঝতে পারছি না আপনি এখন খুব স্বাভাবিক অবস্থায় আছেন কিনা। কী বলতে চান সেটা বলতে পারছেন কিনা।—আমার ভয় করছে।

অদম্য একটু হেসে ওঠে। প্রায় শব্দ করেই।

কী? ভাবছ ডাক্তারটা নেশাফেশা করে বসে ভুলভাল বলছে? নাঃ। সে ভয় করো না। খুব সাদা চোখে আছি।

আবার একটু গম্ভীর হয়।

বৈশাখী। ওই ছেলেটা, বলতে পারো আমার একটা চ্যালেঞ্জ অথবা একটা এক্সপেরিমেণ্ট। হঠাৎ একটা অদ্ভুত পরিবেশে আমি ওর ভার হাতে নিয়ে বসে, সংকল্প করেছিলাম সর্বশক্তি নিয়োগ করে একে সারিয়ে তুলবই। হয়ত কারণ কিছুই ছিল না। হয়ত সংকল্পটা আকস্মিকই। কিন্তু সেই অবধি চালিয়ে চলেছি। আর সত্যি বলতে কি ছেলেটাকে এতো ভালোবেসে ফেলেছি, প্রায় প্রেমে পড়ার মতোই। ওকে স্টাডি করে দেখে চলেছি। দেখছি ছেলেটা ওই জিনিসটারই যাকে বলে 'কাঙাল'। কিন্তু এই গোঁফ কামানো হলেও একটা 'গুঁপো' লোকের প্রেম আর ওর কতোটুকু কী করতে পারবে বলো?

বৈশাখী রুদ্ধকণ্ঠে বলে, যা পেরেছে তার হিসেব আছে? ওকে আপনি নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে তুলেছেন। সবই তো শুনেছি—

হ্যাঁ সবই শুনেছে বৈশাখী। সব ইতিহাসই জেনেছে যে রাজকীয় চিকিৎসা ওর ভাগ্যে জুটেছে, তা কি আর কোথাও সম্ভব ছিল? –যে লোকটার রোগের কারণই হচ্ছে অযত্ন অবহেলা অর্ধাহার অখাদ্য আহার, তার ভাগ্যে—

অদম্য বললো, বাঁচিয়ে তুলেছি' এত বড় অহঙ্কার কোনো ডাক্তারই করতে

পারে না বৈশাখী। তবে হ্যাঁ বেঁচে উঠেছে। আমাকে জিতিয়ে দিয়েছে। এর জন্যে ওর ওপর আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই বৈশাখী। ছেলেটা সত্যি বড় অনেস্ট আর সরল। কিন্তু বাঁচিয়ে তোলাটাই তো শেষ কথা নয়, বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বটাও তো বেশি জরুরি। ওকে সেই বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বটা আমি তোমার ওপর চাপাতে চাইছি বৈশাখী।···এখন ওর আর বিশেষ কোনো চিকিৎসার দরকার নেই। অবশ্য সামান্য একটু অপারেশনের কাজ রয়েছে। সেটা এমন কিছু না। শরীরটা একটু চাঙ্গা হওয়ার অপেক্ষায় আছি।—কিন্তু এখন ওর প্রধান চিকিৎসা মমতা স্নেহ ভালবাসা। যে ভালোবাসা তোমার শ্রেণী বিচারে 'প্রেম' বলে গণ্য! তোমার কাছে সেটাই প্রার্থনা।

বৈশাখীর মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে।

লালচে মুখে সেই কাঠিন্য ধরা পড়ে বেশি। হাতের মুঠিটাও যেন শক্ত দেখায়।

অদম্যদা। নিষ্ঠুরতাও একটা সীমা থাকা উচিত নয়কি?

কিন্তু অদম্য কী এ ধিক্কারে দমে?

দমে না।

খুব আত্মস্থ গলায় বলে, ডাক্তারদের নিষ্ঠুরতার সীমা থাকে না বৈশাখী। তারা অনায়াসে মানুষের হৃৎপিণ্ডে, ছুরি বসায় চোখের মণিতে। অতি সহজে একটা জলজ্যান্ত মানুষের একখানা বাড়তি কিডনি উপড়ে নিয়ে ট্রান্সফার করে বসিয়ে দেয় অপর একটা কিডনি ধ্বংস হয়ে যাওয়া শরীরে। আরো কতো নিষ্ঠুরতার নিদর্শন আছে তার সীমা পরিসীমা নেই।

বৈশাখী তীব্র তীক্ষ্ণ উত্তেজিত গলায় বলে, নেই। তাই মানুষকে তার 'এক্সপেরিমেণ্টের গিনিপিগ' ভাবতে বাধে না। কিন্তু—দোহাই আপনার। স্বেচ্ছায় গিনিপিগ হবার ক্ষমতা আমার নেই। কিডনি ট্রান্সফারের মতোই 'হৃদয়'টাকেও ট্রান্সফার করা সম্ভব? এ বিশ্বাসও আমার নেই। আপনার ভালোবাসার পেশেণ্টের জন্যে 'প্রেম' খুঁজে বেড়াতে যাচ্ছেন কেন? ··সে জিনিস তো আপনার নিজের ঘরেই মজুত আছে।···

বড় বেশি উত্তেজিত হয়ে গেছে বৈশাখী, বড় বেশি বিচলিত।···তাই এমন লাগামছাড়া কথা বলে ফেলতে পারলো। অদম্যর সঙ্গে তার মর্যাদার পার্থক্য ভুলে বসলো।

কিন্তু অদম্য তো ওর এতখানি ঔদ্ধত্যে বিচলিত হলো না। বেশ অবিচলিত ভাবেই বললো, হা ঈশ্বর। সে নিশ্চিন্ততা থাকলে কী আর থাপ্পড় খাওয়ার ভয় ত্যাগ করেও তোমার দ্বারস্থ হই হে বৈশাখী?···'রাৎতার

পুতুল' কী চিরকাল 'সোনার বিগ্রহের' অভাব মেটাতে পারে ?···আর ওই কবিটির কাব্যের প্রেরণাটি তো একটি পাথরপ্রতিমা।···তার মধ্যে 'হৃদয়' জিনিসটা আছে কিনা সন্দেহ।···

হঠাৎ বৈশাখীর টেবিলের এপর রাখা হাতটার ওপর একটা হাত রাখে অদম্য।···আর নিজের প্রেম নিবেদনের ভঙ্গিতে প্রায় আবেগের গলায় বলে, ও যে তোমায় কত ভালোবাসে তা কী সত্যিই বুঝতে পারো না বৈশাখী ? তার কী কোনো মূল্য নেই ?

হঠাৎ বৈশাখী ভেঙে পড়ে সেই হাত চেপে ধরা হাতটার ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে কেঁদে ফেলে।···কোনোখানে কোনো মূল্য নেই কেমন ? আমায় ছেড়ে দিন। আমায় ছুটি দিন। আমি আর পারছি না।

সমস্ত শরীরটা উথলাতে থাকে ওর কান্নার আবেগে।

অদম্য ওকে একটুক্ষণ কাঁদতে দেয়।

হয়তো গভীর ভালোবাসায় সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গির ইচ্ছাটিকে দমন করতে নিজেও একটু সময় নেয়। তারপর বৈশাখীর ছড়িয়ে পড়া চুলের ওপর আলতো একটু ছোঁওয়া দিয়ে বলে, মূল্য না থাকলে কী আর নির্লজ্জের মতো এমন একটা নিষ্ঠুর নির্দেশ দিতে পারতাম বৈশাখী ? জগতের আর কার ওপর এই ইচ্ছের জোর খাটাতে পারতাম বলো ? তুমি ছাড়া আর কে আমার জুলুম সইতে আসবে ? তবু—মনে হচ্ছে বোধহয় বড় বেশি দাবি করা হয়ে গেছে। ঘটা করে ক্ষমা চাইব না,···কান্নাটা থামাও লক্ষ্মীটি। নিজেকে বড্ড অপরাধী আর পাষণ্ড মনে হচ্ছে। আচ্ছা ছুটি মঞ্জুর। তোমার যখন ইচ্ছে হবে বলো, যাবার ব্যবস্থা করে দেব।

*   *   *   *

পড়ন্ত বিকেল।

বাগানে আস্তে আস্তে পায়চারি করছিল সেই হতভাগ্য অথবা অতিভাগ্যবান কবিটি। যে এই নাটকের নায়ক! কাছেই একটা বেতের চেয়ার রাখা রয়েছে।

চেয়ারটার ওপর একখানা সাধারণ খাতা আর একটা ডটপেন।··· কৈশোরের প্রথমে খুব সুন্দর আর শৌখিন একটা খাতা করেছিল।···বিশেষ পছন্দসই কবিতাগুলো যত্ন করে করে লিখে রাখত তাতে।···পড়ে আছে সে খাতা সেই তার বাড়িতে। তার বাড়িতে ? কী হলো সে খাতাটা কে জানে। কাকি হয়ত বাজে জঞ্জাল বলে ফেলে দিয়েছে।

আশ্চর্য! কী অদ্ভুত একটা ক্ষণে এক বছরেরও বেশি আগে সেই

দিনটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখানে চলে এসেছিল সে। এখনো অবধি আর ফেরা হলো না। তার কোনো জিনিসপত্র আনিয়ে নেবার চেষ্টা হয়নি। মনে মনে একটু বিষন্ন হাসি হাসলো পলাশ···কীই বা ছিল এমন! এখানে তার জন্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোগানো হচ্ছে। কী অদ্ভুত! আমি সেসব নিয়েও চলেছি। 'ছন্নছাড়া' নামটা তো শুধু শখের ছদ্মনামই নয়, অবস্থাও তো তাই ছিল। হঠাৎ যেন একটা শিকারির জালে পড়ে গেলাম। তার মধ্যে আটকা পড়ে গেলাম। মাঝে মাঝে তাই মনে হয় আমার। এর থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্য ভীষণ একটা ব্যাকুলতাও তো হয়।···

কিন্তু কী করে যাব?

আমার যদি নিজে নিজে চলে যাবার একটুও ক্ষমতা থাকত এইভাবে কী পড়ে থাকতাম? দাবিহীন সম্পর্কহীন একটা জায়গায় শিকড় গেড়ে বসে অবিরত নিয়ে চলেছি। এ কী অদ্ভুত পরিস্থিতি!

অথচ এদের ব্যবহারে মনে হয় খুবই যেন স্বাভাবিক এটা।—যেন আমি সেরে উঠে বেঁচে উঠে ওই ডাক্তারটিকে কৃতার্থ করব।···কিন্তু শুধুই কি ডাক্তার? 'দেবতা' বলাই উচিত নয় কী? 'মানুষ' এরকম হয়?···এই ঋণের বোঝা বওয়া সম্ভব হচ্ছে বোধহয় ওই দেবোপম মানুষটির অগাধ ভালোবাসার জন্যে।

পৃথিবীতে যে এতো অহেতুক ভালোবাসা থাকতে পারে তা কে জানতো?

অথচ সম্বন্ধের সূত্র প্রমিতা।

কী অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করেছি তার জন্যে।

আর কী অদ্ভুত ভাবেই সেই আকর্ষণ হারিয়ে গেছে। জীবনে এমন ঘটনাও ঘটে। আশ্চর্য!

আগে প্রমিতা একবার কাছে এসে বসলে মনে হতো স্বর্গের বাগানে পৌঁছে গেছি। প্রমিতার হাসি কথা চোখের চাওয়া সমস্ত শরীরটাকে কাঁপিয়ে দিতো।···অথচ কী দুর্লভ ছিল সেই স্বর্গ সুখটি।

অথচ এখন? আশ্চর্য! খামখেয়ালি ওই মেয়ে এখনই বেশি বেশি আসে, বসে, কথা বলে।

এখন আর আমার কাছে ওর কোনো আকর্ষণ নেই। কারণ এখন আমি জেনেছি বুঝতে পেরেছি 'হৃদয়ের স্পর্শ' কী জিনিস। যে জিনিসটা প্রমিতার কাছ থেকে মেলে না।···প্রমিতার অলৌকিক সৌন্দর্যের আবরণে মোড়া ভিতরটায় 'হৃদয়' নেই। প্রমিতা সুন্দর একটি পুতুল। অনেকটা দম দেওয়া পুতুলের মতো। যে যন্ত্রের কৌশলে হাসে তাকায় হাত নাড়ে কখনো কখনো

রাগি পুতুল হয়ে যায়।

এলোমেলো এইসব ভাবনা ভেবে চলে সে পায়চারি করতে করতে। পায়চারি করতে বলা হয়েছে পলাশকে এই বিকেল বেলাটায়।

হঠাৎ একসময় কখন 'অলৌকিক সৌন্দর্যের' অধিকারিণী প্রমিতা কোথায় হারিয়ে যায়।…কখন ফুটে ওঠে আর একখানি জ্যোতির্ময়ী মূর্তি।…

হ্যাঁ হ্যাঁ। এখানে এসেই জানতে পেরেছে পলাশ পৃথিবীতে 'মানুষ' থাকে। আর মানুষের মধ্যে ভালোবাসা থাকে।

কিন্তু হঠাৎ কী হলো? এক সময় চেয়ারটার কাছে চলে এলো। খাতাটা আর পেনটা কোলে রাখলো।

গরমকালের বিকেল।

সূর্য যাই যাই করেও যেতে দেরি করে। এখনো আকাশে আলো। খাতাটা তুলে নিল পলাশ। কখন যেন কটা লাইন লিখেছিল…।

'শুধু তোমার জন্যেই আমার সমস্ত পৃথিবী
আলোকিত হয়ে উঠেছিল।…
শুধু তোমার জন্যেই আজ সে পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে গেল।
আমি জানি না কেন তোমার এই অন্তর্ধান।
আমি জানি না আর কোনোদিনই তুমি—
আমার জীবনে আসবে কিনা।
এখন—

ওর পর আর লেখা হয়নি। এখন আবার পেনটা তুলে নিয়ে লিখলো—

এখন থেকে শুধু তোমারই অপেক্ষায়—
কাটবে আমার দিনরাত্রি।
এখন থেকে—

পিছন থেকে ছায়া পড়লো।…তারপর বেজে উঠলো সেই স্বর। যে স্বরে একদা রক্তে ঘুঙুর বেজে উঠতো। আর সে স্বর এখন আর দোলা লাগায় না।

কী রে ছন্নছাড়া! আবারও সেই 'শুধু তোমারই জন্যে? এটা আর তোর মাথা থেকে নামছে না বুঝি? হি হি হি। সারাজীবন লাইন বানিয়ে চলবি, 'শুধু তোমারই জন্যে।'…মাথাটা একদম খারাপ!…

পলাশ খাতাটা তাড়াতাড়ি মুড়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে বললো, আর কোনো চেয়ার দেখছি না তো। তুমি বসবে?

উঠে দাঁড়ালো।

হয়েছে। খুব সৌজন্য দেখানো হয়েছে। তুই তো এখনো রুগি।··· তা তোর মমতাময়ী নার্সটি যে হঠাৎ কেটে পড়লো? শখ ফুরিয়ে গেলো?

পলাশ একথার কী জবাব দেবে।

প্রমিতাই আবার কথা বলে ওর চেয়ারের পিঠে ঝুঁকে বরাবরের জন্যে গেল, না দু-চার দিনের জন্যে?

সে তো তোমরাই জানবে।

আমার অত জানতে যাবার দরকার নেই। বললো, 'যাচ্ছি।'···বললাম যাবার কথা ছিল বুঝি? তো যেমন প্যাঁচমেরে কথা বলা স্বভাব, সেইভাবেই বললো, 'আগে থেকে কথা থাকবে এমন কী মান্যমান লোক নাকি? গেলেই হলো কোনো একসময়।' তো তোর খুব অসুবিধে হচ্ছে?

না অসুবিধে আর কী? ব্রজদা তো সর্বদাই—

আহা। 'বিরহ' লাগেনি তো?

ছিঃ প্রমিতা।

ও বাবা! কি ভক্তি!·· তো তোর ডাক্তারবাবুর মনে হচ্ছে দারুণ বিরহ লেগেছে।···মুখের রং বদলে গেছে।

এসব কথা আমার কাছে বলে লাভ কী প্রমিতা?

লাভ আবার কী? সব সময় লাভ লোকসানের হিসেব কষে নিক্তি মেপে কথা বলতে হবে না কী?···যাঃ চললাম। তুই এই জঙ্গলে বসে বসে মশার কামড় খা।

বলে চলে গেল প্রমিতা সারা শরীরে একটা হিল্লোল তুলে।

প্রমিতা কী সেণ্ট ব্যবহার করে?

গন্ধটা ভারি উগ্র।···

*   *   *   *

নীতু ব্যস্ত হয়ে বললো: ব্রজ তুমি হঠাৎ? কী খবর? সবাই ভালো আছে তো?

ব্রজ বললো, আছে বললে আছে, নাই বললে নাই। এই যে বোশেখীদিদি ছিল তো দিব্যি। হঠাৎ সুখে থাকতে ভূতের কিল খেলো। মামার বাড়ির জন্যে এমন মন কেমন করে উঠলো যে—ধৈর্য ধরলো না। চলো ব্রজদা আমায় মামার বাড়ি পৌঁছে দেবে।

তাই না কী? কই? কোথায় সে?

ওই তো এসেই তোমাদের রান্নাঘরের দোরে দাঁড়িয়ে কোন বুড়ির সঙ্গে

গপপো জুড়েছে ! ওইটিতে ওস্তাদ ! তো চলে যে এলি রুগিটার কথা ভাবধি তো ? যৈনার বন্ধু তিনি তো হুঁঃ।

রুগি তো শুনলাম ভালো আছে।

তা আছে। তবে যত্নআত্যি করার মানুষটা চলে এলে আবার উল্টোপাল্টা হতে কতক্ষণ ? যাক গে। বসবার সময় নাই। চলি।

কী যে বলো ব্রজ ? অমনি মুখে আমার কাছ থেকে চলে যাবে ?

তা দাও। তোমার ঘরে যেখানে যা ভালোমন্দ আছে বার করো চটপট।··· ওই যে আসতেছেন। বোশেখীদি আমি তালে একটু খাওয়া দাওয়া করেই রওনা দিচ্ছি, কবে নিতে আসব বলো ?

বৈশাখী জোরে হেসে উঠে বলে, রোসো ব্রজদা মামার বাড়ির আদরটা দুদিন খেয়ে নিই।···যখন এই মামীরা ঠ্যাঙা নিয়ে তাড়া করবে তখন ছুট মারবো।

অ। তার মানে অধিক দিন থাকার মতলব। তো নাও একটু বিশ্রাম করে। তবে ওই কবি দাদাবাবুকে তো শুনলাম সামনের মাসে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে অপারেশান করতে।

অপারেশন। কী অপারেশন ?

জানি নে। খোকাদাবাবু তো বললো, 'তেমন কিছু না' আবার দেখছি না করলেও না। মুখ্যু মানুষ বুঝি সুঝি না। তাহলে—যখন যাবে একখানা পোস্টকার্ড ফেলে জানিয়ে দিও।

বৈশাখী একটু হেসে বলে, আর যদি কোনোদিনই না যাই ?

ব্রজ একবার তাকিয়ে দেখে গম্ভীর ভাবে বলে, বুঝেছি। সেই রকমই একটা আঁচ করে ভয় খাচ্ছিলুম। যাগগে যা ভালো বুঝবে করবে। আমি কে ?···পেটটা কেমন মোচড় দিচ্ছে, আমার আর কিছু খাওয়ার মন নাই পিসি। চললুম।···

হন হন করে চলে যায়।

* * * *

বড়মামী মেজোমামী মুখে খুবই উল্লাস দেখালেন। মামারা স্নেহ প্রকাশ করলেন। মামাতো ভাইবোনেরা সত্যিই আহ্লাদে বিগলিত হলো। এবং সকলেই একবাক্যে বলতে লাগলো, শাখীদি আগের থেকে অনেক বেশি সুন্দর হয়ে গেছে। অনেক ফর্সা।

বড়মামী বললো, হবে না কেন ? কথাতেই আছে সুখের ঘরে রূপের

বাসা। বড় মানুষের বাড়ির আরাম আয়েস। তবু যে গরিব মামা মামীদের জন্যে মন কেমন করেছে সেটাই ভাগ্যি।…

তবে আড়ালে বলাবলি করলো, শুনেছিলাম নাকি কী যেন চাকরি হয়েছে। তা এতোদিন চাকরি করে এসে কারুর জন্যে তো একটা কিছু উপহার আনতে দেখলাম না।

কিন্তু আরো আড়ালে?

নীতু বললো, আরো আড়ালে ব্যাপারটা কী শুনি? কী হয়েছে? 'মামার বাড়ির জন্যে মন কেমন' ওটা তো ছেলে ভুলানো গল্প।

বৈশাখী জানলার বাইরে চোখ রেখে আস্তে বললো, আসল গল্পটা বলে উঠতে পারা যাবে বলে মনে হচ্ছে না ছোটমামী।

নীতু আরো আস্তে বলে, অমুর বৌ খুব দুর্ব্যবহার করেছে?

কী যে বলো? সেইটুকুতে আমি মূর্ছা যাব?

তাহলে? অমুর পক্ষে তো এমন কোনো ব্যবহার সম্ভব নয় যে,…

কার পক্ষে যে কী সম্ভব আর কী সম্ভব নয় সে কী বুঝতে পারাই সকলের পক্ষে সম্ভব ছোটমামী?

যদি বলা না যায় বলবার জন্যে জোর করবো না। তবে কী হলো ভেবে হাঁসফাস করে মরব আর কী!

বৈশাখী বলে, তোমাকে বলা চলে না এমন কোনো কথা আমার থাকতে পারে না ছোটমামী। শুধু ভেবে পাচ্ছি না কী করে গুছিয়ে বলতে পারা যায়।…আচ্ছা আর একটা দিন সময় দাও আমায় তুমি। মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে দেখি কোনখান থেকে শুরু করা যায়।

*　　*　　*　　*

প্রমিতা এবার অনেকদিন পরে বাপের বাড়ি গেল।

উত্তরপাড়ার এই অসহনীয় বাড়িটাতেই যে এতদিন একভাবে পড়েছিল সে, সেটা কী জায়গাটা বেদখল হয়ে যাবার আশঙ্কায়? এখন হঠাৎ খুব হালকা লাগছে।

আশ্চর্য এই অদম্যকে প্রমিতা কোনো সময় কোনো ভাবেই সন্দেহ করতে পারে না, অদম্যকে দেখলেই ওর নিজের মনটা নিয়ে কুঁকড়ে যেতে ইচ্ছে করে তবু বুকের মধ্যে যেন একটা পাষাণ ভারও চেপে বসে থাকে।

লোকটা যেন যাদুকর। কিছুতেই বেশিক্ষণ ওর সামনে জোরালো ভূমিকায় খাড়া থাকা যায় না।

আর কিছুতেই কোনো কোথায় ওকে কাবু করা যায় না।

বৈশাখী চলে গেল দেখে ওর বুকের পাষাণ ভারটা হালকা হয়ে গেলেও মুখের রেখায় অবজ্ঞা ফুটিয়ে বললো প্রমিতা, ডাক্তারবাবুর মনে হচ্ছে দারুণ বিরহ লেগেছে।

অদম্য বললো, খুবই স্বাভাবিক। না লাগলেই আশ্চর্য লাগতো।

কার আশ্চর্য লাগতো ?

আমার নিজেরই।

ওঃ বাবা! এতো ভালাবাসা।

হুঁ! এতোই ভালোবাসা ?

অথচ প্রমিতা তেমন রেগে উঠতে পারলো না। পারলো না আক্রোশে ফুলে উঠতে। প্রমিতা শুধু বললো, ভেবে পাই না ওই ভালোবাসার পাত্রীটিকে বর্জন করে আমায় কেন—

এ কথাটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে।

সত্যি কথা কখনো পুরনো হয়ে যায় না।

ঘটে যাওয়া ঘটনা পুরনো হয়ে যায়।

তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়। বেচারি!

যাক! তবু একটা সান্ত্বনার জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল। আমার জন্যে তোমার দুঃখ হয়।

তারপর হঠাৎ কাছে সরে এসে প্রমিতার দুই কাঁধে হাত রেখে অদম্য তার 'যাদু দৃষ্টি'-তে তাকিয়ে বলে, আর যদি বলি, তোমার জন্যেও আমার দুঃখ হয় প্রমিতা।···

কেন? কিসের জন্যে? কাঁধটা ঝাঁকিয়ে সরিয়ে নিয়ে বলে, আমি কারো ভালোসার ধার ধারি না।···'সেকেন্ড হ্যান্ড ভালোবাসায়' আমার রুচিও নেই।···ভাবছি এই মিথ্যে বন্ধনের দড়িদড়া থেকে মুক্তি নেব।

এতো বড় কথার পরও কিনা অদম্য বললো, 'ধীরে রজনী ধীরে।'···এতো তাড়াতাড়ি ডিসিশান নিতে নেই।

ডিসিশন নেওয়ার সময় বোধহয় যথেষ্টই হয়ে গেছে।

অদম্য মনে মনে একটু হাসলো! ভাবলো, তবু তুমি যাকে তোমার 'প্রতিপক্ষ' ভেবে ক্রুদ্ধ হচ্ছো, তার উপস্থিতিতে রণক্ষেত্রটা ছেড়ে যেতেও পারছিলে না। যদি এই জীবনটা তোমার কাছে এতোই মূল্যহীন হয়ে গিয়ে থাকে তো অবজ্ঞায় অবহেলায় ফেলে দিয়ে চলে যেতে পারতে।

অদম্য অবশ্যই সরল উদার মহৎও। কিন্তু অদম্য নির্বোধ নয়।···অদম্য 'কার্যকারণের' হদিস বুঝতে পারে।

আর অদম্য হয়তো তার চিকিৎসকের মন নিয়ে সব জিনিসটা দেখে, বিশ্লেষণ করে এবং বিচার করে। শরীরের কোনখানটা ক্ষতদুষ্ট হলেই তাকে সমূলে বাদ দিয়ে বসতে হবে এমন সিদ্ধান্ত নেয় না।

অদম্য তাই বললো, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে সময় 'যথেষ্ট' হয়নি। সবসময় আমরা নিজেরাই নিজেকে ঠিকমতো বুঝতে পারি না।···দেখো হয়তো এরপর আমায় ত্যাগ করে চলে গেলে আমার জন্যে ভীষণ মন কেমন করবে তোমার!

তারপর একটু মাথা চুলকোবার ভঙ্গি বলে আমি ওকে বলেছিলাম—

কী? থামলে কেন? কী বলেছিলে তুমি ওকে?

প্রমিতার চোখ দিয়ে আগুন ঝরে।

অদম্য কিন্তু নিজের নামের মহিমা বজায় রাখে। একটু হেসে বলে, বলতে অবশ্য একটু বাধছিল। তা যাকগে শুনেছি স্ত্রীর কাছে কিছু গোপন করা মানেই কলহের বীজ রোপণ! এমনিতেই তো—যাক গে বলেই ফেলি। আর ইয়ে সবটাই তো ওপেন সিক্রেট? বলেছিলাম—দেখ হে মেয়ে, তুমি তো সেই বাল্যকাল থেকে আমার প্রেমে পড়ে মরে পড়ে আছো। কিন্তু জিনিসটা স্রেফ বরবাদ যাচ্ছে। না তোমার, না আমার কারোরই কাজে লাগছে না। অমন দামি একটা জিনিস পড়ে থেকে থেকে ঘুণ ধরে যাবে? এটা ঠিক? অথচ ওটুকু পেলে একটা অভাগা হতভাগার জীবন রক্ষা হয়। মৃত হৃদয়ে প্রাণ সঞ্চার হয়! তো ওই দামি ভালো জিনিসটা তাকেই দিয়ে দাও।

প্রমিতা ধৈর্য শুনলো সবটা। তার স্বামীর ওই অনায়াস ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে। এখন বলে উঠলো, এই কথা বললে?

বললাম তো।

মুখে আটকালো না?

আটকালে কাজটা হবে কী করে তা বলো?

আমি ভেবে পাই না তুমি মানুষ না শয়তান!

এতো গোড়া থেকেই ভেবে আসছো। আজ পর্যন্ত একটা ডিসিশানে আসতে পারলে না।

তোমার মতো এমন অদ্ভুত ডিসিশান নেবার ক্ষমতা আমার নেই। কী করে এমন অদ্ভুত একটা চিন্তা কারো মাথায় আসতে পারে আমার বুদ্ধির অগম্য। 'হৃদয়' জিনিসটা কী জামা-কাপড়, খাবার-দাবারের মতো? আমার

কাজে লাগছে না 'ওকে' দিয়ে দাও ? মেয়েদের তুমি ভাবো কী ? ইঁট কাঠ এর মতো ?

অদম্য প্রমিতার উত্তেজিত লাল হয়ে ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলে, মোটেই তা নয় মিতা। বরং বলতে পারো মেয়েদেরকে আমি নদীর মতো মনে করি। পুরুষ জাতটাকে স্নিগ্ধ করতে তৃপ্ত করতে পূর্ণ করতে তার ক্ষমতা অসীম। কিন্তু প্রয়োজনে একটা প্রবল নদীস্রোতকে ঘুরিয়ে অন্যমুখে মোড় ফিরিয়ে বইতে দেওয়া হয়। যাতে সেখানের শুকনো মাটি সরস হয়ে ওঠে।

—থামো। তুলনা জিনিসটা যুক্তি নয়। একটা অসম্ভব —

—কিন্তু তুলনা থেকেই তো ধারণার সৃষ্টি হয় মিতা। আর মানুষের হৃদয়রাজ্যে 'অসম্ভব' বলে কোনো শব্দ কী সত্যিই আছে ? এক মুহূর্তের বৈরাগ্যে সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্নিসী হয়ে ছাড়তে পারে, আবার এক ছটাক জমি নিয়ে সহোদর ভাইয়ের সঙ্গে খুনোখুনি করতে পারে।···একমাত্তর সন্তান শোকের পরও ওঠে হাঁটে খায় বেড়ায়, আবার ক্ষণিকের দুঃখে আত্মহত্যা করে বসে। মানুষের পক্ষে অসাধ্য বলে কিছু নেই।···তাছাড়া দেখো আমি তো ওকে কারো ক্ষতি করতে বলিনি। ভালো করতেই বলেছিলাম।

প্রমিতা কি তা বলে এই বক্তৃতায় বিগলিত হয় ?

প্রমিতা তিক্ত ব্যঙ্গের গলায় বলে মহৎ ব্যক্তি মহত্বেরই পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলে। তা প্রস্তাবের জবাবটা কী পেলে ?

ওই তো। পত্রপাঠ এই দুর্জনের গৃহটি ত্যাগ।

থাক। তবু স্বীকার করতে হবে ভেতরে কিছুটা লজ্জা সম্ভ্রম বোধ আছে। মনে তো হতো ওর বালাই টালাই নেই।···তা' তোমার এই এ গেলাশের জলটা ও গেলাশে ঢালার প্রস্তাবের অপর গেলাশটি বোধহয় ওই ছন্নছাড়াটা ?

অবশ্যই। হাতের কাছে আর খালি গেলাশ কই ?

হুঁ। তাই আন্দাজ করছিলাম। তো হতচ্ছাড়া ছন্নছাড়া তো তোমার বৈশাখীর ওপর ভক্তিতে বিগলিত। 'দিদি দিদি' ডাক।

ডাক ? ডাক—এতে কি এসে যায় ? বাল্যপ্রেমের প্রধান ডাকটিই তো 'দাদা'।···অমুকদা। তমুকদা।

দুটো এক হলো ?

নয় কেন ? 'দাদা' যদি প্রিয়তম হতে পারে, 'দিদি' 'প্রিয়তমা' হতে পারবে না কেন ?

যত বাজে তর্ক।

আমি কিন্তু বাজে ভাবি না। দেখতে তো পাই, তোমার ভক্ত হনুমানটি কখনও কোন ফাঁকে দিদি ভক্ত হয়ে লটকে পড়ে মরেছে।···

ওঃ। তোমার দৃষ্টিশক্তিটি খুবই তীক্ষ্ম স্বীকার করতেই হবে। তো এখন কী করতে চাও 'দিদি'র সঙ্গে মালাবদল করিয়ে তাকে ঘরসংসারী করে দিতে চাও বোধহয় ?

দ্যাটস রাইট। ঠিক বুঝেছ। ঠিক তাই চাই। ···আসলে ওই ছেলেটা আমার কাছে প্রায় একটা পরীক্ষার মতো জিনিস ছিল।···ওর এমন সুন্দর ভাবে সেরে ওঠার আশাই করিনি।···তার মানে ও আমায় একজামিনে পাশ করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখো মিতা, বরাবর তো আর ওকে এখানে রাখা যাবে না ? আবার ওকে ওর সেই স্নেহহীন বাড়ীতে ফিরে যেতে হবে। যেখানে ভালো করে খেতে পর্যন্ত—তাছাড়া নিষ্ঠুর কঠিন ব্যবহার।

প্রমিতা তবু তার ব্যঙ্গের ভঙ্গি ছাড়ে না। বলে, তা' ফন্দিটা মন্দ আবিষ্কার করনি। এক ঢিলে দুই পাখি মারা। এদিকে তোমার স্ত্রীর প্রেমিকটিকে হস্তান্তর করা হলো, আবার ওদিকে তোমার প্রেমিকার পুনর্বাসন হলো। সত্যি কী বুদ্ধি তোমার !

অদম্য ওই বিদ্রূপ রঞ্জিত মুখটার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, তোমার বুদ্ধিটা আরো কতো বেশি তাই ভাবো ? আমার এই প্যাঁচানো মতলব-টতলব গুলো কী রকম জলের মতো বুঝে ফেললে। ঠিক ওইটেই তো মতলব। কিন্তু হলে কী হবে ? আমার সঙ্গে কো-অপারেশনটা করছে কে ? একজন তো রাগের চোটে চলেই গেল, অন্য একজন হয়তো এ প্রস্তাবে শুনলে ডাক্তারকে ইঁট ছুঁড়ে মারবে।

প্রমিতা কঠিন গলায় বলে, তা ভেবো না। ওই আদেখলে বেহায়াটা হয়তো শুনে আহ্লাদে নেচে উঠবে। তো এতো তো 'সেরে উঠেছে সেরে উঠেছে' বলে ইয়ে করা হচ্ছে—তোমার ব্রজদা যে বললো, কী যেন অপারেশন করাতে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে !

সেটা এমন কিছু ভয়ের না। গায়ে রক্তের আর শক্তির অভাব ছিল বলে, এতোদিন—কিন্তু তারপরই তো মুস্কিল। ও তারপর আর এখানে ফিরে আসতে রাজি নয়। বলছে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই বাড়ি ফিরে যাবে।

তা বলেছে সেটাও ভালো। কতোদিন আর সুযোগ নিয়ে চলবে। তা সেই স্নেহহীন বাড়িতে ফিরে গেলে যদি আবার অসুখে পড়ে এই ভয়ে তুমি

কতোদিন আগলে রাখতে পারবে? দিদির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেই কী সমস্যার সমাধান হবে? বিয়ে করে বৌকে খাওয়াবে কী? ফুলের মধু?… রাখবে কোথায়? পরীর দেশে?

অদম্য এসব ব্যঙ্গ গায়ে না মেখে বলে, সে সব তো ভেবেইছি। আমার এখানে ছোটখাটো একটা চাকরি দেওয়া যায়। কিন্তু বরাবরের জন্যে কলকাতা ছেড়ে থাকতে ইচ্ছে হবে কিনা—

প্রমিতা রাগের গলায় বলে ওঠে, ওঃ। সেটি ভাবা হচ্ছে? শুধু আর কারো বেলায় সেটা না ভাবলেও চলে কেমন?…আমি চলে যাচ্ছি বুঝলে?

অদম্য বললো, স্থির সংকল্প?

স্থির সংকল্প।

ঠিক আছে। সবাই আমায় ছেড়ে চলে যাও। আমি 'ভারত ছেড়েই' চলে যেতে পারতাম। কিন্তু নতুন নার্সিং হোমটাকে ছেড়ে চলে যাওয়া তো চলবে না।

এখানেই পড়ে পড়ে পচবার জন্যেই তো ইচ্ছে করে ওটা বানানো হয়েছে। তোমার ওপর কারুর সিমপ্যাথি আসবে না।

অদম্য বলে, সেইটাই একটু অসুবিধে। সহানুভূতিহীন হয়ে পড়ে থাকা—

অত দুঃখ করার দরকার নেই। তোমার প্রাণের ব্রজদা আছেন বামুন মাসি আছেন গোপাল হরিপদ এরা ওরা তারা কতো জন আছে। আমি কালই যাচ্ছি।

প্রমিতা ঠিকরে পাশের ঘরে চলে যায়।

বেশ হয়েছে। ঠিক হয়েছে। বাল্যবান্ধবী উচিত জবাব দিয়েছে। লোকটা মেয়েদের ভাবে কী? তাদের দিয়ে যা খুশি করা যায়!

এলোমেলো ভাবে একটা সুটকেস গোছাতে বসলো। কোনটা নেবে কোনটা নেবে না। চিরকালের জন্যে চলে যেতে হলে কী এতো বেশি গুছিয়ে নিয়ে যাওয়া ঠিক? হাসির ব্যাপার হবে না? তাছাড়া এক্ষুণি তো আর গিয়েই মা বাবাকে নিজের স্থির সংকল্পের কথা ঘোষণা করছি না। প্রথমটা ভাব দেখাতে হবে এমনি কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি। তারপর দেখা যাক, এই নিষ্ঠুর লোকটা কী করে। নেহাৎ যদি হেঁদিয়ে মরে আনতে যায় তখন ভাবা যাবে।

কেন কে জানে ভয়ানক ভারি হয়ে আসা মনটা হঠাৎ যেন একটু হালকা লাগে। সব ছড়িয়ে রেখে একটা পত্রিকা হাতে নিয়ে অসময়ে শুয়ে পড়ে।

এ ভেবেও হালকা লাগে 'আজিই যাচ্ছি' বলে ফেলেনি বলে। আজ যেন তেমন এনার্জি নেই গোছগাছ করে চলে যাবার মতো। কিন্তু যেতে তো হবেই। অতো জোর দিয়ে বলে ফেলাটা ঠিক হয়নি। আর দুচার দিনে কী এসে যেত ?

কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে—

কী ভেবে উঠে পড়ে নিচের তলায় নেমে এলো।

বুকটা ছাঁৎ করে এলো।

ব্রজদা তোমাদের কবি দাদাবাবুটি কোথায় ? ঘরে দেখলাম না।

এখন আর সর্বদা ঘরে থাকেন না। ডাক্তারবাবুর চেম্বারে গিয়ে বসে আছেন।

ডাক্তারাবুর চেম্বারে !

হ্যাঁ। বলেন, একা একা ভাল লাগে না। ওখানে বসে থাকলে তবু পাঁচজনার মুখ দেখা যায় !

কী যে সেই অপারেশনের জন্যে কলকাতায় যাবার কথা শুনেছিলাম।

ব্রজ কাঁধের ধুলোমাখা ঝাড়নাটা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলে, য্যাতোদিন না হয় ত্যাতোদিনই মঙ্গল।

কেন ?

গেলেই তো হয়ে গেল। বলেছেন ওখান থেকেই বাড়ি চলে যাবেন।

প্রমিতা বলে ওঠে, তা বরাবর কি পরের বাড়িতে থাকবে মানুষ ?

ব্রজ দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলে পর ভাবলেই 'পর' আপন ভাবলেই 'আপন'। খোকাদার যদি একটা ভাইটাই থাকতো, সে খেতো পরতো না ? একখানা ঘর দখল করে থাকতো না ?

চমৎকার। যেমন মনিব তেমন ইয়ে—

ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, কাল চলে যাচ্ছি, ভেবেছিলাম একবার দেখা করে যাই। তা হলো না। কাল বেরোবার আগে দেখা করে যাব।

ব্রজ অবাক হয়ে বলে, কাল চলে যাচ্ছেন ? কোথায় ?

কোথায় আর ? আর একটাই তো জায়গা আছে।

অ। তো মা বাপের শরীর গতিক ভালো আছে তো ?

হ্যাঁ।

আশ্চর্য ! ব্রজর সঙ্গে কথা কয়েও সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে প্রমিতার। হঠাৎ এই অধঃপতন কেন ?

তো বেশিদিন তো থাকছেন না ?

ঠিক নেই। চিরদিনও থাকতে পারি।

আঃ। বৌরানী। তামাসা করেও এমন ধারা কথা বলতে নাই। বিধাতা পুরুষ কখন কোথা থেকে কানে শোনেন। এখন আর আর সংসার ফেলে বেশিদিন বাপের ঘরে থাকলে চলে?

ব্রজ ঝাড়নটা ঝপঝপ করতে থাকে।

প্রমিতা সেই দিকে তাকিয়ে দেখে। এই ঘরটায় দীর্ঘদিন রইলো ছন্নছাড়াটা। ওর নিশ্চয় খুব মন কেমন করবে এখানের জন্যে!

উঠে এলো দোতলায়। চারদিক তাকিয়ে দেখতে দেখতে। এখনো এই সমস্তই আমার!

* * *

প্রমিতার মা আড়ালে স্বামীকে বললেন, এবারে খুকু আসায় যেন মনে তেমন আহ্লাদ পাচ্ছি না।

বিভূতিভূষণ বললেন, গেল বারেও এই রকমই কী একটা বলেছিলে মনে হচ্ছে। আমার ঠাকুমা কী যেন একটা বলতেন, 'আসতে পাগল যেতে ছাগল' তোমার প্রায় তাই।···এদিকে 'খুকু খুকু' করে পাগল হও। অথচ কিছুদিন থাকবে বলে এসেছে দেখেও আহ্লাদ নেই।

তুমি ওর ভাব-ভঙ্গি দেখেছ? মেয়ে যেন এখানে থেকেও আর কোথাও বসে আছে। হাসিখুশি কম, খাওয়া কম। যা যা ভালোবাসে তা রাঁধছি। তেমন হৈ চৈ করে খাচ্ছে না।

বিভূতিভূষণ একটু হেসে বলেন, তার মানে তোমার কন্যের বিরহ লেগেছে।

তা হলেও তো বাঁচতুম। এ যেন অন্যভাব। আর অতবড় সুটকেসটাই বা নিয়ে এসেছে কেন? কতোদিন থাকতে ইচ্ছে?

কী মুস্কিল! কতো কী যে ভাবতে পারো? তোমার মেয়ের শাড়ির স্টকের কখানাই বা এনেছে?...তোমার কী মনে হচ্ছে ঝগড়া করে চলে এসেছে?

প্রমিতার মা আস্তে বলেন, ঝগড়া তো ভালো জিনিস! তাহলে তো ভাবনা ছিল না। এখনকার মেয়েরা 'ঝগড়া' করে রাগ দেখাতে বাপের বাড়ি চলে আসে না। আরো বেশি কিছু করে বসে।

বিভূতিভূষণ বিরক্তির গলায় বলে ওঠেন, আর সে ব্যাপারে ছোট থেকে মায়েদের মদত পায়।

তার মানে?

কেন জানি না হঠাৎ সাহসী হয়ে ওঠেন বিভূতিভূষণ। বলে ওঠেন, 'মানে' আর বোঝাবার কী আছে? ছোট থেকেই তো মায়েদের শিক্ষা চলে তুই কিসের জন্যে সব কিছু মানিয়ে নিতে চেষ্টা করবি? নিজের মানমর্যাদা নিজে রাখবি! নরম হলেই সবাই পেয়ে বসে। ওই ভাবেই চিরকাল সবাই মেয়েদের দাবিয়ে রেখে এসেছে।

ওঃ। বলেছি আমি এই সব?

একেবারে বলনি তাও নয়। তাছাড়া তুমি না বলো, অন্য মায়েরা তাদের মেয়েদের বলছে এসব।

তার মানে বলতে চাও মেয়েরা চিরদিনই পড়ে মার খাবে?

বিভূতিভূষণ আস্তে বলেন, যারা পড়ে মার খাবার তারা ঠিকই খাচ্ছে। হয়তো খেয়েই চলবে চিরকাল। কারণ যারা তাদের মারে, তারা জানেই না এটা মারা হচ্ছে। দেশে অবোধের সংখ্যাই তো বেশি! অশিক্ষা অজ্ঞতা দারিদ্র্য এই নিয়েই অন্ধকারে পড়ে আছে তারা। কিন্তু যাদের অবস্থা তেমন নয়, তারাও সুখে থাকতে ভূতের কিল খাচ্ছে।...ঠিক আছে আমি আজ ফোন করে জেনে নেব ব্যাপারটা কী? ··

তুমি? তুমি আবার কী বলতে কী বলে বসবে!

এতো অনাস্থা কেন?···তোমাদের সব ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় এ যুগে বেটাছেলেগুলো যেন সবাই বুদ্ধু বনে গেছে।···তোমরা যেটি না করবে সেটিই ভুলভাল হবে। তারপর হঠাৎ বলে ওঠেন, তোমার কী মনে হয় তোমার জামাই খুব অত্যাচারী?

তা বলা হচ্ছে না। তবে জেদি একগুঁয়ে, যা ধরবে তা করে ছাড়বে, এসব দোষ নেই বলতে পারো না।

বিভূতিভূষণ একটু হেসে বলেন, তোমার মেয়েটিরও কি সে গুণে ঘাটতি আছে? যাক আমি দেখছি।···এতো কথা কইছ? খুকু আছে কোথায়?

বন্ধু এসেছে!

কই বসার ঘরে তো কাউকে দেখলাম না।

তখন হঠাৎ কারেণ্ট চলে গিয়েছিল বলে, গরমের জ্বালায় ছাতে গিয়ে বসেছিল। গরমও তো পড়েছে কম নয়।

* * *

কিন্তু বন্ধুদের নিয়ে ছাতে উঠে এসেছিল কি প্রমিতা শুধুই 'কারেণ্ট' চলে যাওয়ায়? যখন তখনই কি মনে হয় না তার ছাতে চলে গিয়ে বসি।

এখানের বাড়িটা কি হঠাৎ আগের থেকে ছোট হয়ে গেছে?···যেন ঘরের

দেওয়ালগুলো সরে এসে একদম গায়ের সঙ্গে লেগে থাকতে চায়। মাথার উপরকার সিলিংটা যেন হাত বাড়িয়ে হাত দেওয়া যাবে। জানলা দিয়ে হাওয়া আসে কৃপণের মতো। আর শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেই যেন বাড়িখানা ফুরিয়ে যায়। আগে কি এই বাড়িটা এতো ছোটো ছিল ?…হঠাৎ হঠাৎ যেন দম বন্ধ হয়ে আসে, ছাতেই বা ফাঁকা কোথায় ? যেদিকে তাকাও বাড়ি আর মানুষ। মানুষ মানেই তো চোখ। ছাতে এসে ঘুরে বেড়ানো মানেই দুশো পাঁচশো জোড়া চোখ কোনোখান না কোনোখান থেকে প্রমিতার ওপর দৃষ্টি ফেলছে। এই দু'তিন বছর ধরে পাশে আরো কত ফ্ল্যাটবাড়ি উঠে উঠে আকাশে ছায়াফেলছে।…এখন বাড়ি মানেই বহুতলা।…

প্রমিতার বন্ধু বিদিশা বললো নাঃ। তোর কোনো ক্যাপাসিটি নেই। এতোগুলো দিন করলিটা কী? লোকটাকে কব্জা করতে পারলি না? সেই গ্রামের ডাক্তারবাবু হয়ে পড়ে রয়েছে ?

রম্যা বললো. লোকটা খুব জবরদস্ত টাইপের তাই না ?

প্রমিতা বললো, ধ্যাৎ !

তবে ? এখনো পর্যন্ত নোওয়াতে পারলি না ?

প্রমিতা মান বাঁচাতে চেষ্টা করে। ঠোঁট উল্টে বলে চেষ্টাই করিনি।

চেষ্টাই করিসনি ?

নাঃ। যে যার নিজস্ব গতিতে চলুক, এই আমার মতবাদ।

ও বাবা। এ যে দারুণ মতবাদ। তার মানে তোর বারোটা বেজে যাওয়া।

তা কেন ? আমিও আমার নিজের স্বাধীনতায় থাকি।

বিদিশা হেসে হেসে বলে ওঠে, আহা। তাতে কি ভারি সুখ ! একটা লোককে বশংবদ দাসানুদাস করে খেলাতে না পারলে আর সুখ কী ?

বিদিশার আত্মগৌরবে ডগমগে মুখে সেই 'সুখে'র ছাপ যেন উছলে ওঠে।

এদের সঙ্গও আর ভালো লাগে না। মনে হয় ওরা যেন চির ঈর্ষ্যার সুন্দরী প্রমিতাকে ডাউন করে সুখ পেতে চায়।…নাঃ কিছুই ভালো লাগছে না।

বন্ধুদের বিদায় দিতে যাবার সময় দেখলো বাবা ফোনে কথা বলছেন।…

কার সঙ্গে ?…বাবা নিজে ? না অপর দিক থেকে, বাবার, কি খুব বেশি বন্ধু আছে ? অথবা এমন আত্মীয় যারা মাকে না চেয়ে বাবাকে চাইবে ?

দরজার বাইরেটা পর্যন্ত ওদের সঙ্গে গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে শুনতে পেল, আচ্ছা ! ও কে। ছাড়ছি।

আচ্ছা হঠাৎ প্রমিতার মধ্যে এমন একটা লজ্জা এসে চেপে বসলো কেন ?

অতি সহজ একটা প্রশ্ন করতে পারলো না কেন বাবাকে ?···অথচ এ প্রশ্ন তো করেই থাকে 'কে ফোন করেছিল বাপি ?'···অথবা 'কার সঙ্গে এতো গল্প চালাচ্ছিলে বাপি ?'

পারলো না। নিজের ঘরে চলে গেল। শুয়ে পড়লো পাতা বিছানায়।··· নিজের ঘর'। আগের সেই পড়ার ঘরটা। বড় হয়ে পর্যন্ত যেখানে শোওয়া ধরেছিল।

ঘরটা ছোট্ট খাটটা অপরিসর।

হঠাৎ বিরাট একখানা ঘরের দৃশ্য চোখে ভেসে উঠলো। ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা পালঙ্ক। মাথার কাছে কারুকার্য।···আসার আগের রাতটার কথাই বোধহয়···

প্রমিতা শুয়ে আছে সেই খাটেরই একাংশে। ঘরে মৃদু নীল আলো।

ইস আজই এতো বেশি দেরি হয়ে গেল।

ঘরে ঢুকলো কৈফিয়ৎ প্রদানকারী। খাটের ধারে এসে বসলো গায়ে শুধু একটা হাতকাটা গেঞ্জি, আর পায়জামা। বুকটা কী চওড়া।···খাটের উপযুক্ত।

এসে বসে একটু পরে বললো, আচ্ছা আমি কী ঘুমের ঘোরে ফুটবল খেলি। গোল দিই ?

প্রমিতার ইচ্ছে ছিল কথা বলবে না। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো, কালই যখন চলে যাচ্ছি তখন—

তাই বলে উঠলো মানে ?

মানে হচ্ছে এই মাঠের মতো খাটটার সাড়ে পনেরো আনা অংশ আমার জন্যে ছেড়ে রেখে, বাকিটুকুতে নিজেকে শুইয়ে রেখেছ। এর আর কী অর্থ হতে পারে ?

'শুয়েছ নয় শুইয়ে রেখেছ।'

এই রকম কথার ধরণ। এখন আর কথা বললো না প্রমিতা।

বেহায়া লোকটাই আবার বললো এই প্লীজ আর একটু অন্তত জায়গা নাও। শেষে ঘুমের মধ্যে হঠাৎ গড়িয়ে পড়ে গিয়ে হাড় ভাঙবে। লোকে বলবে বদমেজাজি বরটা বোধহয় ঠেলে ফেলে দিয়েছে। এই।

আমায় একটু শান্তিতে ঘুমোতে দেবে ?

আহা আগামী কাল থেকে তো পরম শান্তিতে ঘুমোবেই 'অদ্যই শেষ রজনী' হিসেবে না হয় একটু উপদ্রব সহ্য করো।

তারপর আর কী, দূরত্বের হ্রাস করতে সেই চওড়া বুকটার মধ্যে এনে ফেলা।

এরকম আত্মসম্মান জ্ঞানহীন বেহায়া লোকের সঙ্গে পেরে ওঠা সহজ ?... এই রকমই নির্লজ্জ ও। সবসময় এই ভাবেই প্রমিতাকে নিরুপায় করে ফেলে! পরে নিজের ওপরই ভীষণ রাগ হয় প্রমিতার। ওই লোকটা সবসময় কথার জালে ফেলে প্রমিতাকে জব্দ করে আয়ত্ত করে নেয়। ওর সংস্রব ত্যাগ করা ছাড়া মান বজায় রাখার আর কোনো উপায় নেই।

কিন্তু আজ এই নিতান্ত দীনহীন সরু খাটটায় শুয়ে পড়ে প্রমিতার কেবলই সেই মাঠের মতো খাটটা চোখের সামনে ভাসতে থাকে। তার সঙ্গে একখানা চওড়া বুকও কী নয় ? দুখানি বলিষ্ঠ বাহু ?—

*　　*　　*

আমি কি এসে মাকে বলেছিলাম 'তোমার খুকু আবার তোমার কাছে ফিরে এলো ?'

না বলিনি। বলব বলে রিহার্সাল দিতে দিতে এসেছিলাম মুখোমুখি হওয়া মাত্র মনে হলো ধ্যেৎ। বড় যেন নাটক শোনাবে, দেখতেই তো পাবে ক্রমশ।...

ভাগ্যিস বলিনি।

কিন্তু তাতে লাভই বা কী হয়েছে ? যত যাই হোক আত্মসম্মানটা তো হারাতে পারা যায় না ? একটা কাজকর্ম কিছু করা দরকার। নইলে কাটানো যাবে কী করে ?

বিভূতিভূষণের গলার স্বর কানে এলো, 'বন্ধুরা চলে যাওয়া মাত্র শুয়ে পড়লি যে খুকু ?' কারো সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল নাকি ?'

ওঃ, তাই তো।

প্রমিতা উঠে বসে, হ্যাঁ পাড়াকুঁদুলি মেয়ে তোমার সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে বেড়ায়।

আহা। তাই কী বলছি। হঠাৎ শুয়ে পড়লি—

পড়ব না ? দুটোতে মিলে এতো কথা কইলো, মাথা ধরিয়ে দিলো।...

এই ভাবেই চালিয়ে চলতে হবে।

। কিন্তু কতোদিন ?

আচ্ছা আসার আগে সকাল বেলা ওর সঙ্গে কী কী কথা হয়েছিল ? তেমন কিছু না। শুধু বলেছিল এমন মোক্ষম সময় একটা রুগি মরব বলে পণ

করে বসে। উঃ। ভেবেছিলাম তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসব। তা হলো না।

প্রমিতা বলেছিল পৌঁছবার কী আছে? ড্রাইভার ছুটি নিয়েছে?

না। না। তা নয়। এমনি। যাক ঠিক আছে। সাবধানে থেক।

চলে গিয়েছিল। যেন প্রমিতা দু চারদিনের জন্যে যাচ্ছে। ঠিক সেই সময় প্রমিতার সেই 'শনি'টা এসে দাঁড়ালো। তুমি কাল আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে ওঘরে?

হ্যাঁ। জানতাম না তো তুই এখন উড়তে শিখেছিস।

শুনে মনটা এতো খারাপ হয়ে গেল।

কী শুনে?

তুমি এসে ফিরে গেছিলে।

আমার জন্যে তো তোর ভারি মাথা ব্যথা!

প্রমিতা!···স্বরটা গাঢ় গভীর।

কী হলো? কাব্যি চাগলো?

না। বলছি ব্রজদা বলছিল, তুমি নাকি এখান থেকে চলে যাচ্ছ!

যাচ্ছি সে তো দেখতেই পাচ্ছিস। গাড়িতে সুটকেস উঠে গেছে।

প্রমিতা। আমি অবশ্যই নেহাৎই নির্বোধ! তবু বলছি মস্ত একটা ভুল করো না। অদম্যবাবুর মতো লোক পৃথিবীতে বেশি মেলে না।

প্রমিতা হি হি করে হেসে বলে ওঠে, সেই যে কী বলে 'রতনে রতন চেনে।' তাই দেখছি। ওই লোকটাকেই কী তোর খুব বুদ্ধিমান মনে হয়?

হৃদয়বান কে যদি তোমরা বুদ্ধিহীন বলো তো আলাদা কথা!

প্রমিতা বললো, 'দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর'ও তো খুব হৃদয়বান ছিলেন। শেষ পরিণতি কী হয়েছিল ভাব? ওসব সেণ্টিমেণ্টের যুগ আর নেই বুঝলি। আচ্ছা টা টা।

গাড়িতে উঠে পড়ে মনের জোর করে গাড়িতে রেখে দেওয়া খবরের কাগজখানা খুলে পড়তে চেষ্টা করেছিল। ব্রজর ভদ্রতা নিখুঁত। আজ সকাল পর্যন্ত ঠাট বজায় রেখে প্রমিতার জন্যে কাগজখানা রেখে গেছে।

কিন্তু কাগজখানা পড়তে পেরেছিল কী?

দূর। কতকগুলো খবর মাথার মধ্যে পুরে তার কী হবে?

বারবার ওই ছন্নছাড়াটার চেহারাটাই চোখে আসছিল। চেহারাটায় আশ্চর্য রকমের উন্নতি হয়েছে। সেই ল্যাৎপেতে ভঙ্গি আর নেই। হঠাৎ মনে হলো সেই যে একটা কথা আছে 'স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য'' সেটা ঠিক। ওটা যে

দেখতে এতো সুন্দর তা আগে জানা যেত না।···প্রমিতার 'সম্পত্তি' ছিল। হাতছাড়া হয়ে গেছে।···যাকগে। প্রমিতার ফেলে দেওয়া জিনিসটাকে নিয়ে যদি কারুর জীবন ধন্য হয় তো হোক।···তবে সেই হ্যাংলা মেয়েটাও তো তেজ দেখিয়ে চলে গেছে। 'বুদ্ধিমান' ডাক্তারবাবুর যেমন বুদ্ধি!

গাড়িতে আসতে আসতে আরো কতো কীই ভেবেছিল। সব ভাবনার মধ্যেই ভাবটা ছিল যাক বাবা আমি তো এখন স্বাধীন ভাবে নিজেকে নিয়ে ভাবতে পারব।

কিন্তু এখন? এখন হঠাৎ মনে হচ্ছে সবসময় 'কিছু ভালো লাগে না' মন নিয়ে কী করে ওঠা যায়? লোকটার প্রভাবমুক্ত হবার উপায় কী!··· আচ্ছা আমার যেটা প্রধান বিরক্তি সেটা যদি ঠিক হয়ে যায়? ও যদি আমার ইচ্ছে অনুযায়ী কলকাতায় চলে আসে, আমার রুচি অনুযায়ী চলে?

'হ্যাঁ। তাই করেছে আর কী! নিজের জেদে অটল থাকবে।··· কেন? কেন? কেন প্রমিতার ইচ্ছেকে প্রাধান্য দেবে না ও? প্রমিতার মতো সুন্দরী স্ত্রী!···ওই বিশাখাটার মতো খেঁদির বরও ওর কথায় ওঠে বসে।··· ওরা জেনে গেল প্রমিতা তার বরকে বংশবদ করে তুলতে পারেনি। প্রমিতার মাথা ধরে উঠবে না? ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করবে না?

* * *

গাড়িতে উঠতে হবে পলাশকেও।

কলকাতায় যেতে হচ্ছে ক'দিনের মতো একটা নার্সিংহোমে ভর্তি হতে। ডাক্তার অদম্য বোস যার সঙ্গে যুক্ত।

যাবার আগে এতো দিনের বাসস্থানটার দিকে তাকিয়ে দেখছিল পলাশ। ···এতো বড় এতো ভালো ঘরে সে জীবনে থাকেনি।···জানলা খুলতেই অনেকখানি বাগান। এখন যেন বাতাসে কোন ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। চাঁপা?···কত ফুলের সময় দেখা হলো তার এখানে থাকতে থাকতে। বকুল শিউলি বেল মল্লিকা রজনীগন্ধা গন্ধরাজ আরো কত কী যেন। কোন মাসে কী ফোটে তা জানা নেই পলাশের, কিন্তু মনে পড়ছে একাধিকবার বোধহয় দেখা হয়েছে কাউকে কাউকে।···কতদিন থেকে গেল এখানে? প্রায় দুটো বছর। শুধুই কি থাকা ভাবতে গেলে কি অদ্ভুত লাগে। সম্পর্কের দাবিহীন একটা জায়গা থেকে পাহাড় প্রমাণ পেয়ে চলা। কেবলমাত্র একটা হৃদয়বান মানুষের উদার হৃদয়ের দাক্ষিণ্যে!···আর প্রমিতা কিনা—

সেই ভাবনার মানুষটাই ঘরে এসে ঢুকলো।···

পলাশকে সত্যিই কেমন 'ছন্নছাড়া' ভাবে ঘরের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে

থাকতে দেখে কাছে এসে বলে উঠলো, হঠাৎ যেন আর আপনি আজ্ঞে করতে ইচ্ছে করছে না। তুমি বলছি—

পলাশ সসম্ভ্রমে বললো, সে তো আপনাকে আগেও—

হ্যাঁ। তা বলেছ বটে। তবে ভাবতাম—সে যাক। তুমি কী সত্যিই ঠিক করে ফেলেছ, অপারেশনের পর আর এখানে ফিরে আসবে না? আমার সঙ্গে নন কো-অপারেশন?

পলাশ আস্তে বললো, চিরকাল কি আমি—

কিন্তু আমার যে ভাই তোমার জন্যে দারুণ মন কেমন করছে।...মনে হচ্ছে পরে আর কোনোদিন এই ঘরটায় ঢুকতে পারব না।...আর ভাবছি এই তুচ্ছ অপারেশনটা যেটা এমন কিছু জরুরি ছিল না সেটা আরো পিছিয়ে দিলে ববং আর কিছুদিন—খুব মেয়েলি আর বোকার মতো কথা হয়ে গেল না?

পলাশ আরো আস্তে বললো, আমি থাকায় আপনার কী লাভ?

আরে ভালোবাসার জনেরা থাকলেই লাভ।...ছেলেবেলায়, আমার এক মামা আসতেন বেনারস থেকে। দুষ্টুমি করে তাঁর যাবার দিন জুতো আর ছাতা লুকিয়ে রাখতাম, যাতে খোঁজাখুঁজি করতে সে ট্রেনটা ফেল হয়ে যায়।

ছেলেবেলার মনটাকে এখনো ধরে রেখেছেন?

ধরে রেখেছি না ছেড়ে যায়নি কে জানে।

পলাশ হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে আমি চলে যাব বলে আপনার মন খারাপ! আর আপনার নিজের স্ত্রীকে যে যেতে দিলেন?

আহা। মেয়েদেরকে মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি যেতে না দিলে তাদের মেজাজ 'খচে' যায়।

উনি তো একেবারেই চলে যাচ্ছেন বললেন।

অদম্য হেসে উঠে বলে, বললো বলেই সেটা ধর্তব্য করতে হয় নাকি? একদিন গিয়ে নিয়ে আসব!

'আসবেন' আপনার বিশ্বাস?

স্থির বিশ্বাস!

আশ্চর্য!...আচ্ছা বললেন যে অপারেশনটা তেমন জরুরি নয়। তবে কেন মিছিমিছি—

অদম্য হঠাৎ ওর আরো কাছে সরে ওর দুটো কাঁধে হাতের থাবা দুটো বসিয়ে বলে, দেখো একদিন তোমার এই অবহেলায় ফুটোফাটা হয়ে যাওয়া দেহটাকে 'রিপেয়ার' করে ফেলবার সংকল্প করে বসে তোমায় আটকে ছিলাম।

তো এখন যখন তুমি আমার মুখটা রেখেছ একটুই বা বাকি থাকে কেন? ওটুকু রিপু করে ফেলা ভালো! তোমার টনসিলে একটা খুঁৎ আছে, একটু ইমোশান নিয়ে কথা বলতে গেলেই কথাটা জড়িয়ে যায়।···আর তুমি তো ব্রাদার সর্বদাই ইমোশান্যাল।···কাজেই ওটুকুও সেরে ফেলতে চাই। এরপর তো আবার নিজের হাতে আইন তুলে নেবে···শরীরটাকে আবার—

পলাশ একটু হতাশ চোখে তাকায়।

অদম্য বলে ওঠে আচ্ছা তুমি যদি এখানে একটা মোটামুটি চাকরি পেয়ে যাও?

এখানে? চাকরি!

কেন নয়? দেখো সত্যি কথাই বলি তোমায় নিয়ে আমার দারুণ একটা প্ল্যান আছে। সেটা আস্তে আস্তে ভাঙবো। তবে এখানে আমার ঠাকুর্দার নামে একটা বয়েজ হাই স্কুল আছে। যদিও এখন সবটাই কমিটির হাতে। তবু তোমার মতো একজন বাংলায় এম এ-কে নেওয়ানো অসম্ভব হবে না।

পলাশ আরো হতাশ ভাবে বলে, তারপর বোধহয় এখানেই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা।

পাগল না কী? সেটা আবার একটা প্ল্যান? তোমার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরকার নেই?···সেটা তোমায় গাড়িতে যেতে যেতে বলবো।··· মাস্টারিতে রাজি আছো কিনা সেটাই ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করছি।

পলাশ তার কাঁধের ওপর রাখা হাতটার ওপর নিজের একটা হাত রেখে বলে, আচ্ছা আপনি আমার জন্যে অ্যাতো করতে চান কেন বলুন তো?

অদম্য হেসে উঠে বলে, 'একদা কী করিয়া দেখা হলো দোঁহে কী ছিল বিধাতার মনে।' আমি যদি সেকালের রাজা রাজড়া হতাম তোমায় কী আর স্কুল মাস্টারি অফার করতাম হে। 'সভাকবি' করে নিতাম। এখন ওই পর্যন্তই।···সবটাই তোমার রাজি হওয়ার ওপর নির্ভর। উত্তরটা পেলে—

উত্তর দেবার মতো ভাষা নেই আমার ডাক্তারবাবু।

থ্যাঙ্ক গড। ওতেই হবে।···চলো যাবার সময় আমার নার্সিংহোমের বাড়িটা দেখিয়ে নিয়ে যাই।···এখনো অবশ্য সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়নি।···

* * *

বাড়ি থেকে খানিকটা গেলেই অদম্যর এই—'স্বস্তিভবন'।

'স্বস্তিভবন'। বেশ নামটি তো নির্বাচন করেছেন।

ঠিক হয়েছে বলছো?···প্রমিতা বলেছিল, এরকম একটা ন্যাতাজোবড়া

বাংলা নাম দিলে লোকে গণ্যই করবে না। কিন্তু বেশি লোকে গণ্য করারই বা দরকার কী বলো ?···কতোটুকুই বা করতে পেরেছি আমি ?···মাত্র তো বারোটি কেবিন। তাও ঠাকুর্দার ফেলে রেখে যাওয়া জমিটা ছিল বলে। কলকাতায় এই জমিটা জোগাড় করতে কয়েক লাখ টাকা লেগে যেত। কাজেই হতো না।

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো পলাশকে।

ঝকঝক করছে অতি আধুনিক প্রয়োজনের উপযুক্ত প্ল্যানের বাড়ি। একতলাই।···চাহিদা বাড়লে দোতলা তেতলা লিফট সবই হতে পারবে। মাপাজোপা অবস্থা নয়! সামনে একটু বাগানও থাকবে।···আর থাকবে নার্স কোয়ার্টার্স।

এখন মাত্র দুটো কোয়ার্টার্স বানানো হয়েছে—দেখালো অদম্য 'সেবক ভবন' আর 'সেবিকা ভবন'···ফ্যামিলি নিয়ে থাকা চলবে।···না হলে কে আসতে চাইবে ? অ্যাঁ···এখন সাজ-সরঞ্জাম না আসা পর্যন্ত।···আরে বাবা অনেক দেরি হয়ে গেল।

গাড়িতে যেতে যেতে অদম্য তার দারুণ প্ল্যানটা ব্যক্ত করলো।

পলাশ উত্তেজিত ভাবে বললো, এসব কী বলছেন ?

অদম্য বললো, যা বলছি—স্রেফ তোমার কবিতার মতো। তোমাদের মতো কবিতা লিখতে পারি না বলে যে একেবারেই 'গোলা' লোক তা ভেবো না।···

ধ্যেৎ। দিন যেন আর কাটতে চায় না। রম্যা সেদিন বলে গেল একটা চাকরির সন্ধান দিতে পারে।···যাহোক একটা কিছু পেলেও বাঁচা যায়।

ফোন করলো রম্যাকে, আর প্রমিতা নিজে কিছু বলবার আগেই রম্যা হৈ হৈ করে উঠলো, এই আজই তোকে ফোন করব ভাবছিলাম। কাল চলে আয় একটা ইন্টারভ্যু আছে—চাকরিটা আমার কর্তার একজন বিশেষ বন্ধুর হাতে—

বল বল শুনি শুনি। কী চাকরি ?

'কী' চাকরি বললো রম্যা। মেদিনীপুরে একটা 'সরকারি হোম'-এর মেয়েদের কিছুটা লেখাপড়া শিখে 'স্বয়ম্ভর' হবার জন্যে সরকার একটা 'শিক্ষণ কেন্দ্র' খুলছে—তাতে মেয়েদেরকে সর্বদিক থেকে একটু করে তালিম দেওয়া। মাইনে খুব খারাপ নয়। তবে সরকারি ব্যাপার তো 'আহামরি' কিছু না। অবশ্য ফ্রি কোয়ার্টার্স থাকবে। আমার কর্তা—

মেদিনীপুরে! ধ্যাৎ।

রম্যা ওর স্বরক্ষেপ শুনেই রেগে উঠে বললো ওঃ। চলবে না? তবে যা রাইটার্সে গিয়ে একটা ক্লাশ ওয়ান অফিসার হয়ে বসগে যা। সুন্দরী আছিস, উন্নতি হবে।

প্রমিতা অবাক হলো। কতো সহজে কর্তোকটু কথা বলে নিল রম্যা। ···আসলে ভেবেছিল বন্ধুর স্বামীর ক্যাপাসিটি দেখে কৃতার্থ হয়ে যাবে প্রমিতা।···

তবু বললো, রেগে টং হচ্ছিস কেন?

রাগ আবার কী! তোমার যা হতছেন্দা ভাব দেখলাম! ওই চাকরির জন্যেই কতোগুলো দরখাস্ত এসেছে জানিস?

নামিয়ে রাখলো রিসিভার। খট্ করে শব্দ হলো।

মা এসে বললো, কে ফোন করেছিল রে?

ও একটা বন্ধু সেই রম্যা! একটা চাকরির সন্ধান দিচ্ছিল।

চাকরি!

মা গম্ভীর ভাবে বললো, এদিকে তোর বাবার কাছে সকালে জামাইয়ের ফোন এসেছে কাল তোকে নিতে আসবে।

কী? নিতে আসবে? আমার কোনো মতামতের প্রশ্ন নেই?

আমি জানি না বাছা। তোর বাবা যা বললো, তাই বলছি। সেই কবিটাকে বুঝি কদিন নার্সিংহোমে রেখেছিল। কাল সে ছাড়া পাবে। তাকে তারবাড়ি পেঁছে দিয়ে ফেরার সময় তোকে নিয়ে যাবে বলে রাখতে বলেছে। তোকেই চাইছিল ফোনে, তা তুই তো···

ওঃ আচ্ছা আমিই করছি। ভেবেছে কী? আমি একটা ঘটিবাটি? তাই নিয়ে যাবো বললেই নিয়ে যাবে।

খুব কড়া কিছু শোনাবে বলে ফোনে ডায়াল করলো।

ধরলো ব্রজ!

বললো তিনি তো বাড়ি নাই। আপনি কে বলছেন? গলাটা চেনাচেনা লাগছে।

কেউ না।

বলে নামিয়ে রাখলো রিসিভার।

আচ্ছা কাল কেমন নিয়ে যায় দেখবো!

* * *

কিন্তু ওই বেহায়া লোকটা যা ধরে তা নাকি না করে ছাড়ে না। তাই বললো, কষ্ট করে এতোটা পথ নিতে এলাম, যাব না বললে হয়? আমায় তো চেনো? ছাড়বো বলে মনে হয়?

কিন্তু কাকে বললো ? কোথায় এসে ?

সেকি এই কলকাতার বিভূতি মিত্তিরের দরজায় এসে তার মেয়ে প্রমিতাকে ?

তা তো নয়।

ডাক্তার অদম্য বোসের রেড ক্রশ লাগানো গাড়িখানা তো এখন ভদ্রেশ্বরের নীতুপিসির দরজায়।

কথা তার মামাদের ঘাড়ে পড়ে থাকা বিধবা ভাগ্নীর সঙ্গে।

নীতু বললো, আমি এর মধ্যে নেই বাবা। তোরা নিজেরা যা করতে পারিস কর। পরে যদি তোদের কোনো কাজে লাগতে পারি তো বলিস।

অদম্য বললো, ওর বাস। 'যদি' মানে? তুমি না হলে কোনো কাজ হবে ?···'বৌবরণ' 'কন্যা সম্প্রদান' এসব ঝুট-ঝামেলার মধ্যে যাওয়ার প্রশ্ন অবশ্য নেই। 'কাজটা' ডালপালা ছেঁটে ম্যারেজ রেজিস্ট্রির অফিসে হবে। তবে ভাগ্নীর সংসারটাকে তো গুছিয়ে দিয়ে আসতে হবে ?

ঠিক আছে। যাব। তবে এখানে কি এক্ষুণি বিয়ের কথাটা বলা দরকার ? ওই নার্সিংহোমের চাকরিটার কথা বললে কী হয় ? তুই তো বলছিস কোয়ার্টার্স পাবে বাড়ির লোক থাকা চলবে। হঠাৎ শুনলে ওর মামারা—

সে তুমি যা বোঝো। মোট কথা নাবালিকা তো নয়।

নীতু চলে যায় ঘর ছেড়ে।

অদম্য নামের লোকটা অনায়াসে কথাটা নীতুর ভাগ্নীকে বলে নাবালিকা তো নও যে ভুলিয়ে বার করে নিয়ে যাওয়ার দায়ে হাজতে যেতে হবে।

বৈশাখী স্থির ভাবে বলে, কিন্তু আপনার কথাটথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি যেন কোনো নাবালিকার গার্জেন। নিজের ইচ্ছে মতো পাত্র ঠিক করে ফেলে তাকে পাত্রস্থ করে ফেলতে চাইছেন।

অদম্য একটু হেসে বলে, তাই মনে হচ্ছে ? সতি ওই একটা দোষ জন্মে গেছে। সব্বাইকেই নাবালক মনে হয় আর গার্জেনগিরি করতে বসি। ···বাবার স্বভাবটা বোধহয় পেয়েছি কিছুটা। বাবাও যেন তাঁর ধারে কাছের সবাইকে নাবালক ভাবতেন। আর নিজেকে তাদের গার্জেন। তো হতেই পারে। বাবার স্বভাব ছেলেতে বর্তায়।

এতো বাজে কথা বলে চলেছেন কেন ? আমি বলেছিলাম ওকে বিয়ে করব ?

বৈশাখী ঠোঁট কামড়ায়।

অদম্য এখন একটু গভীর গলায় বলে, তুমি বলোনি। আমিই বলেছি বৈশাখী। তুমি জানো না নার্সিংহোমে ও অপারেশনের আগে হঠাৎ বলে উঠেছিল 'বৈশাখী আসেনি ?' 'দিদি' নয়। 'বৈশাখী।'···'আসেনি' শুনে একদম হতাশ হয়ে গিয়েছিল।

এসব আপনার বানানো কথা।

অদম্য শান্ত গলায় বলে, ওইটি বোলো না বৈশাখী। অদম্য ডাক্তার যতো পাষণ্ডই হোক বানানো কথা বলে না।···আমি দেখলাম এই একটাই উপায় আছে সবাই সুখী হবার।

ওঃ। কে কে এতে সুখী হবে শুনতে পাই ?

এক নম্বর আমি। অবিশ্বাস করবে ?

না। সেটা বিশ্বাস করছি। নিজের প্ল্যান সাকসেসফুল হলে সবাই সুখী হয়।

দু নম্বর ওই কবিটা। অবিশ্বাস ?

জানি না। হতেও পারে।

হতেও পারে নয় বৈশাখী বর্তে যাবে, কৃতার্থ হয়ে যাবে।···জানো প্রথমটা বলেছিলাম চাকরির কথা। জিগ্যেস করেছিলাম স্কুল মাস্টারিতে রাজি আছে না আরো অনেক বড় অ্যাম্বিশান ?···বললো 'উত্তর দেবার ভাষা নেই।' তারপর বললো, কিন্তু তার মানে এটা একটা ছেলেভুলনো ছল। এখানে চাকরি মানেই সেই আপনার বাড়িতে থাকা খাওয়া ?···বললাম তা কেন ? দেখছো তো আমার নার্সিংহোমের 'সেবিকা ভবন'। 'সেবিকা ভবনের' জন্যে একটা করে ফ্যামিলি কোয়াটর বানিয়ে রেখেছি। একটি সেবিকাকে বিয়ে করে ফেলো, সে তোমায় তার কোয়াটার্সে থাকতেও দেবে আর রান্নাবান্না করে খাওয়াবেও। আর আমারও মস্ত একটা সুবিধে হয়ে যাবে কাজ করতে করতে টায়ার্ড হয়ে গেলে আত্মীয় বাড়ি গিয়ে বসে পড়ে একটু চা খেয়ে আসতে পারবো।

বললেন আপনি এই সব কথা ?

বললাম তো !

আর—বৈশাখী আবার ঠোঁট কামড়ে বললো, আর ও শুনেই রাজি হয়ে গেল ?

চট করে কী হলো ?

অদম্য হাসলো ,একব্যাটা পথের ভিখিরিকে যদি বলা হয় 'তুই এই সম্রাটের সিংহাসনটায় বসে পড়।' তার তো সেকথা বুঝতেই সময় লাগবে।

হতভম্ব হবে, ঠাট্টা বলে ভাববে, তারপর আহ্লাদে কেঁদে ফেলবে।···ও যে তোমায় কী চক্ষে দেখে বৈশাখী কী ভালোবাসে তোমার ধারণা নেই। ওর আহ্লাদের কান্না থামাতেই—তোমার একটু দয়ার ওপর ওর সব কিছু নির্ভর করছে বৈশাখী ···তুমি কি সত্যিই নিজেকে 'বিধবা' ভাবো? কুমারী ছাড়া আর কী?

বৈশাখী সে কথার উত্তর না দিয়ে বললো, আর ওর বাড়ির লোকেরা?

ওর বাড়ির লোকেরা?

হেসে উঠলো অদম্য। বললো, তারা বললো, আগেই বুঝেছিলাম বিনি পণে ওই মেয়েটাকে পার করতেই আমাদের ছেলেটাকে এতো তোয়াজ। এম এ পাশ ছেলেটা আমাদের বিনি পয়সায় বিকিয়ে যাবে আর কী!···

তার মানে তাঁরা সুখী হলেন না।

তাঁদের সুখী করার জন্যে আমি মরে যাচ্ছি না। কিন্তু নীতুপিসি কী সুখী হবে না বলতে চাও?

তাও হয়তো হবে। আর আপনার বৌ? প্রমিতাদেবী?

সেই বা নয় কেন? তার কর্তার বাল্যবান্ধবীকে আর একজন দখল করে ফেললে তার নিশ্চয়তা।···

বৈশাখী তীক্ষ্ণ স্বরে বলে আর আমি?

অদম্য ওর পিঠে একটা হাত রাখে। খুব স্নেহ গভীর গলায় বলে তুমিও সুখী হবে বৈশাখী। এ আমার শুভেচ্ছা নয়, বিশ্বাস। ছেলেটা সত্যিই ভালো।···

তার মানে আপনার গিন্নির কথাতেই বলি—এক গ্লাসের জল অন্য আর এক গ্লাসে ঢালা যায় এতে আপনি বিশ্বাসী!

অদম্য বললো, ওটা আমার গিন্নীর নিজস্ব মাপের হিসাব। কিন্তু আমার হিসেব অন্য। আমি ভাবি না জলটা মাত্র এক গ্লাসই।···সরোবরের জল থেকে কতো জল ভরা যায়। একজনকে ভিন্ন ভালোবাসা যায় না এ মতবাদে আমি বিশ্বাসী নই। তোমায় ভালোবাসি বলে কি আমি আমার বৌকে ভালোবাসতে পারি না?···তুমিও দেখো ওই কবিকে নিয়ে সুখে ঘরসংসার করতে করতেও আমায় দিব্যি ভালোবেসে চলবে। আমি তোমার সংসারে গিয়ে বসলে, ভাববে ভগবান এসে হাজির হলো। গিয়ে চা খেতে চাইলে ভাববে স্বর্গের সুধা দিয়ে চা বানাই। আর যখন বরের সঙ্গে ঝগড়া হবে আমায় গঞ্জনা দিয়ে বলবে, খুব যাহোক অমুদা, ভালো একখানা পাত্তর জুটিয়ে ছিলে বটে আমার জন্যে।

গলা খুলে হেসে ওঠে অদম্য। তারপর বলে, সব ঠিক হয়ে যায় বৈশাখী। শুধু ঠিক হওয়াবার ইচ্ছেটা থাকা চাই। আর নিজের ওপর কণ্ট্রোল থাকা চাই। আমাকে যে ভালোবাসাটি বাসো, তার জোরেই তুমি আমার প্ল্যানটা সফল করে তুলতে পেরে উঠবে।…প্লাস সেই অভাগাটার এক সমুদ্র ভালোবাসা।

অমুদা।

বলো।

ওকে আপনি পেয়েছিলেন কী সূত্রে সেটা বোধহয় ভুলে যাননি।…ওর প্রেমিকা আপনার ঘরেই বিরাজিত।

সেটা মরীচিকা মাত্র বৈশাখী, তা পলাশ বোঝে। তবু তাও হয়তো ওর জীবন তরুতে সার এর কাজ করবে। আটপৌরে জীবনের মধ্যেও লোকের সংসারে একটা ঠাকুর ঘর থাকে, পুজোর বিগ্রহ থাকে। কেন জানো? সেটারও দরকার থাকে।…'নিজস্ব' একটা কিছু.

আশ্চর্য।

কী আশ্চর্য।

আপনি যে কেন ছুরি চালাতে শিখতে গেছলেন।

বাঃ মানুষের কী কেবলমাত্র একটাই সত্তা থাকবে? একটা দেহের মধ্যে কতোগুলো 'সেল' আছে জানো?

বড়মামি মেজমামি বললো, কী রে শাখি, আবার বড়মানুষের বাড়ির অন্ন জুটছে?

বৈশাখী বললো, কপালে থাকলে কে রদ করতে পারে বলো?

ছোটগিন্নিরও কপাল বাবা! বাপ নয় ভাই নয়, ভাইপো। তাও আপন নয়। তবু কী পুজ্যি করে নিয়ে নিয়ে যায়।

বৈশাখী বললো, তা আর বলতে। ছোটমামির কপালের তুলনা আছে।

মামারা একটু খুঁটিয়ে জিগ্যেস করতে চেষ্টা করলেন নার্সিংহোমটা কী প্রকার। মাইনে কী রকম। ভবিষ্যৎ আছে কিনা। খাটুনি কী রকম হবে। ইত্যাদি।

নীতু বললো, তা অতোশত জানি না বাবা। বলছিল তো ভবিষ্যৎ আছে। ভাসুর ঠাকুরকে বলো না দিদি নিজেই অমুকে জিগ্যেসবাদ করে বুঝুন।…

শুনে সেই ভাসুর ঠাকুর বললেন, রক্ষে করো বাবা। ছোটবৌমার ওই বিলেতফেরত ডাক্তার ভাইপোর কাছে গিয়ে আমি করব জেরা? সাবালিকা

ভাগ্নী যা মন হয় করতে পারে। তবে কী এমন গুণ দেখলো ওর মধ্যে যে আবার ডেকে চাকরি দিচ্ছে, তা ভগবান জানেন।

ঘরের জানালা থেকে দেখলেন, রেডক্রশ মার্কা গাড়িখানা বেরিয়ে গেল।···

এখন মহিলা মহলে রাগারাগি। দুম করে যে যখন তখন চলে যায় ছোটগিন্নি, তেমন তেমন দজ্জাল জা শাশুড়ির বাড়ি হলে পারত? আমরা যাই নেহাত ভালোমানুষ তাই।···আমাদেরও কপাল। বড়মানুষ আত্মীয় কী নেই কোথাও কোনোখানে?···পোঁছে কই?

* * *

তা কলকাতার বিভূতিভূষণের বাড়ির দরজায় গিয়েও দাঁড়িয়েছিল বৈকি ডাক্তার অদম্য বোসের গাড়িখানা।

প্রমিতা নামের মেয়েটা বলে উঠেছিল, নিতে এসেছ মানে? আমি বলেছিলাম যাব?

পাগল। তাই আবার বলে মেয়েরা? বাপের বাড়ি হলো মেয়েদের কাছে নন্দন কানন। কিন্তু আমার যে ভীষণ মন কেমন করছে।

তুমি একটা মিথ্যাবাদী।

ছি ছি। ওই কথাটা ব'লো না মিতা। প্লিজ।

তবে কি সত্যিই বিশ্বাস করতে হবে আমার জন্যে তোমার ভীষণ মন কেমন করছে?

'হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট।' বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। রাত্রে তো শোবার ঘরে ঢুকতেই ইচ্ছে করে না। এঘরে ডিভানে শুয়ে পড়ি।

এই লোককে কী করে ঠ্যাকাবে প্রমিতা?

তারপর শ্বশুরশাশুড়িকে নেমতন্ন করে গেল অদম্য, ওর 'স্বস্তিভবনের' দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান উৎসবের দিনের জন্যে।

আনুষ্ঠানিক ভাবে ভবনটার তো দ্বারোদঘাটন হয়ে যাক। কদিন পরেই সরঞ্জাম সম্পূর্ণ হলে, খোলা হবে 'স্বস্তিভবন'।

তার আগেই 'সেবক ভবন, সেবিকা ভবন'। তা সে তো দরকারই। আগে সেবা করবার লোক এনে তবে তো রোগী আনা উচিত।···

হ্যাঁ সেই সেদিনে নাটকের সংলাপ এইরকম—

প্রমিতার মা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সবই আনন্দের কথা। তবে ওটা আর কলকাতায় হলো না এই যা।···

অদম্য অতি মধুর হেসে বললো, তাহলে তো হতোই না মা। বাপ ঠাকুর্দা খানিকটা জমি রেখে গিয়েছিলেন বলেই না—আপনার এই জামাইটিকে

বেচলেও তো ওর সিকির সিকিও হতো না। বলুন? হতো? অথচ ওটাই আমার বরাবরের সাধ। যাবেন নিশ্চয় সেদিন।

প্রমিতার মার মনে হয় আহা কী মিষ্টিকথা। প্রাণ জুড়িয়ে যায়।··· 'জামাই' বলে ভাবলে বুক ভরে ওঠে। নিবুদ্ধি মেয়েটা কিনা—

বিগলিত গলায় বললেন যাব বৈকি বাবা। যাব না? কইরে খুকু তোর হলো?

খুকু সাজিগুজি করে বেরিয়ে এসেছিল!

তা এতো সেই সেদিনের কথা।

যেদিন রাত্রে ওই চক্ষুলজ্জাহীন লোকটা বলেছিল উঃ। আজ কতোদিন পরে ভালো বিছানাটায় শুয়ে বাঁচব।

প্রমিতা অবশ্য গলার স্বরে মধু ঢালেনি। কড়া গলাতেই বলেছিল, কে তোমার ভালো বিছানা কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল?

দূর! বৌ বাপেরবাড়ি গেলে 'জোড়াপালঙ্কে' শুতে পারা যায়?

কিন্তু সেই বৌটা?

তারও কি মনে হয়নি ওখানের খাটটা সত্যিই কী সরু।···আর বাড়িটাও কেমন যেন বুকচাপা।···

* * * *

কিন্তু জুলুমবাজ লোকটা যে জুলুমের মাত্রা বাড়িয়েই চলে। বলে, তোমার ছন্নছাড়ার তো একটা হিল্লের ব্যবস্থা করে ফেলেছি। এখন জনাদুই সাক্ষীর তো দরকার। চলো দুজনে যাওয়া যাক।

কী? আমায় যেতে হবে ওদের ম্যারেজ রেজিস্ট্রিতে সাক্ষী হতে? আশ্চর্য।

অদম্য খুব করুণ গলায় বললো, তোমার কী সত্যিই খুব কষ্ট হবে?

কষ্ট হবে মানে?

হওয়াই স্বাভাবিক। নিজের সম্পত্তি অন্যের হাতে চলে যাচ্ছে দেখা কষ্ট। তবে আমার ধারণা ছিল—সে অভাগা তোমার জন্যে যতটা, তুমি তার জন্যে ততোটা নও। কিন্তু—

থামো। আমি তার জন্যে এক ইঞ্চিও না। হাঁদা গাধা একটা।···, একখানা তরতাজা মারকাটারি মেয়ে, তাকে 'দিদি' বললে, তো দিদি ডাকলাম। আবার কাজের সুবিধের জন্যে দিদির প্রেমে পড়তে বললে তো পড়লাম। শুধু পড়লাম? একদম সপাটে আছাড় খেলাম। রাবিশ!

অদম্য ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, একদম এক ইঞ্চি নও তা তো মনে হচ্ছে না। বোধহয় কিছু কিঞ্চিৎ আছে।

কী ?

না বলছি কিছু না থাকলে এতো রাগ আসে ?

কেন ? তুমি তো তোমার প্রেয়সীকে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে আহ্লাদে ভাসছ !

আমার কথা বাদ দাও। তুমিই বলেছ আমি একটা সৃষ্টিছাড়া। তা যাক কাল তাহলে যাচ্ছি দুজনে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে। কেমন ?

আমার দ্বারা ওসব হবে টবে না। সুযোগ পেয়ে গেলে এরপর হয়ত তুমি বায়না ধরে বসবে 'ওদের জন্যে সুন্দর করে পিঁড়ি আলপনা দাও বরণডালা সাজাও।'

অদম্য অম্লান মুখে বললো, তা এসব তোমায় ছাড়া আর কাকে বলা যেত ? ব্রজকে ? না কি গোবিন্দকে ? তা তোমার ছন্নছাড়ার কাকাকাকি সে ভার নিয়ে তোমায় রেহাই দিয়েছেন।

প্রমিতার মুখ দিয়ে বিস্ময় রূপে উচ্চারিত হয়, কাকা কাকি ?

সেই তো। ভাগ্য বলতে হবে।···ওনারা বললেন, 'বুড়ো' যখন বিয়ে করে আনছে তখন সে আমাদের ঘরের বৌ। বরণ করে তুলতেই হবে।···'বুড়ো' ছাড়া ভবিষ্যতে আমাদের দেখবার কে আছে ? মেয়েরা তো পরের ঘরের জন্যে।'

রাগের মধ্যেও হেসে ফেলে প্রমিতা।

সত্যি। একখানা চিজ বটে !

তোমার তো দেখা। তোমার মামাবাড়ির পাড়ার।

প্রমিতা বললো, দেখলেই কী দেখে ফেলা যায় ? মানুষের কতো রূপ। শতরূপে তার প্রকাশ।

আরেব্বাস। তুমিও এতো তত্ত্ব কথা ভাবো ? ইচ্ছে করলেই তাহলে কবিতা লিখতে পারো।

প্রমিতা বললো, 'কবিতা' লেখাই জীবনের পরমার্থ নাকি ?

আমার কিন্তু 'কবি'-দের প্রতি খুব সমীহ। যে কথা গদ্যে বলতে গেলে কুড়িপাতা সেই কথাই কেমন পাঁচ লাইনে সেরে ফেলা যায়। তাছাড়া কবিতার ছলে কী না বলে ফেলা যায় ? অ্যাঁ ?

প্রমিতা ওর বালসুলভ ভঙ্গিতে হঠাৎও আবারও হেসে ফেলে।

অদম্য যে বলেছিল মানুষের হৃদয়রাজ্যে কখন যে কী ঘটতে পারে বলা সহজ নয়। সেখানে 'অসম্ভব' বলে কোনো শব্দ নেই। নইলে কিনা প্রমিতাকে দেখা যাচ্ছে নীতুপিসির সঙ্গে মহোৎসাহে শাড়ির দোকানে ঘুরে ঘুরে বিয়ের কনের উপযুক্ত সব সুন্দর সুন্দর শাড়ি বাছাই করে বেড়াতে।

নীতু বলে, একটা ভালো দোকানেই তো হাজার রকমের হাজার হাজার শাড়ি তবে আর ঘোরাঘুরিতে কাজ কী? বিশ পঁচিশখানার বেশি তো আর কেনা হচ্ছে না?

প্রমিতা বলে, আহা! তা বলে একটা বিয়ের বাজার করতে দোকান ঘোরা হবে না? কত দোকানে কত ভ্যারাইটি।...

এছাড়া শাড়ি কেনার পর তার সঙ্গে ম্যাচ করে ব্লাউস খোঁজার দায়িত্ব।... তদুপযুক্ত সায়া ইত্যাদি।...'প্রসাধন দ্রব্য' সম্বন্ধে অদম্যর কোনো ধারণাই ছিল না। বলেছিল, ও মিতা, মেয়েটার নিজস্ব বলতে তো কিছুই নেই. বিয়ে উপলক্ষে কিছু শাড়ি কিনে দেওয়া উচিত তো?

প্রমিতা বলেছিল, তা গার্জেনের পক্ষে অবশ্যই উচিত।

তাহলে ও ভারটা তোমার ওপর রইলো। পিসিকে সঙ্গে নিয়ে যা করবার করে ফেলো।

প্রমিতাকে কিন্তু এতে বিশেষ প্রতিবাদী দেখায়নি। আসলে ভালো মতো একটা মার্কেটিং করার সুযোগ লাভ তো? যেটা নাকি নারীমনের পরমানন্দের খোরাক।

চোখ নাচিয়ে বলেছিল প্রাক্তন প্রেমিকার জন্যে বাজেট কতো?

বাঃ সে আমি কী করে জানবো। তুমি বুঝবে। যা ভালো মনে করো ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নেবে।

জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্ট বাড়ির কাছাকাছি ব্যাঙ্কেই অতএব অসুবিধের কিছু নেই।

তারপর বলেছিল, এই শাড়ির দোকানে ঘুরবে নিজের জন্যেও পছন্দ পছন্দ কিছু কিনে নেবে।

চোখ কুঁচকে উঠেছিল প্রমিতার।

ঘুষ? না পারিশ্রমিক?

অদম্য বলেছিল, ছি ছি এমন খেলোমার্কা ঠাট্টা করতে আছে? আমার এমন একটখানা সুন্দরী বৌয়ের জন্যে 'প্রণয়োপহার' বলো। আমি তো একটা

গোলা চাষা। নিজে পছন্দ করে কিছু দিতে জানি? গাড়িটা নিয়ে নিও। কলকাতার দোকান ছাড়া কি আর মন উঠবে?

প্রমিতার যে কি মুস্কিল।

ওই উজ্জ্বল চোখ মুখ-এর দিকে তাকিয়ে কি করে ভাববে এসব কথা 'অভিনয় মাত্র'। অথচ মনেপ্রাণে বিশ্বাস আসতে চায় না। একি প্রমিতারই মনের দোষ?

তবু নিজে চেক কেটে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে আমাপা বাজেটে শাড়ি কিনতে পাওয়ার মতো সুখ কটাই বা আছে? তার সঙ্গে যখন নিজেরটাও যুক্ত।

মনটা বেশ যেন উদার উদার হয়ে যায়। এবং নীতুকে বাহন করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া।···প্রসাধন দ্রব্য ছাতা চটি ব্যাগ এসবই প্রমিতার ফর্দ।

নীতু বলে, কী পাগলে কাণ্ড করছো বৌমা? এ কি 'তোমার' মেয়ের বিয়ে নাকি? এতো বাজে খরচ করে?

বাঃ বাজে খরচ কেন? এসব তো আর বাসি পচা হয়ে গিয়ে নষ্ট হবার নয়? পরেও কাজে লাগবে।

মেয়েটা লজ্জা পাবে। একেই তো লজ্জায় মরে আছে।

প্রমিতাকে হঠাৎ উদারতায় পায়। বলে লজ্জার কি আছে?

অতএব রীতিমত বিয়ের বাজার করে আনে প্রমিতা। মায় বরের কল্কাদার পাঞ্জাবি পায়জামা ফাইন ধুতি।

অতএব বলা যায় বৈশাখীর গ্রহ সংস্থান এখন অলৌকিক রকমের শুভ। নাহলে ছন্নছাড়াটার কাকাকাকি পর্যন্ত উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বৌ বরণ করে ঘরে তোলার অঙ্গীকার করেন?

এবং প্রমিতাও অদম্যর সঙ্গে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রি অফিসে যায় বরকনের সঙ্গে নিজে কনের অধিক সেজে।···অবশ্য কনেকেও হাতে করে সাজিয়ে না দিক নীতুকে নির্দেশ দেয় তাহলে পিসি কনেকে যা সাজাবার ভালো করে সাজিয়ে নেবেন।

অদম্য তাহলে ঠিকই বলে, 'পারা না পারা' ব্যাপারটা ইচ্ছাধীন। মনের ওপর কণ্ট্রোল থাকলে সবই পারা যায়।

হয়ত উৎসবের হাওয়া মানুষকে একটু উদারতার স্পর্শ দিয়ে যায়। তাই যে কোনো উৎসবেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রাচুর্যের ব্যবস্থা থাকে।

* * *

উত্তরপাড়ার লেট অনঙ্গ ডাক্তারের পাড়ায় আজ বেশ একখানি উৎসবের আমেজ। শুধু ওই পাড়াটুকুই বা কেন সারা অঞ্চলটাই।

'স্বস্তিভবন' উদ্বোধনের আয়োজন বার্তা অনেকটা দূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে। ভবনের দ্বারোদঘাটন করবেন মেডিক্যাল কলেজের এক প্রাক্তন প্রবীণ অধ্যাপক ডঃ আর এন মুখার্জি।···অদম্যর একান্ত শ্রদ্ধার 'স্যার'।

ভবনের দরজায় আলোর মালা মঙ্গল ঘট আম্রপল্লব। আর সংলগ্ন প্যান্ডেলের গেট-এ আলোকসজ্জা। তবে পাড়ার লোকের প্রধান উৎসাহ আজকের বিশেষ অনুষ্ঠান বাবদ 'বিচিত্রানুষ্ঠান'।

অদম্য পাড়ার তরুণ সমিতি সংস্কৃতি সঙ্ঘর নেতাকে ডেকে বলেছিল, আজ আমার বিশেষ একটা আনন্দের দিন। তোমরা তোমাদের মনের মতো একটা কিছু লাগিয়ে দাও। খরচের জন্যে চিন্তা নেই!

এহেন দরাজ বাণী কবে কে বলেছে তাদের কাছে?

অতএব নিজেদের যার যা ক্যাপাসিটি তার নমুনার ব্যবস্থা এবং নৈবেদ্যর ওপর মণ্ডার মতো অনুপ ঘোষাল, সন্ধ্যা মুখার্জি, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সারা উত্তরপাড়া ভেঙে পড়বে না?

যথারীতি দ্বারোদঘাটনের ফিতে কাটলেন ডঃ আর এন মুখার্জি। ফিতে কাটলেন সেই ঘরটিরও যে ঘরে নতুন 'এক্সরে' মেশিন অক্সিজেন সিলিন্ডার ইত্যাদি রাখা রয়েছে।

অতঃপর নাতিদীর্ঘ একটু বক্তৃতাও দিলেন।

যার প্রথমার্ধ তাঁর এই প্রিয় এবং ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ডঃ অদম্য বোস এর গুণ বর্ণনা, তাঁর এই আপন জায়গায় 'কর্মজীবন' এর মহৎ ইচ্ছা সম্পর্কে অভিনন্দন, অতঃপর চিকিৎসকের জীবনের কী আদর্শ হওয়া উচিত। চিকিৎসা অবশ্য একটি পেশা, কিন্তু সেটাই সব নয়। এটি একটি ব্রতও। চিকিৎসকের কেবলমাত্র অধীত বিদ্যার প্রয়োগ নৈপুণ্যই চিকিৎসকের পক্ষে 'শেষকথা' নয়। চিকিৎসকের মধ্যে থাকা দরকার দরদ মমতা মানবিকতাবোধ। শুধু দেহ যন্ত্রটাকে সুস্থ করে তোলাটাই তার একমাত্র কর্তব্য নয়। কর্তব্য রোগীর মনোযন্ত্রটির সুস্থতার দিকেও লক্ষ্য রাখা। তাছাড়া রোগির আত্মীয়দের সম্পর্কেও দরদ আর বিবেচনা থাকা দরকার। সেইসব আত্মীয়দের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ব্যাকুলতা ধৈর্যহীনতা সমূহ ক্ষমা আর বিবেচনার দৃষ্টিতে দেখা উচিত।···ডাক্তারকে হতে হবে আশ্বাসের প্রতিমূর্তি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভাষণান্তে ডাক্তার মুখার্জি অদম্য বোসের স্বস্তি ভবনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মঞ্চ থেকে নামলেন। পরক্ষণেই মঞ্চে উঠলেন স্থানীয় এক কর্তাব্যক্তি প্রবীণ ভদ্রলোক। তিনি প্রথমে পরোলকগত অনঙ্গ ডাক্তারের অশেষ গুণরাশির

বিষয় উল্লেখ করে শুরু করলেন, তস্যপুত্র অদম্য বোসের গুণসমূহের জল মাপতে। তার মহত্ব মহানুভবতা উদারতা নির্লোভ চিত্তের নিঃস্বার্থ প্রেরণা। অতি তুচ্ছজনের প্রতিও তার সমান যত্ন সমান দৃষ্টি ইত্যাদি ইত্যাদি!··· অতঃপর ডাক্তারের মহত্ত্বর উদাহরণ পেশ। কী মহৎ চিত্তের প্রেরণায় তিনি একজন বিদেশ ফেরৎ স্পেশালিস্ট ডাক্তার হয়েও নিজের 'কেরিয়ার' সম্পর্কে উদাসীন থেকে বাপের রোগীর ঘরগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করে এখানেই দিন কাটিয়ে চলেছেন! এবং সেইসব রোগীদের মধ্যে যারা অভাগা অভাজন তাদেরকে শুধু দাতব্যে দেখাই নয় বিনাপয়সায় ওষুধ এবং পথ্যও জোগান দিয়ে থাকেন তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত।···দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত।···

শুনতে শুনতে কান লাল মাথা ঝাঁ ঝাঁ।···সেই ডাক্তার অদম্য বোস অস্থির হয়ে এদিকে সরে এসে ফাংশান বাজদের একজনকে ডেকে 'জনান্তিকে' বলে, 'ওরে তপন বুড়োকে থামা! যা দেখছি টেনে না নামলে সারারাত চালিয়ে যাবে মাইক ছাড়বে না। তার মানে তোদের ফাংশানের বারোটা বেজে যাবে।

উসখুস তারাও করছিল কিন্তু তাদের প্রাণের ডাক্তারবাবুর প্রশস্তি চলছে থামায় কী করে? এখন তৎপর হলো।

কিন্তু সামনের সারির শ্রোতাদের মধ্যে একজনের অবস্থা যেন মোহাচ্ছন্ন। কেমন একরকম বিহ্বল ভাবে সে শুনে চলেছে।···এই গুণরাশির অধিপতিটিই হচ্ছে তার স্বামী! যাকে সে অবিরত ধিক্কার দেয়, যা মুখে আসে তাই বলে গঞ্জনা দেয় এবং মাঝেমাঝেই ওকে নিয়ে জীবন গড়া অসম্ভব বলে ওকে ত্যাগ করে চলে যেতে চায়। চিরতরেই যাচ্ছি বলেই তো চলে গিয়েছিল, কেবলমাত্র লোকটার প্রাবল্যের কাছে হার মেনেই আবার এখানে—

টের পায় না কখন তার প্রসাধন মণ্ডিত গালের ওপর দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে আবার শুকিয়ে যাচ্ছে। এ কি ওই মানুষটাকে 'বড়' ভাবতে পারার আনন্দে? না নিজের ক্ষুদ্রতা চোখে পড়ার দুঃখে?

কখন এক সময় দেখতে পেল প্রমিতা, মঞ্চে উঠেছে ওই অদম্য ডাক্তারই। আরো কার কী কথা হয়ে গেছে খেয়াল করেনি এখন শুনতে পেল। অদম্য বলছে 'আজ দুটি নতুন মানুষের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব যাঁরা দু'জনেই আমাদের সাহায্য আর সহায়তার জন্যে আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন।···এর একজন ইনি হলেন আধুনিক কবি শ্রী পলাশ চট্টোপাধ্যায়। 'ছন্নছাড়া' ছদ্মনামে ইনি পরিচিত। এঁর কাব্যগ্রন্থ গুলিতেও সেই নামই আছে। এঁর অন্য পরিচয় ইনি বাংলায় এম. এ. এবং

সম্প্রতি 'বয়েজ হাইস্কুলে' বাংলা বিভাগে শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেছেন। ···আর দ্বিতীয় জন এই শ্রীমতি বৈশাখী চট্টোপাধ্যায় ইনি আমাদের 'স্বস্তি ভবনের' বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন। ইনি 'সেবিকা ভবনের প্রধানা' তো বটেই তাছাড়াও 'স্বস্তিভবনের' তত্ত্বাবধায়িকার ভারও কাঁধে তুলে নিয়েছেন।···'নার্সিং হোম'-এর রোগীদের খাওয়া দাওয়া পথ্য ইত্যাদি সব কিছুরই দায়িত্ব থাকবে এঁর হাতে। বলতে পারা যায় ইনিই হবেন 'স্বস্তি ভবনের' স্বস্তি স্বরূপ।

হাততালি পড়লো।

ডাক্তার বললেন, আপনাদের বোধহয় আবার একবার হাততালি দিতে হবে। আর একটি বিশেষ সুখবর, সম্প্রতি এঁরা দুজনে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।

হাততালির পর হাততালি।

শ্রোতাদের মধ্যে কোথাও কোথাও মৃদু গুঞ্জন ওঠে। অনঙ্গ ডাক্তারের বোনের পালিত মেয়ে।···ছেলেবেলায় এসে এসে থেকেছে এ বাড়িতে।···ও আবার নার্সগিরি শিখেছে নাকী?

হ্যাঁ! হ্যাঁ। এর আগেও যেন একবার··মাস্টারটি আবার কবি। ছেলেদের সবাইকে 'কবি' করে না তুললেই বাঁচি।

তা নার্সিংহোম-এর বাড়িখানা বানিয়েছে বটে! একদম বিলিতি ধাঁচের কায়দা কেতা।···শুনছি না কি এরপর ওই ডিসপেনসারির লাগোয়া জমিটায় 'মেটারনিটি' হোম করবে। সেও সব আধুনিক ধাঁচের হবে।

নাঃ মানুষের মতো মানুষ একখানা। কীই বা বয়েস এরমধ্যেই এতোটা—কে বলবে বিদেশ ফেরৎ। একদম চাল অহঙ্কার নেই।···

মানুষের স্বভাবই এই যখন 'সমবেত কণ্ঠ' তখন যদি কারো নিন্দে শুরু হয় নিন্দের ঠ্যালায় ঠ্যালায় তাকে স্রেফ পাষণ্ডের কোঠায় চালান করে দেওয়া হয়। আবার যদি প্রশংসা শুরু হয় তাকে 'দেবতা' বানিয়ে ছাড়ে।···

অদম্যর যে এতো গুণ সেটা যেন হঠাৎ নতুন করে চোখে ঝলসে উঠেছে এদের।

অবশ্য এসব গুঞ্জন থেমে গেল—যেই মঞ্চে 'শিল্পী'দের আবির্ভাব ঘটলো।···না প্রথমেই দামি নামীদের তোলেনি···তাঁদের আগে তুললে তো 'স্থানীয় অ্যাটিস্ট' দের দফা গয়া করে দেওয়া। তাদের জন্যে কেউ শেষ পর্যন্ত বসে থাকবে?···দামিদের ঝুলিয়ে রেখে নিজেদের গুলো চালিয়ে চলে প্রথম দিকে।

এদের কেউ 'সঙ্গীতশিল্পী' কেউ গীটার বাদক কেউ কেউ বা

আবৃত্তিকারী। মূকাভিনেতাও আছেন একজন। আর কিশোরী নৃত্য শিল্পী জনা দুই তিন।

সকলেরই যে গুণপনা বিশেষ উচ্চমানের তা বলা অসম্ভব। কিন্তু সকলেই যে সংস্কৃতি সঙ্ঘের 'নিজজন'। কাজেই তাদের মান অভিমানের দিকটাই প্রধান বিবেচ্য। ঝুলিয়ে রাখা নামি দামিরা থাকুন 'মূক' হয়ে। ধৈর্যচ্যুত হলে উপায় নেই। পালিয়ে তো আর যেতে পারবে না। রাত বাড়ুক।

* * *

আবার উদ্যোক্তাদেরও উপায় নেই সব পালা না চুকলে বাড়ি ফেরা। তাই সে 'পালা'য় পেঁছতে রাত সাড়ে দশটা বেজে যায়।

কিন্তু এদের যে আবার 'নিজস্ব' কিছু অন্য অনুষ্ঠান বাকি।···

সব কোলাহল থামলো।···প্যান্ডেলের আলোরা নিভলো। জ্বলতে থাকলো শুধু 'স্বস্তি ভবনের' গেট-এর উজ্বল আলোটা। যার নিচে শালুতে সাদা লেখায় 'শুভ উদ্বোধন।' ওটাকে আজ সারারাত জ্বালিয়ে রাখা হবে।

এখন শুধু সস্ত্রীক ডাক্তার আর ডাক্তারের পিসি।

আলোর দিকে তাকিয়ে পিসি বললো, তোর 'স্বস্তি ভবনের' যা বাহার আর যা ব্যবস্হা দেখছি অমু রোগী হয়ে পড়ে ভর্তি হতে ইচ্ছে করছে। বৌনি হয়ে যাবে?

'অমু' বললো দোহাই পিসি। আমার কিন্তু মোটেই তোমায় দিয়ে বৌনি করার ইচ্ছে নেই।···চলো বাড়ি ফেরার আগে নব দম্পতীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আসি।

পিসি বললো, আমার সেসব জানানো টানানো হয়ে গেছে বাবা। আমি বাড়ি চললাম। বিকেল থেকে এখানে, সন্ধে পুজোটুজো কিছুই হয়নি। তোর শ্বশুর শাশুড়ি তো ফাংশানের মাঝখানেই চলে গেছেন টায়ার্ড লাগছে বলে। দেখি গিয়ে কী করছেন।

চলে গেল।

রইলো ডাক্তার আর ডাক্তারের বৌ।

ডাক্তার বললো, চলো আমরা ওদের এই শুভরাত্রিকে 'শুভরাত্রি' জানিয়ে আসি।···

কোনো প্রতিবাদ উঠলো না দেখে একটু বিস্মিত হলো।

'স্বস্তিভবনের পিছন দিকে সংলগ্ন সেবিকা ভবন। সেখানের একটি ঘরে (একটিমাত্রই ঘর অবশ্য) জ্বলছে মৃদুনীল আলো। ফুলের গন্ধে ম ম্ করছে ঘর। সাজিয়ে রেখে গেছে কেউ, বা কারা।

সামনের প্যাসেজে সাদা আলো।

অদম্য তার সামনে এসে দাঁড়ালো, কই হে মাস্টার ! ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো দুজন। এখনো অঙ্গে উৎসবের সাজ। তার মানে বসেই ছিল।

ডাক্তার বললো, দেখলে তো কেমন একটি ঢিলে দুইটি পাখি মারা হোল ? ···আমি অবশ্য মনে ঠিক করে রেখেছি—প্রধানত এটা তোমাদের বিবাহ উৎসব। লোকে জানলো উৎসব 'ভবন উদ্বোধনের।' বৈশাখী অদম্যকে নিচু হয়ে প্রণাম করে প্রমিতাকে প্রণাম করতে গেল। প্রমিতা 'আরে আরে এই এই' বলে পিছিয়ে গেল। কাঁধে একটু হাত রাখলো।

অদম্য বললো, ঘরটা বেন একটু বেশি ছোট মনে হচ্ছে। তাই না মাস্টার ?

মাস্টার বললো, আমার তো মনে হচ্ছে আকাশের মতো অসীম।

নিজস্ব স্বরে হো হো করে হেসে উঠলো অদম্য। দেখলে মিতা ? সাধে বলি কবিদের ওপর আমার দারুণ ভক্তি। একটি লাইনে কতখানি বলে নিলো।···তা'পর মাস্টারগিন্নি তোমারও কী ওই একমত ?

বৈশাখী বললো, আমি তো বলতে যাচ্ছিলাম মহাকাশের তুল্য।

আবার হাসি ওঠে।

বেশ বেশ। মিতা এদের যা যা দরকার সব ঠিক আছে তো ?

প্রমিতা বললো, পিসি তো বললেন সব ঠিক আছে।

বৈশাখী হঠাৎ অভিযোগের গলায় বলে উঠলো, আচ্ছা অমুদা ! তখন ওটা কী হলো ?

কোনটা ? অ্যাঁ।

ওই যে বিনা নোটিশে বৈশাখী মুখপুড়িকে একেবারে গোটাকতক পোস্টে বসিয়ে দেওয়া।···

প্রমিতা বললো 'মুখপুড়ি ?' এমা আজকের দিনে নিজেকে ওই কথা বলতে আছে ?

ঠিক।· অদম্য বললো, দেখছ আমার গিন্নিটির কেমন গিন্নিভাব জন্মে গেছে ?···এরপর হাঁচি টিকটিকিও মানবে। কিন্তু তোমার জন্য শুধু ওই কেন আরো কিছু পোস্ট মজুত আছে। ভালো বাংলায় ঠিকমতো প্রতিশব্দ খুঁজে না পেয়ে থেমে যেতে হলো।

যা খুশি বললেই তো হয় না ? আমি ওই অত সবের যোগ্য ?

অদম্য রাগের ভাণ করে বলে তবে কি তুমি বলতে চাও আমি ব্যাটা এমনই বুদ্ধু যে 'যোগ্য অযোগ্যর' বিচারবুদ্ধি নেই ?

উঃ। সে কথা হচ্ছে না। বলছি—এতো সব আমি পারব না কী ?

আরো বেশি, পারবে তুমি। দেখো নিজেই পোস্ট বাড়াতে শুরু করবে।

জানি না বাবা! আপনি আমার স্বস্তি ঘুচিয়ে দিলেন অমুদা। আমি 'স্বস্তি ভবনের স্বস্তি' উঃ। শুনে আর আমি নেই।…

অদম্য হাসে, তোর এই অমুদার কাজই হচ্ছে অসুস্থদের স্বস্তি দান আর সুস্থদের স্বস্তি ঘোচানো।…এই তোর বৌদিকেই কি রেহাই দেবো ভেবেছিস নাকি? এমন এক একখানা অস্বস্তি চাপিয়ে দেবো!

'তুই।' সেই ছেলেবেলার সেই ডাক।

কতদিন পরে এই মধুর স্নেহ সম্বোধন।

বৈশাখীর চোখ উপছে জল গড়িয়ে পড়ে।

না দেখতে পাওয়ার ভাণ করে অদম্য।

বলে ওঠে, আচ্ছা মাস্টার! শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।…দেখো অধিকার লাভ করে এই ভালোমানুষ বেচারার ওপর বেশি মাস্টারি ফলাবে না তো? না না 'কবির' ভূমিকাতেই থেক।

'ভালোমানুষ।'

বলে পলাশ একটু হাসে।

অদম্য বলে, যাই, এখন গিয়ে ভাবি গে তোর জন্যে আর কী কী পোস্ট খুঁজে পাই।

প্রমিতা হঠাৎ বলে ওঠে স্বস্তিভবনের বাগানের মালির পোস্টটা দিতে পারো। গোলাপ বাগান বানাতে পারবে। ওর সেই গোলাপগাছ দুটো দেখছিনে তো? কতো ফুল ফুটেছিল।

ঠিক।

অদম্য বলে ওঠে, খুব মনে পড়িয়ে দিয়েছ মিতা। এর নামই হচ্ছে 'সহধর্মিণী।' হ্যাঁ ওই মালির পোস্টও রইলো। টা। টা!…

* * *

এখন রাস্তা সুনসান। শুক্লপক্ষের মাঝামাঝি কোনো তিথি। ছায়াছায়া জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় ঘুমন্ত নগরটার ওপর।

দুজনে পাশাপাশি হাঁটছে। অদম্য আর প্রমিতা।

হঠাৎ প্রমিতা বলে ওঠে, তোমার নামকরণের সময় নামটা দিয়েছিল কে?

শুনেছি আমার দাদু। হঠাৎ এ কথা?

সেই দূরদ্রষ্টা মহাপুরুষটিকে প্রণাম জানাতে।

আরে হো হো—

অদম্য বলে কোনোদিন ভেবে দেখিনি তো।…হাতটা বাড়িয়ে প্রমিতার কুসুম কোমল একখানি মুঠি নিজের ভারি মুঠোর মধ্যে চেপে নেয়।…

চলো একটু আধুনিকদের মতো হাত ধরাধরি করে হাঁটি। সত্যি কী সুন্দর সময়টা।···

আজকের অনুষ্ঠানটা বেশ হলো না ?

হ্যাঁ।···

সংস্কৃতি সংঘের ছেলেগুলো দারুণ খুশি।

সবাই তো খুশি দেখলাম। সকলেই তোমায়—

তোমাকেও আমার কাজ্যের মধ্যে টেনে নেব মিতা। দেখবে মানুষকে ভালোবাসার আর তাদের ভালো করবার চেষ্টার মধ্যে কত আনন্দ।·· ক্ষমতা কিছুই নেই, প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। তবু চেষ্টাটুকুই আনন্দের। ···আমরা যা কিছু করি—স্রেফ নিজের আনন্দের জন্যেই নয় কী ?···

হয়তো। তবে দুঃখের বিষয় সেটা বোঝাবার মতো 'সৃষ্টিছাড়া' লোক সংসারে বেশি নেই।

অদম্য ওর হাতটায় একটু চাপ দিয়ে বলে, এক আধজন বুঝলেও যথেষ্ট।

বাড়ির গেট-এর কাছাকাছি আসতেই ধরা হাতটা ছেড়ে দিলো। ব্রজ দাঁড়িয়ে আছে গেট-এর সাবেকি ভারি তালাচাবিটা হাতে নিয়ে। তার চাবির থোলায় বড় বড় চাবির সংখ্যা অনেক।...সারা বাড়ির দরজা তদারক করে তালা লাগিয়ে তবে ব্রজ শুতে যায়।

এদের দেখে বলে ওঠে, তোমরা আবার এতো পিছিয়ে গেলে কেনো ? পিসি বললো, এই এক্ষুণি আসছে। গান শুনেই পেট ভরেছে ? খেতে দেতে হবে না।

অদম্য হেসে বলে ওঠে, জানি তো এসেই তোর তালাচাবির মধ্যে আটকে পড়তে হবে ব্রজদা। তাই একটু চাঁদের আলোয় বেড়িয়ে নিলাম।

ব্রজ দু'জনের দিকে তাকিয়ে দেখলো।

ব্রজর মুখটাতেও হঠাৎ যেন চাঁদের আলো ফুটে উঠলো। বললো, তা ভালো।···

ওদের গেট-এর মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে তালা চাবি লাগাতে লাগাতে বললো, বৌরানীর মা বাবা একসঙ্গে বসবে বলে অপেক্ষায় ছিল। তো পিসি জোর করে খাইয়ে দিলো রাত হয়ে যাচ্ছে বলে। এতোক্ষণে বোধহয় শুয়ে পড়েছে···

প্রমিতার হঠাৎ পিসশাশুড়ির ওপর বেশ একটু কৃতজ্ঞতা বোধ এলো।

ব্রজ বকবক করতে করতে সিঁড়ি ওঠে, ওনারা বলেছিল সকাল বেলাই চলে যাবে। পিসি বললো যেতে দিলে তো ?···দুদিন থাকতে হবে।···

বলে পিসির তো কথা! হেসে হেসে বলে, আমিও তো কুটুম, থেকে যাচ্ছি তো দুদিন। আপনারাও থেকে যান। তা'পর তো থাকতে শুধু দুটো মানুষ। আপনাদের মেয়ে আর জামাই।

কুটুম।

অদম্য বললো, ও'দের 'কুটুম' বললো পিসি?

ওমা। তা বলবে না? কথাতেই আছে 'জামাই বেয়াই কুটুমের সেরা, 'তা বড়' কুটুম শালা।'

হেসে উঠলো।

প্রমিতার হঠাৎ মনে হলো ইচ্ছে করলেই পারিপার্শ্বিক বাতাস হালকা করে নেওয়া যায়। ইচ্ছে করলেই সেই হালকা হাওয়ায় ভেসে এগিয়ে যাওয়া যায়।

* * *

নীতু বললো, আমার বাপু ঘুম পাচ্ছে। শুতে চললুম।…তোদের দুজনের খাবার তোদের ঘরেই টেবিলে রাখা আছে ঢাকা দিয়ে—

আরে এসব কেন?

নীতু বললো, আমার তাড়নায় তাড়াহুড়ো করে বসতে হবে তো! আমি বসে বসে হাই তুলবো দেখে স্বস্তি পাবি না। ধীরে সুস্থে খাবি তাই।

চলে গেল সত্যই হাই তুলতে তুলতে।

প্রমিতার আর একবার কৃতজ্ঞতা বোধ এলো পিসশাশুড়ির ওপর।…আর মনে হলো যাদের নেহাত 'গোলা' লোক বলে ভাবা যায় তারা সবাই বোধহয় তা নয়।…এই পিসি, কতো কী আচার বিচার পুজোটুজো তসর, গরদ, অথচ দেখা যাচ্ছে বোধবুদ্ধির অভাব নেই।

কিন্তু বোধবুদ্ধি যে তার এতটাই তা ধারণাই করতে পারেনি প্রমিতা। সম্ভবও নয়।…কিন্তু নীতু ছাড়া আর কে? কার বুদ্ধিতে আজ প্রমিতাদের শোবার ঘরটাও ফুলের গন্ধে ম ম?

টেবিলে ফুলদানিতে ফুলের তোড়া পালঙ্কের ছত্রিতে ফুলের মালার বাহার। বিছানায় ফুলশয্যার বিছানার মতো ফুল ছড়ানো।…এখন কী ফুল?

বেল মল্লিকা যুঁই তাই না? এটা তো ফুলেরই মাস।

খাটের একধারে বসে পড়ে প্রমিতা বলে ওঠে এসব কী ব্যাপার?

অদম্যও তার পাশে বসে পড়ে পিঠটা জড়িয়ে ধরে বলে, ব্যাপার তো বেশ গুরুচরণই দেখছি। কার মাথা থেকে এলো?

কার আর? পিসির ছাড়া।

অদম্য ওকে নিবিড় করে কাছ টেনে নিয়ে বলে ভয় হচ্ছে আজ আর বোধহয় তোমার রক্ষে নেই।···খেয়েই না ফেলি। ···সাবধান বাপু।

প্রমিতা নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বলে, আর সাবধান। যা একখানা নাম রেখে গেছেন ঠাকুর্দা।

মিতা।

বলো।

ভীষণ ভালো লাগছে। অসম্ভব আনন্দ হচ্ছে। কী করি বলো তো?

হাই জাম্প দিতে পারো।

বলছো? তোমায় নিয়ে দেব?

দোহাই তোমার। ছাড়ো ছাড়ো গেলাম। হাড়গোড় ভেঙে দেবে না কী? আমি মোটেই তোমার স্বস্তি ভবনের বৌদি হতে চাই না।

অদম্য ওকে আবার বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বসে পড়ে বলে সত্যিই আমি একটা বুনো।

বুনো নয়। তবে সৃষ্টিছাড়া বটে।

অদম্যর হাসি বোধহয় ঘরের বাইরে গিয়েও পৌঁছয়। হা হা হা। মিতা প্রমিতা তোমার ভাগ্যে একটা হচ্ছে ছন্নছাড়া আর একটা সৃষ্টিছাড়া।

আঃ। আবার সেই বাজে কথা। এখনো আমার ছন্নছাড়া মানে? এরকম বলবে না বলছি। ওর তো বেশ হিলেটিল্লে করে দিয়েছো। আবার কী?

অদম্য একটু হেসে গভীর গলায় বলে, তা হোক। তবু তোমারও। সাধারণ সংসারী জীবনের মধ্যেও···'নিজস্ব' কিছু একটু আছে ভাবতে ভালো লাগে। থাকা দরকার। তা নইলে হঠাৎ হয়তো একদিন নিজেকে খুব নিঃস্ব নিঃস্ব বেচারি বেচারি মনে হয়।···এই দরকারি জিনিসটাকে যদি সহজ করে নেওয়া যায়, স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যায় হয়তো জীবনের অনেক সমস্যা কমে যায়।

ওঃ। তার মানে মেনে নিতে হবে এই সংসারের 'আমি'টা ছাড়'ও ওর একজন 'নিজজন' আছে।

ঠিক তাই! একদম আমার মনের কথা। অবশ্য থাকতেই হবে এমন কোন আইন নেই। এতো ভাগ্যই বা কজনের আছে? একটাই জোটে না। তবে থাকলে অতি উত্তম। প্রাণের একটা খোলা জানালা।

ওঃ। কে বলে তুমিও 'কবি' নও। তবে তোমার এই মতবাদটি সমাজে প্রচার করতে গেলে লোকে তোমায় 'পাগল' বলে পাগলা গারদে ভরতে চাইবে।

হয়তো তাই। তবে আমি তো ভেবে পাই না এটা কেন? 'ভালোবাসা' জিনিসটা কী আকাশ বাতাস আলোর মতো নয়? আলো বাতাসের ভাগটা কি আর কেউ পেলে কারো কমে যায়? ওকে প্রায় বিদ্যের মতোই বলা যায় 'এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে। যতোই করিবে দান ততো যাবে বেড়ে।'

প্রমিতা তার স্বামীর আলোয় ভাসা বিশ্বাসী মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখে। প্রমিতার মধ্যেও কী আকাশ বাতাস আলোর স্বাদ এসে পৌছয়?···

তবু প্রমিতা কপালে একটা হাত রেখে বলে, ওঃ। ভগবান। এই পাগলটাকে নিয়ে আমায় সারাজীবন ঘর করতে হবে।

প্রমিতা হতাশ।

অদম্যও অতএব করুণ।

উপায় কী! পাল্লায় পড়ে গেছ যখন। দুবেলা কান্নাকাটি করতে হবে পাগল ভালো করো মা কালী! পাগল ভালো কর। এই আর কী!

মোটেই না। কখনো না!···

···প্রমিতা সেই পাগলের ওপর প্রায় পাগলের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে, 'কোনোদিনও না।'
